বিজ্ঞান

ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বিজ্ঞান

ষষ্ঠ শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. আজিজুর রহমান

প্রফেসর ড. শাহজাহান তপন

প্রফেসর ড. সফিউর রহমান

প্রফেসর এস এম হায়দার

প্রফেসর কাজী আফরোজ জাহানআরা

প্রফেসর ড. এস এম হাফিজুর রহমান

মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী

ড. মোঃ আব্দুল খালেক

গুল আনার আহমেদ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন, সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলা। ষষ্ঠ শ্রেণির এই পাঠ্যপুস্তকে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিকগুলোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি ও বিজ্ঞানমনস্ক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অনুসন্ধানমূলক কাজের সাথে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা ও কল্পনা বৃদ্ধির জন্য হাতেকলমে বিভিন্ন কাজ করার সুযোগও রাখা হয়েছে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পরিমাপ	১
দ্বিতীয়	জীবজগৎ	১১
তৃতীয়	উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষীয় সংগঠন	২১
চতুর্থ	উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য	২৮
পঞ্চম	সালোকসংশ্লেষণ	৩৮
ষষ্ঠ	সংবেদি অঙ্গ	৪২
সপ্তম	পদার্থের বৈশিষ্ট্য এবং বাহ্যিক প্রভাব	৫০
অষ্টম	মিশ্রণ	৬০
নবম	আলোর ঘটনা	৭৩
দশম	গতি	৮২
একাদশ	বল এবং সরল যন্ত্র	৯৩
দ্বাদশ	পৃথিবীর উৎপত্তি ও গঠন	১০৩
ত্রয়োদশ	খাদ্য ও পুষ্টি	১১৩
চতুর্দশ	পরিবেশের ভারসাম্য এবং আমাদের জীবন	১২৪

প্রথম অধ্যায়

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পরিমাপ

দৈনন্দিন জীবনে আমাদের প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয়। এগুলো হলো, তোমার উচ্চতা কত? তোমার ওজন কত? এখন কয়টা বাজে? আজকে বাতাসের তাপমাত্রা কত? ইত্যাদি। এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের জন্য দরকার উচ্চতা, ওজন, সময় এবং তাপমাত্রার মাপজোখের। দৈনন্দিন জীবনে এই মাপজোখের উপর আমরা নানাভাবে নির্ভরশীল। এই মাপজোখের মাধ্যমে আমরা মূলত কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করে থাকি। আর এই কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করাই হলো পরিমাপ। দৈনন্দিন জীবনে নানাবিধ ঘটনায় এই পরিমাপের সাথে আমরা পরিচিত। যেমন, বাজার থেকে চাল কিনে আনতে, রান্নার জন্য তেলের ব্যবহারের সময়, জামাকাপড় তৈরি করার সময়।

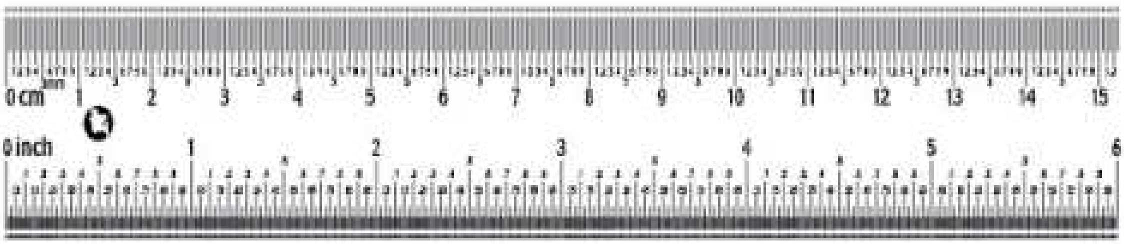

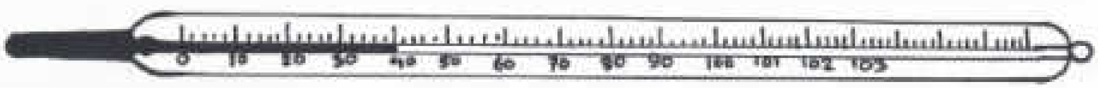

এই অধ্যায় শেষে আমরা

- বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া এবং পরীক্ষণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা এবং এককের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মৌলিক ও যৌগিক একক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দৈর্ঘ্য, ভর ও সময় পরিমাপ করতে পারব।
- বিভিন্ন আকারের কঠিন বস্তুর আয়তন পরিমাপ করতে পারব।
- তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপ করতে পারব।
- তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারব।

পাঠ ১ : বিজ্ঞান কী?

"বিজ্ঞান" শব্দটির অর্থ হলো বিশেষ জ্ঞান। জ্ঞান কী, তা জানো? কোনো বিষয়ে তথ্য, উপাত্ত ও দক্ষতা, এবং সেই বিষয় সম্বন্ধে উপলব্ধি - এই সব মিলিয়েই হয় সেই বিষয়ে জ্ঞান। বিজ্ঞান তাহলে কোন বিষয়ে জ্ঞান? বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি ও নানা প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞান। তোমরা এর আগে বিভিন্ন জীব ও জড়বস্তু সম্বন্ধে জেনেছ। আবার, নানা প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধেও জেনেছ, কীভাবে বৃষ্টি হয়, উদ্ভিদ কীভাবে খাদ্য তৈরি করে, ইত্যাদি। এ সবই বিজ্ঞানের অংশ।

তবে প্রকৃতি সম্পর্কে যে কোনো তথ্য বা উপলব্ধি বিজ্ঞান নয়। কেউ যদি কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়, তা বিজ্ঞান হবে না। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হতে হলে তাকে হয় তা পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ করে পেতে হবে অথবা পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া তথ্য দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। বৃষ্টি কীভাবে হয় তা নিয়ে হয়ত তোমরা গল্পাকারে অনেক ব্যাখ্যা শুনেছ। কিন্তু এ ধরনের ব্যাখ্যা কি বিজ্ঞান? না, এ ধরনের ব্যাখ্যা বিজ্ঞান নয়। কারণ, এসব ব্যাখ্যা পরীক্ষা থেকে পাওয়া নয় বা কোনো পরীক্ষা এদেরকে সমর্থন করে না।

এই জ্ঞান কীভাবে আমরা অর্জন করি? পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও যুক্তিযুক্ত চিন্তার মাধ্যমে আমরা বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করি। এগুলো বিজ্ঞানের প্রক্রিয়া। জ্ঞান যেমন বিজ্ঞান, জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়াও বিজ্ঞান।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের জন্য যেমন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দরকার, তেমনি দরকার একটি বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব, অর্থাৎ যুক্তিযুক্তভাবে চিন্তা করার মনোভাব। অপরের মতামতের মূল্য দেওয়া এবং নিজের ভুল স্বীকার করা এক্ষেত্রে জরুরি। একে বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গীও বলে। বিজ্ঞানকে তাহলে কী বলা যায়? বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান, যা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা থেকে পাওয়া বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত, এবং একটি বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যেমন গুরুত্বপুর্ণ, জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিও তেমন গুরুত্বপূর্ণ। আর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি।

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ধাপ

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের কি একটিমাত্র নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া রয়েছে? না একাধিক উপায়ে বিজ্ঞানের জ্ঞান পাওয়া যায়? বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে বিজ্ঞানের জ্ঞান অনুসন্ধান করেছেন। তবে তার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই মিল ছিল। সে মিলের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা যায়।

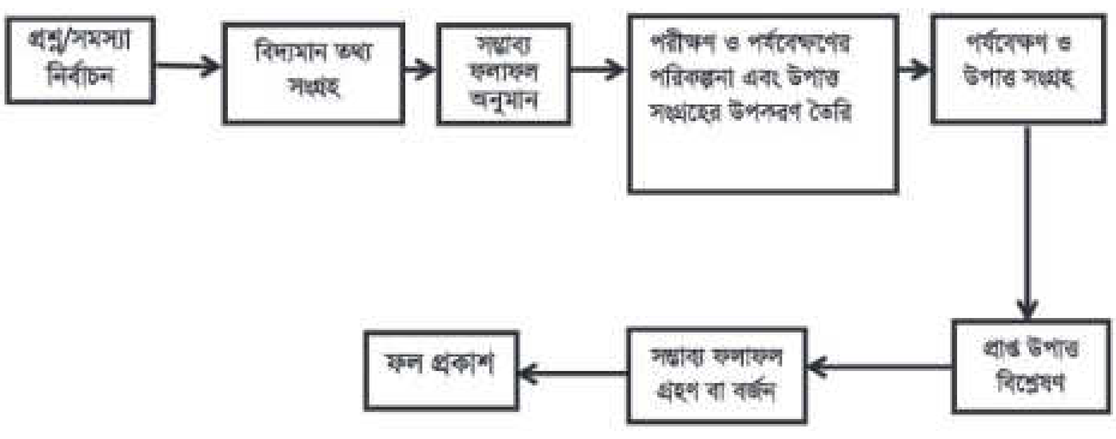

প্রবাহচিত্র: বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

পাঠ ২-৩ : পরীক্ষণ

পরীক্ষণ হলো বিজ্ঞানের নতুন জ্ঞান পাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য একজন বিজ্ঞানী প্রথমে জানা বা বিদ্যমান তথ্যের আলোকে একটি আনুমানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি পরীক্ষণের মাধ্যমে ঐ অনুমিত সিদ্ধান্ত ঠিক হয়েছে কিনা তা যাচাই করেন। পরীক্ষণের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে যদি দেখা যায় অনুমিত সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল না তাহলে তিনি নতুন করে অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারপর আবার তা পরীক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করেন। অধিকাংশে পরীক্ষণ পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য হলো এতে সকল কিছু স্থির রেখে একটি মাত্র চলক পরিবর্তন করা হয়। নিচে পরীক্ষণ পদ্ধতির ধাপসহ একটি উদাহরণ দেওয়া হলো।

পরীক্ষণ : বেঁচে থাকার জন্য গাছের পানি দরকার কিনা তার পরীক্ষা।

পরীক্ষণটি করতে যা যা দরকার : ছোটো দুটি পাত্র, ফুলগাছের দুটি চারা, পানি ও শুকনা মাটি।

পদ্ধতি :

১. সমস্যা নির্ধারণ : পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রথম ধাপে তোমরা সমস্যা স্থির করলে– ফুলগাছের চারা তুলে এনে লাগালে মারা যাচ্ছে কেন?

২. জানা তথ্য সংগ্রহ : তোমরা বই পড়ে, শিক্ষককে বা পিতামাতাকে জিজ্ঞাসা করে জানার চেষ্টা করলে কেন চারাগাছ মারা যেতে পারে। তোমরা জানলে যে পানি না পেলে চারাগাছ মারা যেতে পারে।

৩. আনুমানিক/অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ (সম্ভাব্য ফলাফল) : জানা তথ্য থেকে তোমরা অনুমিত সিদ্ধান্ত নিলে-পানির অভাবে চারাগাছ মারা যায়।

৪. পরীক্ষণের পরিকল্পনা : এবার তোমরা পরীক্ষণের পরিকল্পনা করলে। একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, এ পরীক্ষার জন্য তোমাদের দুটি পাত্রে দুটি গাছ নিতে হবে। তোমরা কেবল দুটি পাত্রের মধ্যে একটি বিষয়ে পার্থক্য রাখতে পারবে। অন্যসব কিছু সমান সমান রাখতে হবে। না হলে তোমরা যেটি যাচাই করতে চাও তা করতে পারবে না।

৫. পরীক্ষণ : ছোটো দুটি একই রকমের পাত্র নাও। মাটি বা প্লাস্টিকের টবজাতীয় পাত্র হলে ভালো হয়। পাত্র দুটির তলায় ছোটো ছিদ্র কর। এবার শুকনা মাটি দিয়ে পাত্র দুটি ভরে দাও। এবার একই ধরনের দুটি চারাগাছ দুই পাত্রে রোপণ কর। একটিতে পানি দাও আর একটি শুকনো রাখ। দুটি গাছকে ছায়ায় রেখে দাও। পরের দিন গাছ দুটিকে পর্যবেক্ষণ কর। একটি গাছ প্রায় মরে গেছে, অন্যটি সতেজ আছে। তাই না?

৬. উপাত্ত বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ : দুটি পাত্রে একই ধরনের মাটি ছিল। চারাগাছ দুটিকে পাত্রসহ একই জায়গায় রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল কেবল পানি। একটিতে পানি দেওয়া হয়েছিল, আর একটিকে পানি দেওয়া হয়নি। এ থেকে কী সিদ্ধান্তে আসা যায়? সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে পানি না দেওয়ায় একটি চারা গাছ মরে গেছে।

৭. ফল প্রকাশ : তোমরা তোমাদের পরীক্ষণের ফল বিদ্যালয়ের বুলেটিন বোর্ডে লিখে প্রকাশ করতে পার।

উপরোল্লিখিত ধাপগুলো হলো পরীক্ষণ পদ্ধতির ধাপ। এগুলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরও ধাপ।

পাঠ ৪-৫ : পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা

আমরা অনেক সময়ই জানা-অজানা নানাবিধ ঘটনাতে আন্দাজ করে পরিমাপ করে থাকি। যেমন: তোমার পড়ার টেবিলের দৈর্ঘ্য কত? তুমি কখন স্কুলে রওনা দিবে? এই সকল ক্ষেত্রে প্রায়ই তোমরা আন্দাজ করে পরিমাপ করার চেষ্টা কর।

আবার অনেক ক্ষেত্রে আমরা সঠিক পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। যেমন: বাজার থেকে চাল, ডাল কিনতে; জামা-কাপড় তৈরি করতে কিংবা সময়মতো ক্লাস শুরু ও শেষ করতে আমাদের যথাযথ পরিমাপ দরকার। সঠিক পরিমাপ ব্যতীত একটি শ্রেণিকক্ষে কয় জোড়া টেবিল- বেঞ্চ রাখা যাবে, বাড়ির নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে কয়টা ঘর তৈরি করা যাবে, এমনকি কোন কক্ষের আকৃতি কী রকম হবে তা বলা মুশকিল হবে। এ ছাড়া তরকারি রান্নার সময় পরিমাণমতো বিভিন্ন প্রকার মসলা ব্যবহার করা খুবই জরুরি। জীবন বাঁচানোর যে ঔষধ তাও তৈরি করতে হয় পরিমাণ মতো এবং খেতেও হয় পরিমাণ মতো। এক কথায় দৈনন্দিন জীবনে প্রায় প্রতিটি কাজেই প্রয়োজন সঠিক পরিমাপের।

কাজ : দৈনন্দিন জীবনের দশটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করে একটি তালিকা তৈরি কর, যাতে সঠিক পরিমাপ প্রয়োজন।

পরিমাপের একক

কাজ : এক খণ্ড রশি (প্রায় ২০ ফুট) নিয়ে এটিকে তোমরা প্রত্যেকে আলাদা করে নিজ নিজ হাত দিয়ে মাপলে কি দেখতে পাবে? কার হাতে কত হাত হলো? যেহেতু তোমাদের প্রত্যেকের হাতের মাপ ভিন্ন, তাই নিজ নিজ হাত দিয়ে মাপলে রশিটির দৈর্ঘ্য একেকজনের জন্য একেক রকম হবে।

এক্ষেত্রে হয়ত দেখবে, একজন শিক্ষার্থী বলল যে, রশিটির দৈর্ঘ্য তার হাতে ১৬ হাত এবং অন্য একজন শিক্ষার্থী বলল যে, রাশিটির দৈর্ঘ্য তার হাতে ১৭ হাত। উপরোক্ত কাজটি থেকে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়? কীভাবে এই পার্থক্য দূর করা যায়? মূলত এই পার্থক্য দূর করার জন্য পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি আদর্শ পরিমাণকে বিবেচনা করা হয়। কোনো কিছু পরিমাপ করার জন্য একটি সুবিধাজনক পরিমাণকে আদর্শ হিসেবে ধরে নিতে হয়। কোনো একটি সুবিধাজনক ক্ষুদ্র অংশকে এই আদর্শ হিসেবে ধরা হয়। এই জানা আদর্শ অংশের পরিমাণই পরিমাপের একক। দৈর্ঘ্য পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি সুবিধাজনক দৈর্ঘ্য, ভর পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি সুবিধাজনক ভর এবং সময় পরিমাপের জন্য একটি সুবিধাজনক নির্দিষ্ট সময় আদর্শ হিসেবে ধরা হয়। নিজ নিজ নানা আদর্শ মানের সাথে তুলনা করেই সাধারণত দৈর্ঘ্য, ভর, সময়, তাপমাত্রা ইত্যাদি রাশি পরিমাপ করা হয়।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরিমাপকে একটি একক দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ধর তুমি একটি কক্ষের দৈর্ঘ্য মাপছ। দৈর্ঘ্য পরিমাপের পর তুমি বলছ ১০ মিটার। তুমি যদি কেবল ১০ বল তা কোনো অর্থ বহন করে না। অর্থাৎ পরিমাপকে প্রকাশ করার জন্য একটি সংখ্যা ও একটি এককের প্রয়োজন।

কাজ : তোমাদের (কমপক্ষে ১০ জন) নিজ নিজ পা দিয়ে শ্রেণি কক্ষের দৈর্ঘ্য মেপে তা একটি নির্দিষ্ট ছকে লিপিবদ্ধ কর।

পাঠ- ৬ : মৌলিক ও যৌগিক একক

আমরা যা পরিমাপ করি, তাকে সাধারণত রাশি বলি। যেমন: টেবিলের দৈর্ঘ্য একটি রাশি, উচ্চতা একটি রাশি। এই রাশিগুলো পরিমাপের জন্য বিভিন্ন রকমের একক আছে। যে কোনো একক দ্বারা কোনো কিছুকে সরাসরি পরিমাপ করা যায়। যেমন: এককের মাধ্যমে কোনো একটি বস্তুর দৈর্ঘ্য সরাসরি পরিমাপ করা যায়।

দৈর্ঘ্যের একক, ভরের একক, সময়ের একক, তাপমাত্রার একক, বিদ্যুৎ প্রবাহের একক, আলোক ঔজ্জ্বল্যের একক ও পদার্থের পরিমাণের একক, এই সাতটি একককে বর্তমানে মৌলিক একক হিসেবে ধরা হয়। অন্য কোনো রাশিকে পরিমাপ করার ক্ষেত্রে কেবল একটি মৌলিক একক দ্বারা এর পরিমাপকে প্রকাশ করা যায় না। যেমন: একটি শ্রেণিকক্ষের ক্ষেত্রফল পরিমাপের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্যের দুটি এককের গুণফলের ওপর নির্ভর করতে হয়। আয়তনের ক্ষেত্রে তিনটি এককের গুণফল দরকার। এই সমন্বিত একককই হলো যৌগিক বা লব্ধ একক।

যেমন : ক্ষেত্রফলের একক হলো দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের এককের গুণফল। অনুরূপভাবে আয়তনের একক হলো কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার এককের গুণফল। বেগের একক হলো দৈর্ঘ্যের একক ও সময়ের এককের অনুপাত।

এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি

কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয়ের বিভিন্ন একক পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যেমন: তোমার উচ্চতা কত? এর উত্তর বিভিন্ন রকম হতে পারে। সাধারণত আমরা বলি ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি। আবার জাতীয় নিবন্ধন ফরম বা পাসপোর্টের ফরম পূরণের সময় আমরা লিখেছি ১ মিটার ৬১ সেন্টিমিটার। এর মানে কী? একই পরিমাপের জন্য আমরা প্রচলিত বিভিন্ন একক পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকি। এগুলো এমকেএস (মিটার, কিলোগ্রাম, সেকেন্ড), এফপিএস (ফুট, পাউন্ড, সেকেন্ড) ও সিজিএস (সেন্টিমিটার, গ্রাম, সেকেন্ড) পদ্ধতি নামে প্রচলিত। দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন একক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। অর্থাৎ একই রাশি পরিমাপের জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন একক ব্যবহার করা হত। এককের এই বিভিন্নতার কারণে উদ্ভূত নানা অসুবিধার কথা বিবেচনা করে ১৯৬০ সাল থেকে পৃথিবীর সমগ্র দেশে একটি সাধারণ পরিমাপের পদ্ধতি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এটিকে **এসআই বা ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম অব ইউনিট** বলা হয়। এই আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে সকল ভৌত রাশির জন্য কেবল একটি নির্দিষ্ট একক নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন : দৈর্ঘ্যের একক মিটার, ভরের একক কিলোগ্রাম, সময়ের একক সেকেন্ড, তাপমাত্রার একক কেলভিন, বৈদ্যুতিক আধানের একক কুলম্ব, আলোক ঔজ্জ্বল্যের একক ক্যান্ডেলা ও পদার্থের পরিমাণের একক মোল। এগুলো বর্তমানে এস. আই. পদ্ধতির মৌলিক একক।

দৈর্ঘ্যের একক

বর্তমানে দৈর্ঘ্য পরিমাপে আন্তর্জাতিক একক হলো মিটার। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা ১৮৭৫ সালে একত্রে বসে দৈর্ঘ্যের এক মিটারের পরিমাণ নির্ধারণ করেন। তাঁরা প্লাটিনাম-ইরিডিয়াম নামক মিশ্রিত ধাতুর তৈরি একটি দণ্ডের দুই প্রান্তে দুটি দাগ দেন। শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ঐ দুটি নির্দিষ্ট দাগের মধ্যকার দূরত্বকে তাঁরা এক মিটার হিসেবে নির্ধারণ করেন।

দৈর্ঘ্যের এককের গুণিতক ও ভগ্নাংশ

আমরা যখন কাপড়, টেবিলের দৈর্ঘ্য কিংবা কক্ষের দৈর্ঘ্য মাপি, তখন 'মিটার' একককটি ব্যবহার করি। কিন্তু একটি পেনসিলের দৈর্ঘ্য মাপতে ব্যবহার করি সেন্টিমিটার (সংক্ষেপে সেমি)। আবার আমরা যখন একটি পয়সার পুরুত্ব মাপতে যাব, তখন আমরা কিন্তু এর চেয়েও ক্ষুদ্রতর একক ব্যবহার করে থাকি। এটি হলো মিলিমিটার (সংক্ষেপে মিমি)।

অন্যদিকে আমরা বেশি দূরত্ব পরিমাপ করতে (যেমন ঢাকা থেকে সিলেটের দূরত্ব) ব্যবহার করি কিলোমিটার (সংক্ষেপে কিমি)। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কিলোমিটার, মিটার, সেন্টিমিটার ও মিলিমিটারের প্রয়োগ খুবই বেশি দেখা যায়। এদের মধ্যে সম্পর্ক হলো–

১ কিলোমিটার	=	১০০০ মিটার
১ মিটার	=	১০০ সেন্টিমিটার
১ সেন্টিমিটার	=	১০ মিলিমিটার

পাঠ-৭ : ভরের একক

আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে ভরের একক হলো কিলোগ্রাম। সংক্ষেপে এটি কেজি হিসেবে পরিচিত। ফ্রান্সের সেভরেসে অবস্থিত ওজন ও পরিমাপের আন্তর্জাতিক সংস্থার অফিসে সংরক্ষিত একটি দণ্ডের ভরকে এক্ষেত্রে আদর্শ হিসাবে ধরা হয়েছে। কম ভরের জন্য ব্যবহৃত একক হলো গ্রাম। এ ছাড়া বেশি ভরের বস্তু পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় কুইন্টাল ও মেট্রিক টন।

১ মেট্রিক টন	=	১০ কুইন্টাল ;	১ কুইন্টাল	=	১০০ কিলোগ্রাম
১ কিলোগ্রাম	=	১০০০ গ্রাম ;	১ গ্রাম	=	১০০০ মিলিগ্রাম

সময়ের একক

একটু আগের বর্ণিত সকল পদ্ধতিতে সময়ের একক হলো সেকেন্ড। তবে দৈনন্দিন জীবনে সেকেন্ডের চেয়ে এর গুণিতাংশের এককগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন : মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাস, বছর ইত্যাদি। পৃথিবী নিজ অক্ষের চারপাশে ঘুরে এসে একই অবস্থায় পুনরায় ফিরে আসতে যে সময় লাগে, সেটি হলো ১ দিন। এক দিনের ২৪ ভাগের এক ভাগ হলো ১ ঘণ্টা। ১ ঘণ্টার ৬০ ভাগের ১ ভাগ হলো ১ মিনিট। ১ মিনিটের ৬০ ভাগের ১ ভাগই হলো আমাদের মৌলিক একক সেকেন্ড। সুতরাং,

১ দিন	=	২৪ ঘণ্টা
১ ঘণ্টা	=	৬০ মিনিট
১ মিনিট	=	৬০ সেকেন্ড

পাঠ ৮-৯ : দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের পরিমাপ

দৈর্ঘ্যের পরিমাপ

কাজ : প্রথমে সাদা কাগজে একটি সরল রেখাটান। এবার রেখাটির উপর একটি রুলার স্থাপন কর। রেখাটির দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে হবে। এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে তোমার চোখ যেন সঠিক অবস্থানে থাকে।

চিত্র ১.১ : দৈর্ঘ্য পরিমাপ

কাজ : কয়েকটি ৫০ পয়সার মুদ্রা একত্রে চিত্রের মতো করে রেখে এর উচ্চতা নির্ণয় কর।

সর্বমোট মুদ্রার সংখ্যা =

মোট উচ্চতা =

একটি মুদ্রার পুরুত্ব =

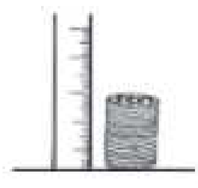

চিত্র ১.২ : পয়সার পুরুত্ব নির্ণয়

ভরের পরিমাপ

কাজ : একটি দাঁড়ি পাল্লার বাম পাল্লায় ১০০ গ্রামের একটি বাটখারা রাখ। এবার ডান দিকে একটির পর একটি মার্বেল দিতে থাক যতক্ষণ না বাম ও ডান পাল্লা সাম্যবস্থায় আসে।

........টি মার্বেলের ভর = ১০০ গ্রাম

অতএব, ১টি মার্বেলের ভর = ... গ্রাম

সময়ের ক্রমাঙ্কন/দাগাঙ্কন

কাজ : ছবির মতো স্কুলের সামনের মাঠে রৌদ্রের মধ্যে একটি লাঠি খাড়া করে বসিয়ে দাও। লক্ষ করলে দেখবে খাড়া কাঠিটির ছায়া পড়েছে। ঐ ছায়ার প্রান্তে এবার একটি দাগ দাও এবং ঘড়ি দেখে সময় লিখে রাখ। এবার প্রতিটি ক্লাসের পরে গিয়ে পুনরায় ছায়ার প্রান্তে দাগ দিয়ে ঘড়ি দেখে সময় লিখে রাখ। এভাবে প্রতি ঘণ্টার পরপর দাগ দিয়ে একটি সূর্যঘড়ি তৈরি কর যা দ্বারা ছায়া দেখে সময় বলে দিতে পারবে।

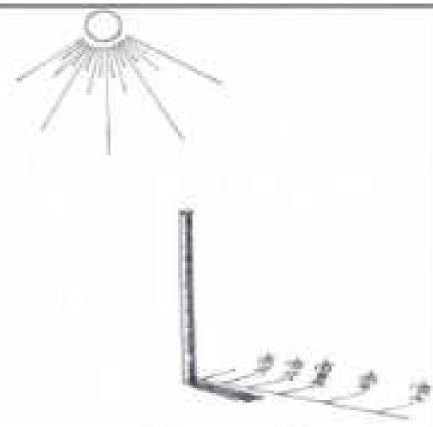
চিত্র ১.৩ : সূর্যঘড়ি

পাঠ- ১০ : ক্ষেত্রফল ও তার পরিমাপ

তুমি তোমার ষষ্ঠ শ্রেণির গণিত বইটি তোমার পড়ার টেবিলে রাখ। এখন একটু দেখার চেষ্টা কর এ রকম মোট কয়টি বই পড়ার টেবিলটিতে পাশাপশি রাখা যাবে। আবার এও কি বলতে পারবে যে তোমার পড়ার টেবিলটির সমান কয়টি টেবিল তোমার পড়ার কক্ষে রাখা যাবে? চিন্তা করছ যে, এই হিসাব তুমি কীভাবে বের করবে? আসলে এটি বোঝার জন্য তোমাকে তোমার পড়ার টেবিলের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে। ক্ষেত্রফলের মাধ্যমে টেবিলের পৃষ্ঠ বা ঘরের মেঝে কতটুকু ক্ষেত্র দখল করে আছে তা জানা যাবে। আয়তাকার ক্ষেত্রের এই পরিমাপ করতে হলে ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্যকে প্রস্থ দিয়ে গুণ করতে হয়। অর্থাৎ

আয়তাকার ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ

পাঠ-১১ : আয়তন ও তার পরিমাপ

সাধারণভাবেই বোঝা যায় যে তোমার জ্যামিতি বাক্সটি তোমার বিজ্ঞান বইয়ের তুলনায় কম স্থান দখল করে। আবার একটি ইট যে জায়গা দখল করে দুটি ইট তার চেয়ে বেশি স্থান দখল করে থাকে। কোনো বস্তু যে স্থান দখল করে তাকে এর আয়তন বলে। ফলে আমরা বলতে পারি, জ্যামিতি বাক্সটির আয়তন বিজ্ঞান বইয়ের আয়তনের চেয়ে কম কিংবা একটি ইটের আয়তন দুটি ইটের আয়তনের তুলনায় কম। আয়তাকার একটি ঘনবস্তুর আয়তন বের করতে হলে ক্ষেত্রফলকে উচ্চতা দিয়ে গুণ করতে হয়।

আয়তন = ক্ষেত্রফল × উচ্চতা = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা

আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে আয়তনের এককের নাম ঘনমিটার। ১ মিটার দৈর্ঘ্য, ১ মিটার প্রস্থ ও ১ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট একটি ঘনক্ষেত্র যে জায়গা দখল করে তা হলো ১ ঘনমিটার। ১ ঘনমিটার = ১ মিটার × ১ মিটার × ১ মিটার। সিজিএস পদ্ধতিতে আয়তনের একক ঘন সেন্টিমিটার। একে সংক্ষেপে সিসি (cubic centimetre) বলে। তরল পদার্থের আয়তন মাপা হয় লিটারে। ১০০০ সিসি = এক লিটার। এক সিসিকে এক মিলিলিটারও বলা হয়। সুতরাং ১ লিটার = ১০০০ সিসি = ১০০০ মিলিলিটার।

বিভিন্ন আকারের কঠিন বস্তুর আয়তন পরিমাপ

যে কোনো আয়তাকার ঘনবস্তু যেমন ইট বা ঘরের আয়তন সহজেই এদের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা মেপে গুণ করে বের করা যায়। কিন্তু অন্য আকৃতির কোনো বস্তু বা এবড়ো খেবড়ো বস্তুর আয়তন কীভাবে বের করব?

কাজ : সুতা দিয়ে আয়তাকার একটি ইটের টুকরা বাঁধ। এবার মাপচোঙে কিছু পানি নিয়ে তার আয়তনের পাঠ নাও। এবার সুতার সাহায্যে ঝুলিয়ে আয়তাকার ইটের টুকরোটিকে মাপচোঙের মধ্যে ডুবাও এবং পুনরায় পাঠ নাও। দুটি পাঠের পার্থক্য থেকে আয়তাকার ইটের টুকরার আয়তন বের করা যায়। এবার মাপার স্কেলের সাহায্যে আয়তাকার ইটের টুকরোটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা মেপে এর আয়তন মিলিয়ে নাও। এবার অন্য দুটি অসম কঠিন বস্তুর আয়তন নির্ণয়ের জন্য এদের পৃথকভাবে মাপচোঙের পানির মধ্যে ডুবাও। এবার আলাদা আলাদাভাবে পাঠ নিয়ে এদের আয়তন নির্ণয় কর।

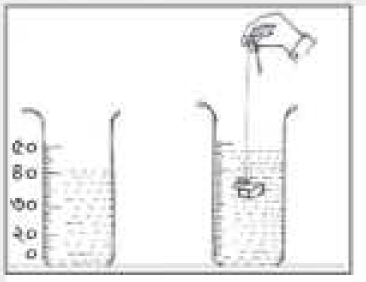

চিত্র ১.৪ : মাপচোঙ

সাবধানতা : মাপচোঙের পাঠ নেওয়ার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। প্রথমত: মাপচোঙটি একটি সমতল ক্ষেত্রের উপর সোজা রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত: পাঠ নেওয়ার সময় চোখকে পানির সমান্তরালে নিয়ে যেতে হবে।

পাঠ-১২ : তরল পদার্থের আয়তন নির্ণয়

আমরা সাধারণত তরল পদার্থের আয়তন মাপার জন্য একটি দাগাঙ্কিত মাপচোঙ ব্যবহার করে থাকি। নিচের দাগাঙ্কিত মাপচোঙটির সাহায্যে অন্যান্য সিলিন্ডারের তরলের আয়তন পরিমাপ করে খাতায় লিখ।

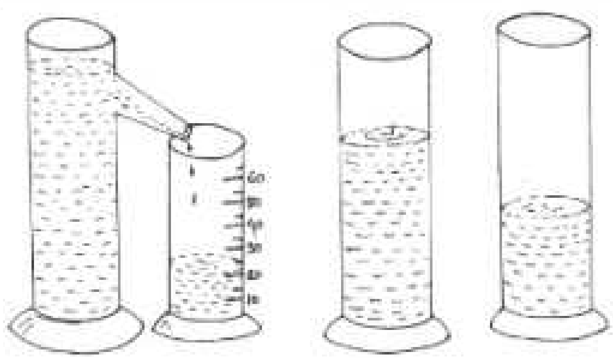

চিত্র ১.৫ : তরল পদার্থের আয়তন

তাপমাত্রার পরিমাপ

তুমি হয়ত বিভিন্নভাবে তাপমাত্রা শব্দটির সাথে পরিচিত। যেমন : টেলিভিশন অথবা রেডিয়োর খবরে চলতি দিনের বাতাসের তাপমাত্রা বলে দেওয়া হয়। তাছাড়া কারো জ্বর হলে আমরা তার দেহের তাপমাত্রা মেপে জেনে নিই। তাপমাত্রা পরিমাপের আন্তর্জাতিক একক হলো কেলভিন। তবে এখনও সারা বিশ্বে ব্যবহারিক কাজে বিশেষ করে দৈনিক তাপমাত্রা নির্ণয়ে বা জ্বর নির্ণয়ে সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট একক দুটি বহুলভাবে ব্যবহৃত।

কাজ : প্রথমে একটি ডাক্তারি থার্মোমিটার নাও। এবার এর সাহায্যে কীভাবে তাপমাত্রা নির্ণয় করতে হয় তা বুঝে নাও। সাধারণত থার্মোমিটারের গায়ে ফারেনহাইট স্কেলে ৯৪-১০৮ দাগাঙ্কিত করা থাকে। কোনো কোনো থার্মোমিটারে আবার একই সাথে সেলসিয়াস স্কেলে ৩৫-৪২ দাগাঙ্কিত করা থাকে। এবার লক্ষ করে দেখবে থার্মোমিটারের ভিতরে একটি পারদস্তম্ভ দেখা যাচ্ছে। এটি তাপমাত্রার বৃদ্ধির সাথে সাথে স্কেলের উচ্চতর মানের দিকে এগোতে থাকে। এবার তুমি থার্মোমিটারটিকে হাতের নিচে বা তোমার জিহ্বার নিচে রেখে দিলে ১ মিনিট পর দেখতে পাবে পারদস্তম্ভের উচ্চতার কোনো পার্থক্য হয়েছে কিনা। এ থেকে তুমি তোমার শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারবে।

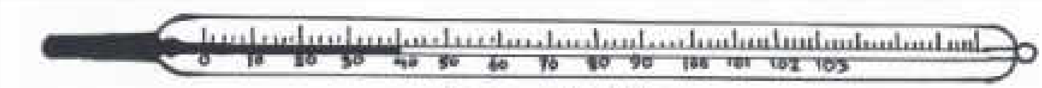

চিত্র ১.৬ : থার্মোমিটার

নতুন শব্দ : পরিমাপ, মৌলিক একক, যৌগিক একক, এসআই পদ্ধতি, মেট্রিক টন ও কুইন্টাল।

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- দৈনন্দিন জীবনে প্রায় প্রতিটি কাজেই প্রয়োজন সঠিক পরিমাপের।
- একটি জানা আদর্শ অংশের পরিমাণকে পরিমাপের একক হিসেবে ধরা হয়।
- মৌলিক একক সাতটি।
- একাধিক মৌলিক এককের সমন্বয়ে তৈরি হয় যৌগিক একক।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করো।

১. পরিমাপের একক দুই প্রকার -------------- ও --------------।

২. আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে এসআই এককের সংখ্যা ---------------টি।

৩. সকল পদ্ধতিতেই সময়ের একক --------------।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ভরের একক কোনটি?

ক. কিলোমিটার খ. কিলোগ্রাম

গ. কেলভিন ঘ. ক্যান্ডেলা

২. একটি ইট যে জায়গা দখল করে তাকে কী বলে?

ক. ক্ষেত্রফল খ. আয়তন

গ. ভর ঘ. দৈর্ঘ্য

নিচের চিত্র থেকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

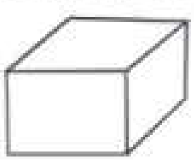

A

B

৩. **B** চিত্রে পাথরের আয়তন কত?

ক. ৫ ঘন সেমি খ. ১০ ঘন সেমি

গ. ১৫ ঘন সেমি ঘ. ২৫ ঘন সেমি

৪. **A** চিত্রে প্রদর্শিত বস্তুটির আয়তন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কয়টি এককের গুণফল দরকার?

ক. একটি খ. দুটি

গ. তিনটি ঘ. চারটি

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রতিটি পরিমাপ সঠিক হওয়া প্রয়োজন কেন? পরিমাপ সঠিক না হলে কী অসুবিধা?

২. মৌলিক একক কী কী?

৩. এককের গুণিতক বা ভগ্নাংশের প্রয়োজন কেন হয়?

৪. পরিমাপের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল ও আয়তনের মূল পার্থক্য কোথায়?

গাণিতিক সমস্যা

১. একটি আয়তাকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ৫ মিটার ও প্রস্থ ৪ মিটার হলে এর ক্ষেত্রফল কত?

২. একটি আয়তাকার কক্ষের ক্ষেত্রফল ২০ বর্গমিটার, কক্ষটির দৈর্ঘ্য ৫ মিটার হলে এর প্রস্থ কত?

৩. একটি বাক্স ২০ সেমি লম্বা, ১০ সেমি প্রস্থ এবং ৫ সেমি উঁচু। ১০০ খানা বাক্সের আয়তন কত?

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ফারহানের পড়ার ঘরের ক্ষেত্রফল ৪০ বর্গমিটার, যার দৈর্ঘ্য ১০ মিটার। তার পড়ার টেবিলের দৈর্ঘ্য ১ মিটার এবং প্রস্থ ৫০ সেমি। ফারহানের মা সমআকৃতির আরেকটি টেবিল সেই ঘরে রাখলেন।

ক. দৈর্ঘ্যের একক কী?

খ. পরিমাপের প্রয়োজন হয় কেন?

গ. ফারহানের পড়ার ঘরের প্রস্থ কত?

ঘ. টেবিল দুটি রাখার পর ঘরে কতটুকু জায়গা ফাঁকা থাকবে?

২. হোসেন উদ্দিন সরকার একজন রপ্তানিকারক। এ বছর তিনি বিদেশে ৫ মেট্রিক টন পাট রপ্তানি করেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পূর্বে F. P. S. পদ্ধতি ব্যবহার করলেও বর্তমানে M. K. S পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

ক. ক্যান্ডেলা কী?

খ. যৌগিক একক ব্যাখ্যা কর।

গ. এ বছর হোসেন উদ্দিন সরকার কত কিলোগ্রাম পাট রপ্তানি করলেন?

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদ্ধতি দুটির মধ্যে কোনটি সুবিধাজনক? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবজগৎ

ভীষণ বৈচিত্র্যময় এই পৃথিবী। আমরা আমাদের আশেপাশে একটু তাকালেই এই বৈচিত্র্যের দারুন সব উদাহরণ দেখতে পাই। এসব বস্তুর মধ্যে কারো জীবন আছে, আবার কারো জীবন নেই। চেয়ার, টেবিল, গাছপালা, দালান, গাড়ি, গ্লাস, কলম এসব হচ্ছে জড়বস্তুর নমুনা। আবার মানুষ, গরু, গাছ, মাছ, মশা, পিঁপড়া এসব হচ্ছে জীবের উদাহরণ। আবার এমন কিছু জীবও রয়েছে যাদের খালি চোখে দেখা যায় না। যেমন: ব্যাকটেরিয়া, অ্যামিবা ইত্যাদি। ছোটো থেকে বড়ো, মাটি থেকে পানি, বাতাসে উপস্থিত নানা প্রকারের জীব নিয়েই আমাদের এই জীবজগৎ গঠিত হয়েছে। সেসব নিয়েই এই অধ্যায়ের আলোচনা।

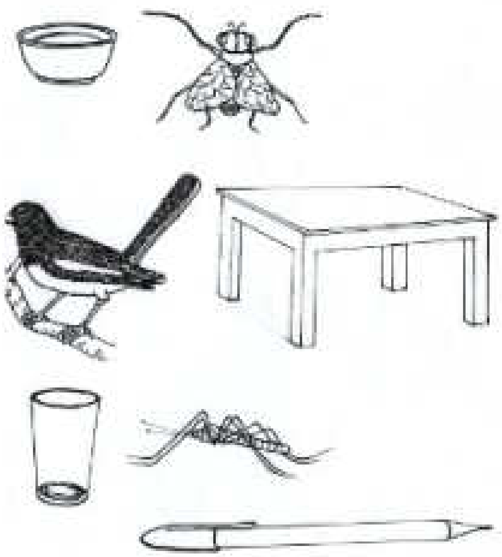

এই অধ্যায় শেষে আমরা

- জীবের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের আলোকে জীবজগতের শ্রেণিকরণ করতে পারব।
- সপুষ্পক ও অপুষ্পক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মেরুদণ্ডী এবং অমেরুদণ্ডী প্রাণীর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- চারপাশের জীবজগৎ সম্পর্কে সচেতন হব এবং মানবজীবনে এসব জীবের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হব।
- বিদ্যালয়ের চারপাশের পরিবেশে অবস্থিত জীবের শ্রেণিবিন্যাস করে পোস্টারে প্রদর্শন করতে পারব।

পাঠ-১ : জীব কি?

যার জীবন আছে তাকে জীব বলে। যেমন: গাছপালা, গরু, মাছ, পোকামাকড়, ব্যাঙের ছাতা, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি। কিন্তু এবার যদি প্রশ্ন করা হয়, জীবন কাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেয়া সম্ভব নয়। জীবনকে সংজ্ঞায়িত করতে হলে জীবের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যর কথা বলতে হয়। আর যাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাদেরকেই জীব হিসেবে অভিহিত করা হয়। একটি জীব যে সকল বৈশিষ্ট প্রদর্শন করে তা আলোচনা করা হলো।

চিত্র ২.১ : কতিপয় জীব ও জড়

পাঠ-২ : জীবের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

১। পুষ্টি লাভ: জীব টিকে থাকার জন্য পুষ্টি লাভ করে। খাদ্য থেকে এরা পুষ্টি লাভ করে। কোনো কোনো জীব নিজেই নিজের খাদ্য তৈরি করে। এরা স্বভোজী। আবার পরভোজী জীব অন্য জীব ভক্ষণ করে পুষ্টি লাভ করে।

২। বৃদ্ধি ও বিকাশ: জীবের বৃদ্ধি ঘটে। প্রতিটি জীব কোষ নামক গাঠনিক একক দিয়ে গঠিত। সময়ের সাথে জৈবিক প্রক্রিয়ায় জীবদেহে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবের বৃদ্ধি ঘটে ও পরিপূর্ণ জীব হিসেবে বিকাশ লাভ করে।

৩। শক্তির রূপান্তর: জীব তার দেহে উৎপন্ন শক্তির রূপান্তর ঘটায়। যেমন: প্রাণিদেহে উৎপন্ন শক্তি তার দেহের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে।

৪। প্রজনন: জীবের প্রজনন ঘটে। এই প্রক্রিয়ায় জীবের বংশবিস্তার হয়। মানুষ সন্তান সন্ততি উৎপাদনের মাধ্যমে বংশবিস্তার ঘটায়।

৫। পরিবেশের প্রতি প্রতিক্রিয়া: জীব বাহ্যিক পরিবেশের পরিবর্তনের প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রদান করে। আমাদের দেহে মশা বসলে আমরা তা মারার জন্য উদগ্রীব হই। অন্ধকার পরিবেশে জন্মানো গাছ আলোর সন্ধান পাবার জন্য আলোর দিকে দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

৬। অভিযোজন: প্রতিটি জীবের অভিযোজন ক্ষমতা আছে। পরিবেশের পরিবর্তনে টিকে থাকার জন্য জীব হাজার বছরের ব্যবধানে অভিযোজন ক্ষমতা লাভ করে। যেমন, মরুভূমিতে জন্মানো অধিকাংশ গাছের পাতা চ্যাপ্টা ও কাঁটাযুক্ত হয়। উদ্ভিদের এই বৈশিষ্ট্যগুলো এদের পানি সাশ্রয়ে সাহায্য করে। দীর্ঘ অভিযোজনের ফলে উদ্ভিদে এই বৈশিষ্ট্যগুলো সংযোজিত হয়েছে।

উপরে উল্লিখিত এই বৈশিষ্ট্যগুলো সকল জীবে দেখা যায়। পক্ষান্তরে জড় বস্তুতে এই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায় না।

২০২৫

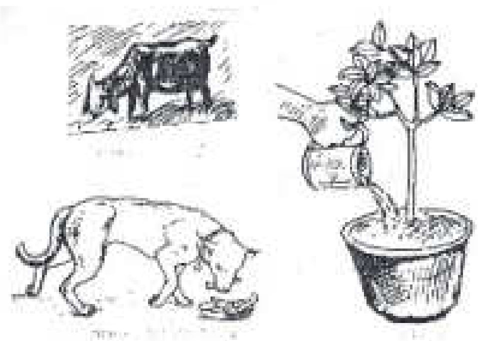

চিত্র ২.২: জীবের খাদ্য গ্রহণ

> **কাজ: দলগত কাজ**
> তোমার পরিবেশ থেকে একটি উদ্ভিদ সংগ্রহ করো। এর মধ্যে জীবের কী কী বৈশিষ্ট্য আছে তা পোস্টার কাগজে লেখ এবং বোর্ডে প্রদর্শন করো।

পাঠ-৩ : জীবের শ্রেণিকরণ

বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীতে প্রায় ৮৭ লক্ষ ভিন্ন ভিন্ন রকমের জীব রয়েছে। বৈচিত্র্যময় এই জীবকূলকে সহজভাবে জানার জন্য বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীর সমস্ত জীবকে তাদের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবন্ধকরণের চেষ্টা করেছেন। ১৯৬৯ খ্রী. বিজ্ঞানী হুইটেকার পঞ্চরাজ্য শ্রেণিবিন্যাস প্রবর্তন করেন। ১৯৭৪ খ্রি. বিজ্ঞানী মার্গিউলিস (Margulis) উক্ত শ্রেণিবিন্যাসকে পুনর্বিন্যাস করে জীবজগতের আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস প্রবর্তন করেন। আধুনিক শ্রেণিবিন্যাসটি নিম্নরূপ:

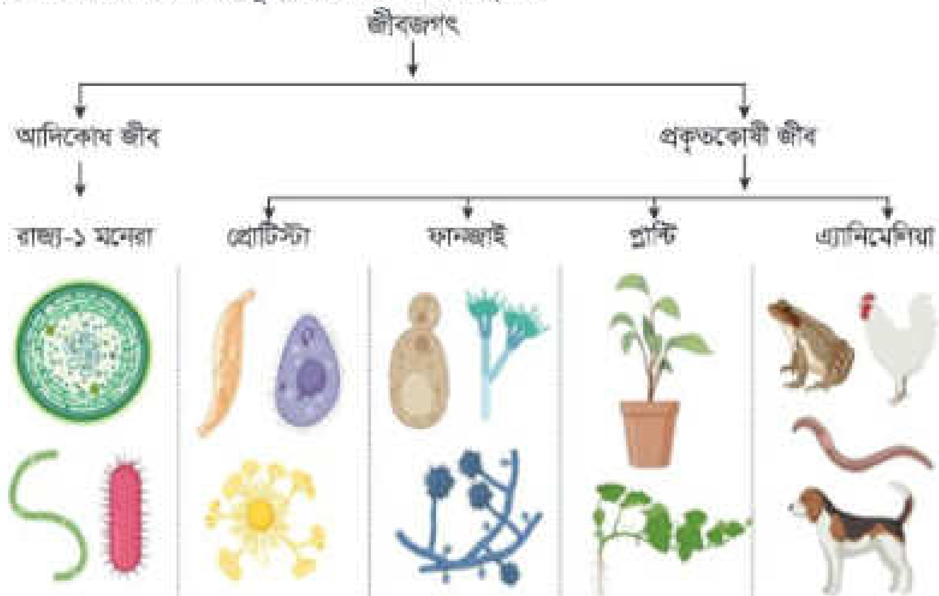

রাজ্য-১: মনেরা : এ রাজ্যের অধীনে বিন্যস্ত জীবের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো: ক) জীবটি এককোষী এবং এর কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না খ) এরা খুবই ক্ষুদ্র এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদের দেখা যায় না। উদাহরণ: ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া, স্পাইরোগাইরা ইত্যাদি।

রাজ্য-২: প্রোটিস্টা: এর অধীনে ঐ সকল জীবকে বিন্যস্ত করা হয়, যাদের কোষ সুগঠিত নিউক্লিয়াসযুক্ত এরা এককোষী বা বহুকোষী ক্লোরোফিল যুক্ত একক বা দলবদ্ধভাবে থাকতে পারে। উদাহরণ: ইউগ্লেনা, অ্যামিবা ইত্যাদি।

রাজ্য-৩: ফানজাই বা ছত্রাক : এদের দেহে সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে। এরা সাধারণত এককোষী বা বহুকোষী হয়। দেহে ক্লোরোফিল নেই, তাই এরা পরভোজী। উদাহরণ- ইস্ট, পেনিসিলিয়াম, মাশরুম ইত্যাদি।

রাজ্য- ৪: প্লান্টি (উদ্ভিদজগৎ) : অধিকাংশ উদ্ভিদ নিজেই নিজের খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। এদের দেহ অসংখ্য কোষ দিয়ে গঠিত। এদের কোষপ্রাচীর সেলুলোজ দ্বারা নির্মিত। এদের কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস ও কোষ গহ্বর বিদ্যমান। উদ্ভিদে সবুজ কণিকা বা ক্লোরোফিল থাকে, তাই এরা খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। উদাহরণ: আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি।

সুবিশাল উদ্ভিদজগৎকে তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে আবার নানা ভাগে বিভক্ত করা যায় জর্জ বেনথাম ও ডাল্টন হুকার এর প্রাকৃতিক শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী উদ্ভিদ জগৎকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

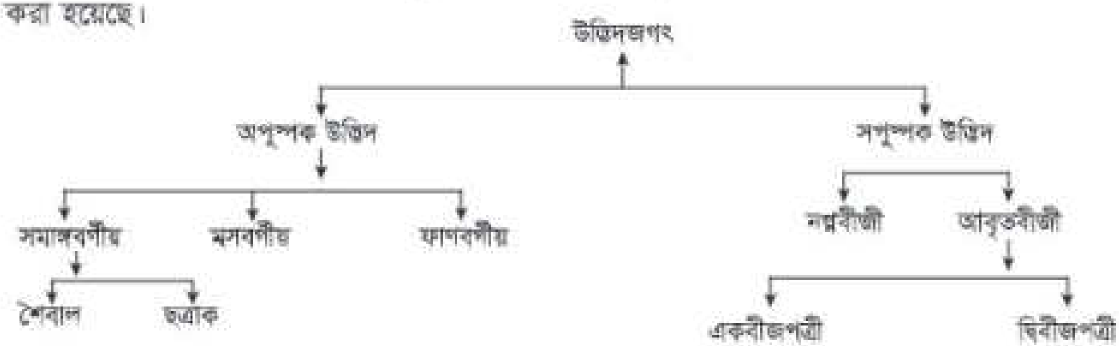

অপুষ্পক উদ্ভিদ

যেসব উদ্ভিদে ফুল, ফল ও বীজ উৎপন্ন হয় না তাদেরকে অপুষ্পক উদ্ভিদ বলে। যেমন: মস, ফার্ন ইত্যাদি। এরা স্পোর বা রেনুর মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে থাকে। অপুষ্পক উদ্ভিদকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

সমাঙ্গবর্গীয় উদ্ভিদ: এসব উদ্ভিদের দেহ মূল, কান্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায় না। এদের মধ্যে যাদের ক্লোরোফিল আছে, ফলে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে তারা শৈবাল। যেমন: স্পাইরোগাইরা। আর যাদের দেহে ক্লোরোফিল নেই, ফলে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না, তারা ছত্রাক। যেমন: এগারিকাস।

স্পাইরোগাইরা

এগারিকাস

চিত্র ২-৩ : সমাঙ্গবর্গীয় উদ্ভিদ

১৩৫

মসবর্গীয় উদ্ভিদ: এদের দেহ কান্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায়। কিন্তু এদের মূল নেই, মূলের পরিবর্তে রাইজয়েড নামক সূত্রাকার অঙ্গ থাকে। সাধারণত এরা পুরানো ভেজা দেয়ালে কার্পেটের মতো নরম আস্তরণ করে জন্মায়। যেমন: ব্রায়াম।

ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদ: ফার্নবর্গীয় উদ্ভিদের দেহ মূল, কান্ড ও পাতায় বিভক্ত। এদের দেহে পরিবহণ টিস্যু রয়েছে ও কচি পাতাগুলো কুন্ডলীত থাকে। বাড়ির পাশে স্যাতস্যাতে ছায়াযুক্ত স্থানে এবং পুরানো দালানের প্রাচীরে এদের জন্মাতে দেখা যায়। যেমন: টেরিস।

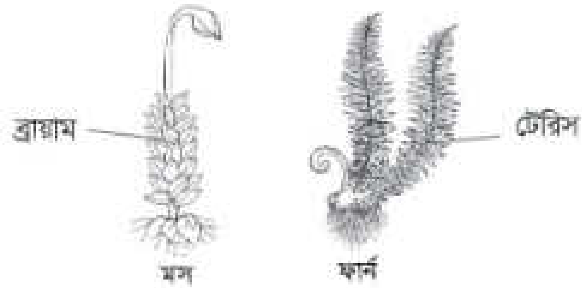

চিত্র-২.৪ : মস ও ফার্ন

> **কাজ:** ঢেঁকিশাক, লালশাক, লাউশাক, গম, সরিষা ইত্যাদি সংগ্রহ করে আনো এবং কোনটি ফার্ন নয় তা খাতায় লিখ।

সপুষ্পক উদ্ভিদ

উদ্ভিদে ফুলের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর নির্ভর করে উদ্ভিদকে সপুষ্পক ও অপুষ্পক এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেসব উদ্ভিদে ফুল উৎপন্ন হয় তাদেরকে সপুষ্পক উদ্ভিদ বলে। যেমন: আম, কাঁঠাল, ধান, নারিকেল ইত্যাদি। এদের দেহ সুস্পষ্টভাবে মূল, কাণ্ড এবং পাতা বিভক্ত। ফুলের মাধ্যমে পরাগায়ন প্রক্রিয়ায় এদের বংশবিস্তার ঘটে। বীজের আবরণের উপর নির্ভর করে সপুষ্পক উদ্ভিদকে আবার নগ্নবীজী এবং আবৃতবীজী এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। নগ্নবীজী উদ্ভিদের ফুলে গর্ভাশয় থাকে না বলে ফল উৎপন্ন হয় না। তাই বীজ নগ্ন অবস্থায় থাকে। উদাহরণ: সাইকাস, পাইনাস ইত্যাদি। আর আবৃতবীজী উদ্ভিদের ফুলে গর্ভাশয় থাকায় ফল উৎপাদন হয় এবং বীজ আবৃত থাকে। উদাহরণ: আম, জাম, সুপারি ইত্যাদি।

চিত্র ২-৫: আবৃতবীজী উদ্ভিদ

চিত্র ২-৬ : নগ্নবীজী উদ্ভিদ

রাজ্য-৫: এ্যানিমেলিয়া (প্রাণিজগৎ)। এসব জীবের কোষে সেলুলোজ নির্মিত কোষপ্রাচীর থাকে না। সাধারণত এ কোষগুলোতে প্লাস্টিডও থাকে না। তাই খাদ্যের জন্য এরা উদ্ভিদের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। উদাহরণ- মাছ, পাখি, গরু, মানুষ ইত্যাদি।

প্রাণীজগৎকে আবার নানাভাবে ভাগ করা যায়।

মেরুদন্ডের উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রাণীজগৎকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী। মাছ, ব্যাঙ, পাখি, টিকটিকি, গরু, ছাগল, মানুষ ইত্যাদির মেরুদন্ড আছে। মেরুদন্ড আছে বলে এরা মেরুদণ্ডী প্রাণী। মশা, মাছি, প্রজাপতি, চিংড়ি, কাঁকড়া, কেঁচো এরা অমেরুদণ্ডী প্রাণী। অর্থাৎ এদের মেরুদন্ড নেই।

কাজ: শ্রেণির ৪/৫ জন করে কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে বিদ্যালয়ের চারদিকের দেখা প্রাণীগুলোর নাম খাতায় লিখে আনবে। অতঃপর প্রতিটি দল তাদের দেখা প্রাণীগুলোকে মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীতে শ্রেণিকরণ করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। এক দল উপস্থাপনের সময় অন্যরা প্রশ্ন থাকলে তা করবে।

অমেরুদণ্ডী প্রাণী:

অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মেরুদন্ড নেই, এদের দেহের ভিতর কঙ্কাল থাকে না, চোখ সরল প্রকৃতির বা একটি চোখের মধ্যে অনেকগুলো চোখ থাকে যা পুঞ্জাক্ষি। এদের লেজ নেই।

অমেরুদণ্ডী প্রাণী নানা ধরনের হয়। অনেক অমেরুদণ্ডী প্রাণী আকারে খুবই ছোটো, এদের খালিচোখে দেখা যায় না। অ্যামিবা এমন একটি প্রাণী। কেঁচো, জোঁক একদলভুক্ত অমেরুদণ্ডী প্রাণী, এদের দেহ অনেকগুলো খণ্ডে বিভক্ত থাকে। শামুক ও ঝিনুক আরেক দলভুক্ত প্রাণী, এদের দেহ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত নয় এবং দেহ সাধারণত শক্ত খোলসে আবৃত থাকে। মাংসল পা থাকে। প্রজাপতি, মশা, মাছি, তেলাপোকা, উইপোকা, মৌমাছি ইত্যাদি পতঙ্গ দলভুক্ত প্রাণী। পৃথিবীতে পতঙ্গ শ্রেণিভুক্ত প্রাণীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।

চিত্র ২.৭ : অমেরুদণ্ডী প্রাণী

এদের দেহ তিনটি অংশে বিভক্ত যথা : মস্তক, বক্ষ ও উদর। এদের সন্ধিযুক্ত পা ও পুঞ্জাক্ষি থাকে। অনেক পতঙ্গ আমাদের উপকার করে। এরা উপকারী পতঙ্গ। যেমন : মৌমাছি, রেশম পোকা ইত্যাদি। মশা ও মাছি নানা রকম রোগ ছড়ায়। অনেক পতঙ্গ আবার আমাদের ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র ও ফসলের ক্ষতিসাধন করে যেমন : উইপোকা, লেদাপোকা, পামরীপোকা ইত্যাদি। এমন কতকগুলো সামুদ্রিক প্রাণী আছে, যাদের ত্বকে কাঁটার মতো অংশ থাকে। তারামাছ ও সামুদ্রিক শশা এই দলভুক্ত প্রাণী। জেলী মাছ, প্রবালকীট আরেক দলভুক্ত অমেরুদণ্ডী প্রাণী। এদের দেহের ভিতর একটা ফাঁপা গহ্বর বা সিলেন্টেরন থাকে। এদের দেহে একটি মাত্র ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রপথে এরা খাদ্য গ্রহণ করে আবার বর্জ্য পদার্থ বের করে দেয়।

মেরুদণ্ডী প্রাণী:

এদের মেরুদণ্ড আছে। দেহের ভিতর কঙ্কাল থাকে। পাখনা বা দুই জোড়া পা থাকে। চোখ সরল প্রকৃতির। মানুষ ছাড়া সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর লেজ থাকে। এরা ফুলকা বা ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে বেশ কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। সকল মাছ মৎস্য শ্রেণিভুক্ত প্রাণী। এরা পানিতে বাস করে। বেশির ভাগ মাছের গায়ে আঁইশ থাকে। যেমন- ইলিশ, রুই, কৈ ইত্যাদি। আবার কতকগুলোর আঁইশ থাকে না। যেমন- মাগুর, শিং, টেংরা, বোয়াল ইত্যাদি। মাছ ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। এদের পাখনা আছে, পাখনার সাহায্যে এরা সাঁতার কাটে।

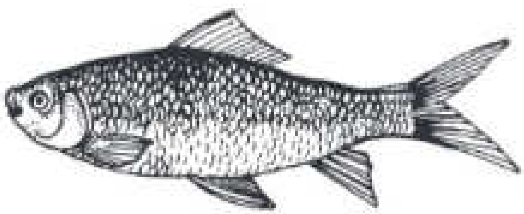

চিত্র ২.৮ : রুই মাছ

ব্যাঙ উভচর শ্রেণিভুক্ত প্রাণী। এদের জীবনের কিছু সময় ডাঙ্গায় ও কিছু সময় পানিতে বাস করে। এদের ত্বকে লোম, আঁইশ বা পালক কিছুই থাকে না। দুই জোড়া পা থাকে, পায়ের আঙুলে কোনো নখ থাকে না। ব্যাঙাচি অবস্থায় এরা ফুলকা ও পরিণত অবস্থায় ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।

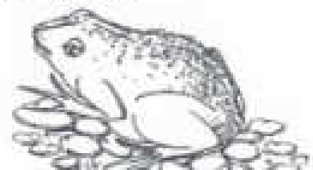

চিত্র ২.৯ : ব্যাঙ

টিকটিকি, কুমির, সাপ, গিরগিটি ইত্যাদি সরীসৃপ শ্রেণিভুক্ত প্রাণী। এরা বুকে ভর দিয়ে চলে, আঙুলে নখ থাকে, ডিম পাড়ে, ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।

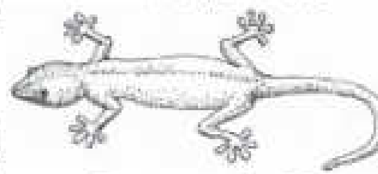

চিত্র ২.১০ : টিকটিকি

হাঁস, মুরগি, কবুতর, দোয়েল ইত্যাদি পাখি পক্ষী শ্রেণিভুক্ত প্রাণী। এদের দেহ পালক দিয়ে আবৃত থাকে। পালক পাখি চেনার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। পাখি ছাড়া আর কোনো প্রাণীর পালক নেই। বেশিরভাগ পাখিই আছে যারা উড়তে পারে। উট পাখি, পেঙ্গুইন এবং আরও কিছু পাখি আছে যারা উড়তে পারে না। পাখি ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাচ্চা হয়।

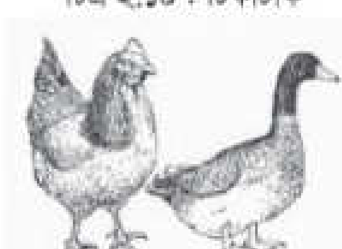

চিত্র ২.১১ : হাঁস ও মুরগি

বানর, ইঁদুর, কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল ইত্যাদি স্তন্যপায়ী শ্রেণিভুক্ত প্রাণী। মানুষও এই দলের অন্তর্ভুক্ত। এদের দেহে লোম থাকে, বাচ্চা মায়ের দুধ খেয়ে বড়ো হয়, মায়েরা বাচ্চা প্রসব করে। স্তন্যপায়ী প্রাণী মাছ, ব্যাঙ, সাপ, পাখি ইত্যাদি থেকে বুদ্ধিমান। এদের মস্তিষ্ক ও দেহের গঠন বেশ উন্নত।

চিত্র ২.১৩ : মানুষ ও ইঁদুর

নিচের ছকটি তোমার বিজ্ঞানের খাতায় এঁকে নিয়ে পূরণ কর। প্রতিটি প্রাণীর নিচে তিনটি বৈশিষ্ট্যের যেকোনো একটিতে টিক চিহ্ন দাও। যেমন : রুই মাছে আঁইশ আছে। তাই রুই মাছের কলামে আঁইশের জায়গায় টিক (✓) চিহ্ন দাও।

	কাক	রুই মাছ	টিকটিকি	সোনা ব্যাঙ	ইলিশ মাছ	কুকুর	মুরগি	সাপ	ছাগল	কুনো ব্যাঙ
দেহ-আবরক লোম আছে পালক আছে আঁইশ আছে কিছুই নেই										
উপাঙ্গসমূহ ডানা আছে পা আছে কিছুই নেই										
মুখ-গহ্বর সহজে দাঁত দেখা যায় দাঁত ছোটো দাঁত নেই										

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- জীব নড়াচড়া করে, পুষ্টি, প্রজনন, শ্বসন, অনুভূতি, অভিযোজন, বৃদ্ধি ও রেচন হয়।
- জীবজগতের পাঁচটি রাজ্য, যথা- মনেরা, প্রোটিস্টা, ফানজাই বা ছত্রাক, উদ্ভিদ ও প্রাণী।
- অপুষ্পক উদ্ভিদ যেমন- সমাঙ্গ উদ্ভিদ, মস ও ফার্ন।
- সপুষ্পক উদ্ভিদ যেমন- নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর।

১. শামুকের দেহে -------- ও -------- থাকে।

২. স্তন্যপায়ী প্রাণীর --------- বেশ উন্নত।

৩. উদ্ভিদে সবুজ কণিকা থাকে, তাই তারা --------।

৪. ছত্রাক অসবুজ তাই তারা নিজের --------তৈরি করতে পারে না।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইউগ্লেনা কোন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত?

ক. মনেরা
খ. প্রোটিস্টা
গ. প্লান্টি
ঘ. ফানজাই

২. পরভোজী জীবের বৈশিষ্ট্য হলো, এরা -

i. সূর্যালোকের উপস্থিতিতে খাদ্য তৈরি করে
ii. জীবিত জীব থেকে খাদ্য শোষণ করে
iii. মৃত জীবের দেহাবশেষ গ্রহণ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

জায়ান গ্রামে গিয়ে দেখল তার চাচা সন্ধিযুক্ত পা ও পুঞ্জাক্ষিবিশিষ্ট এক ধরনের প্রাণী খুব যত্নের সাথে পালন করছে, যা উড়ে বেড়ায় ও ডিম পাড়ে। একটি গাছের ডালে সে অন্য একটি প্রাণী দেখল যা উড়ে বেড়ালেও ডিম পাড়ে না এবং মাতৃদুগ্ধ পান করে।

৩. জায়ানের চাচা কোন প্রাণীটি পালন করছে?

ক. পামরীপোকা
খ. উইপোকা
গ. প্রজাপতি
ঘ. মৌমাছি

৪. গাছের ডালের প্রাণীটি -

i. আঙুলে নখযুক্ত
ii. গায়ে লোমযুক্ত
iii. বাচ্চা প্রসব করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. একটি ব্যাঙ, একটি ছোট চারাগাছ ও একটি চশমা যদি একটি কাচের জার দিয়ে ১৫ দিন ঢেকে রাখা যায় তাহলে এর ফলাফল কী হবে খাতায় লিখ।

২. উভচর প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগুলো উলেখ কর।

৩. শৈবাল, মস ও ফার্নের পার্থক্যগুলো কী কী?

৪. মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর পার্থক্যগুলো লিখ।

৫. নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

চিত্র- A

চিত্র- B

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ক. মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী কাকে বলে?

খ. কুনো ব্যাঙকে উভচর প্রাণী বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর?

গ. A ও B চিত্রের প্রাণীর পার্থক্য লিখ?

ঘ. আমাদের জীবনে B প্রাণীর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

২। ক. সপুষ্পক উদ্ভিদ কাকে বলে?

খ. 'ক' উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ কর?

গ. 'ক' ও 'খ' উদ্ভিদের এর পার্থক্য লিখ।

ঘ. আমাদের জীবনে 'ক' উদ্ভিদের গুরুত্ব আলোচনা কর।

'ক'

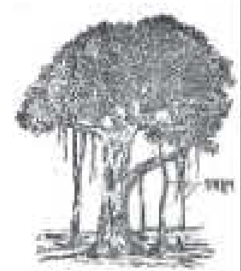

'খ'

নিজেরা কর

বাঘ, ছাগল, গরু, সাপ, ইলিশ, হাতি, তিমি, টিকটিকি, ব্যাঙ, গুঁইসাপ, কুমির, রূপচাদা, উট, কাক, কোকিল, শালিক, বানর, টিয়া, ঈগল, চিল, কই, শিং, রুই, হরিণ ও শেয়াল।

উপরের তালিকাটি দেখে নিচের ছকটি পূরণ কর :

প্রাণীর নাম	মৎস্য	উভচর	সরীসৃপ	পাখি	স্তন্যপায়ী

তৃতীয় অধ্যায়

উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষীয় সংগঠন

আমাদের চারপাশে দৃশ্যমান সকল জীব থেকে শুরু করে খালি চোখে দেখতে না পাওয়া অণুজীব সকলেই কোষ দিয়ে গঠিত। কোষ জীবদেহের গাঠনিক একক এবং কোষের অভ্যন্তরেই জীবের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জৈবরাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয়। এই অধ্যায়ে আমরা জীবের কোষ নিয়ে প্রাথমিক ধারণা লাভ করার চেষ্টা করব।

এই অধ্যায় শেষে আমরা

- কোষ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের পার্থক্যকারী প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীবদেহে কোষের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীবদেহের নানা কার্যক্রমে কোষের অবদান উপলব্ধি করতে পারব।
- উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করতে পারব।

পাঠ-১ : কোষ

জীবদেহের গঠন ও কাজের একক কোষ। পৃথিবীতে অনেক জীব আছে যারা একটি মাত্র কোষ দিয়ে গঠিত। যেমন: ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া ইত্যাদি। আবার অনেক জীব বহুসংখ্যক কোষ দিয়ে গঠিত। যেমনঃ মানুষ, গাছ, পাখি দেহ অসংখ্য কোষ দিয়ে গঠিত। কোষ একটির সাথে আরেকটি যুক্ত হয়ে জীবদেহ গঠন করে। এটি অনেকটা ইট দিয়ে তৈরি করা ভবনের মতো।

তোমার স্কুলের ভবনটির কথা ভাবো। একতলা হোক বা পাঁচতলা, এই ভবনটি কিন্তু তৈরি হয়েছে একের পর এক ইট গেঁথে। তাই ইটগুলোকে আমরা বলতে পারি ভবন তৈরির একক। ঠিক এমনিভাবে আমাদের জানা অজানা যত ছোটো ও বড়ো জীব আছে তাদেরও গঠনের মূলে রয়েছে কিছু গাঠনিক একক। তোমার সম্পূর্ণ শরীর, প্রিয় পোষা প্রাণী কিংবা মাঠের গাছ সবকিছুর গঠনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে ওই এককসমূহ।

জীবজগতের অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য কোষ দিয়ে গঠিত। জীবের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন কাজে কোষগুলো যুক্ত থাকে। কাজের উপর ভিত্তি করে বহুকোষী জীবে কোষের আকৃতি নানা রকমের হয়ে থাকে। বহুকোষী একটি জীবের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য সব ধরনের কোষেরই সঠিকভাবে কাজ সম্পন্ন এবং সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়।

কোষ আণুবীক্ষণীক বস্তু। অর্থাৎ, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া কোষ দেখা যায় না। ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক সর্বপ্রথম অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কোষ প্রত্যক্ষ করেন। ১৬৬৫ সালে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বোতলের ছিপি পরীক্ষা করার সময় তিনি মৌচাকের ন্যায় অসংখ্য কুঠরি পরপর সাজানো দেখতে পান। তিনি বোতলের ছিপির গঠনকারী এই এককগুলোর নাম দেন কোষ।

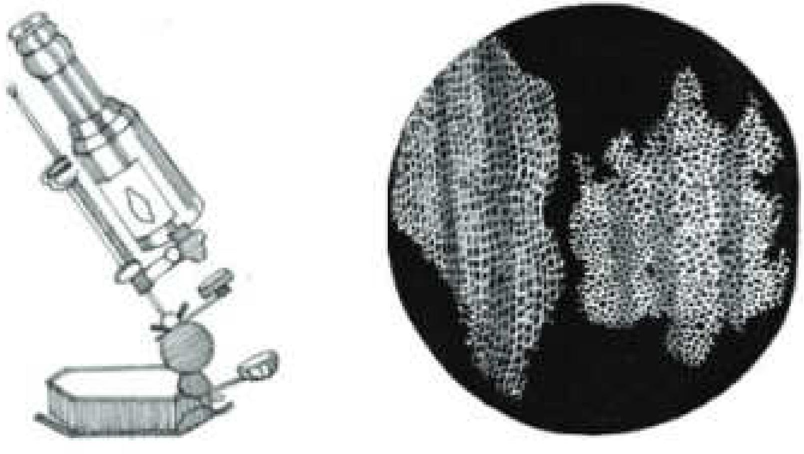

চিত্র ৩.১ রবার্ট হুকের অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং রবার্ট হুকের দেখা বোতলে ছিপির কোষ

অণুবীক্ষণ যন্ত্র

অণুবীক্ষণ যন্ত্র এমন এক প্রকার যন্ত্র যা দিয়ে অতি ক্ষুদ্র বস্তুকে বড়ো আকারে দেখা যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় ষোড়শ শতাব্দীতে। পরবর্তীতে এন্টনি ফন লিউয়েন হুক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এরপর আরও অনেকের দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে বর্তমান সময়ের যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা খুব সহজেই এককোষী ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে বহুকোষী উদ্ভিদ এবং প্রাণীর কোষ পর্যবেক্ষণ করতে পারি।

বৃহদাকার জীবদেহেও ছোটো আকারের অসংখ্য কোষ থাকে। একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে তুমি যদি বিভিন্ন কোষের দিকে তাকাও, দেখতে পাবে যে বিভিন্ন কোষের আকৃতিতে ভিন্নতা রয়েছে। কিছু কোষ লম্বাকৃতির, কিছু দেখতে গোলাকার কিংবা দণ্ডাকার, সহ বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে। কিছু কোষ আছে যার কোনো নির্দিষ্ট আকৃতি নেই, অর্থাৎ এদের আকৃতি পরিবর্তনশীল।

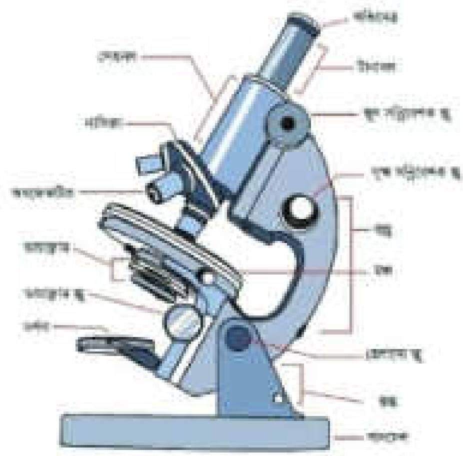

চিত্র ৩.২: একটি যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র

কাজ : শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র পর্যবেক্ষণ কর এবং বিভিন্ন অংশের নাম লিখ।

পাঠ ২ : জীবকোষের প্রকারভেদ

নিউক্লিয়াসের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ভিত্তিতে কোষকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- আদি কোষ ও প্রকৃত কোষ। আদি কোষের নিউক্লিয়াস কোনো আবরণী দ্বারা আবদ্ধ নয়। যেমন- ব্যাকটেরিয়া। প্রকৃত কোষের নিউক্লিয়াসে আবরণ থাকে। প্রকৃত কোষকে তাদের কাজের ভিত্তিতে দু'ভাগে ভাগ করা হয়, যথা- দেহকোষ ও জননকোষ। দেহকোষ দেহের গঠন ও বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করে। এসব কোষ বিভাজনের কারণে জীবদেহ বৃদ্ধি পায়। জননকোষের কাজ হলো জীবের প্রজননে অংশ নেওয়া। জীবের দেহে বিভিন্ন আকার আকৃতির কোষ দেখা যায়, যেমন- গোলাকার, ডিম্বাকার, আয়তাকার ইত্যাদি। সাধারণত কোষ এতই ক্ষুদ্র যে খালি চোখে দেখা যায় না।

নতুন শব্দ : প্রোটোপ্লাজম, দেহকোষ, জননকোষ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

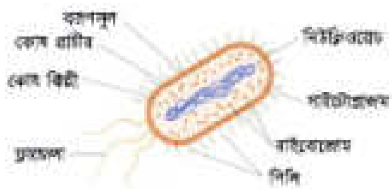

চিত্র ৩.৩: অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা একটি ব্যাকটেরিয়া কোষ

পাঠ ৩ - ৬ : একটি জীবকোষের গঠন

একটি জীবকোষ এতই ছোট যে তা খালি চোখে দেখা যায় না। তাই বলে মানুষ কিন্তু বসে নেই। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই কোষ বেশ ভালোভাবে দেখা যায়। বর্তমানে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে কোষের সূক্ষ্ম অংশগুলোও ভালো দেখা যাচ্ছে। এর ফলে কোষে অনেকগুলো অঙ্গাণু আবিষ্কৃত হয়েছে। এবার কোষের প্রধান প্রধান অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ক) কোষপ্রাচীর : শুধু উদ্ভিদ কোষে কোষপ্রাচীর দেখা যায়। প্রাণী কোষে কোনো কোষপ্রাচীর নেই। এটি জড় পদার্থের তৈরি। কোনো কোনো কোষের প্রাচীরে ছিদ্র থাকে। এদের কূপ বলে। কোষপ্রাচীর কোষের আকার প্রদান করে এবং ভেতর ও বাইরের মধ্যে তরল পদার্থ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। এরা ভিতরের অংশকে রক্ষা করে।

খ) প্রোটোপ্লাজম : কোষপ্রাচীরের অভ্যন্তরে পাতলা পর্দাবেষ্টিত জেলীর ন্যায় থকথকে আধা তরল বস্তুটিকে প্রোটোপ্লাজম বলে। একে জীবনের ভিত্তি বলা হয়। এর তিনটি অংশ, যথা- কোষঝিল্লি, সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস।

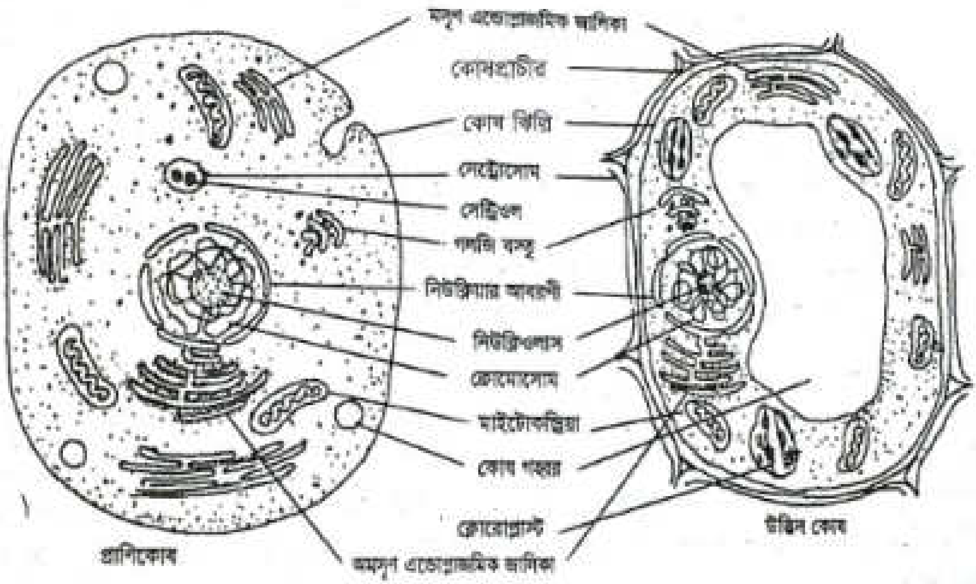

চিত্র ৩.৪: অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা প্রাণী ও উদ্ভিদ কোষ

১। কোষঝিল্লি : সম্পূর্ণ প্রোটোপ্লাজমকে ঘিরে যে নরম পর্দা দেখা যায় তাকে কোষঝিল্লি বা সেল মেমব্রেন বলে। এটি কোষের ভেতর ও বাইরের মধ্যে পানি, খনিজ পদার্থ ও গ্যাস এর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

২। সাইটোপ্লাজম : প্রোটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াসকে বাদ দিলে যে অর্ধতরল অংশটি থাকে, তাকে সাইটোপ্লাজম বলে। এর প্রধান কাজ কোষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গাণুগুলোকে ধারণ করা। কিছু শারীরবৃত্তীয় কাজ এখানে সম্পন্ন হয়, যেমন- সালোকসংশ্লেষণ। সাইটোপ্লাজমে দেখা যায়, এমন কয়েকটি ক্ষুদ্রাঙ্গের পরিচিতি নিম্নে দেওয়া হলো :

(ক) প্লাস্টিড : এগুলোকে বর্ণাধারও বলে। সাধারণত প্রাণী কোষে প্লাস্টিড থাকে না। প্লাস্টিড উদ্ভিদ কোষের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পাতা, ফুল বা ফলের যে বিচিত্র রং আমরা দেখি তা সবই এই প্লাস্টিডের কারণে। সবুজ প্লাস্টিড প্রধানত খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করে। অন্যান্য রঙের প্লাস্টিডগুলো উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গকে রঙিন করে আকর্ষণীয় করে তোলে। বর্ণহীন প্লাস্টিড খাদ্য সঞ্চয় করে।

কাজ : মাটি দিয়ে কোষের একটি মডেল বানাও, যাতে কোষপ্রাচীর, কোষঝিল্লি, প্লাস্টিড ও নিউক্লিয়াস থাকবে।

খ) কোষগহ্বর : পিয়াজের কোষ পরীক্ষা করে দেখ। দেখবে যে কোষের মধ্যে বৃহৎ একটি ফাঁকা জায়গা রয়েছে। এটাকে কোষগহ্বর বলে। নতুন কোষের গহ্বর ক্ষুদ্র বা অনুপস্থিত থাকতে পারে কিন্তু একটি পরিণত উদ্ভিদ কোষে এ গহ্বরটি বেশ বড়। উদ্ভিদ কোষে অবশ্যই গহ্বর থাকবে। একটি প্রাণী কোষে সাধারণত কোষগহ্বর থাকে না, তবে যদি থাকে তাহলে সেটি হবে ছোট। কোষগহ্বরে যে রস থাকে, তাকে কোষরস বলে। কোষগহ্বর উদ্ভিদ কোষের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।
কোষগহ্বর কোষরসের আধার হিসেবে কাজ করে। ইহা ছাড়া কোষের উপর কোন চাপ এলে তাও নিয়ন্ত্রণ করে।

গ) মাইটোকন্ড্রিয়া : একে কোষের শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র বলা হয়। কারণ এই অঙ্গাণুর অভ্যন্তরে শক্তি উৎপাদনের প্রায় সকল বিক্রিয়া ঘটে থাকে। এরা দন্ডাকার, বৃত্তাকার বা তারকাকার হতে পারে। এরা দুই স্তর বিশিষ্ট ঝিল্লি দিয়ে আবৃত থাকে। বাইরের স্তর মসৃণ কিন্তু ভিতরের স্তরটি ভাঁজযুক্ত। মাইটোকন্ড্রিয়ার প্রধান কাজ শ্বসন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে শক্তি উৎপাদন করা। তাই মাইটোকন্ড্রিয়াকে শক্তির আধার বলে।

পাঠ ৭-৮ : নিউক্লিয়াস

প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে ভাসমান গোলাকার ঘন বস্তুটি **নিউক্লিয়াস**। নিউক্লিয়াস কোষের সকল শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। নবীন কোষে এদের অবস্থান কোষের কেন্দ্রে। পরিণত কোষে এদের স্থান পরিবর্তন হতে পারে। এরা গোলাকার তবে কখনও কখনও উপবৃত্তাকার বা নলাকার হতে পারে। কোনো কোনো কোষে নিউক্লিয়াস থাকে না।

একটি নিউক্লিয়াস প্রধানত (১) নিউক্লিয়ার মেমব্রেন (২) নিউক্লিওপ্লাজম (৩) ক্রোমাটিন তন্তু ও (৪) নিউক্লিওলাস নিয়ে গঠিত।

নিউক্লিয়ার মেমব্রেন : এটি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে রাখে। এই আবরণী সাইটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয়াসের ভিতরের বস্তুগুলোকে আলাদা করে রাখে। একই সাথে এটি তরল পদার্থের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

নিউক্লিওপ্লাজম : নিউক্লিয়াসের ভিতরের তরল ও স্বচ্ছ পদার্থটিই নিউক্লিওপ্লাজম। এর মধ্যে ক্রোমাটিন তন্তু ও নিউক্লিওলাস থাকে।

নিউক্লিওলাস : নিউক্লিয়াসের ভিতরে বিন্দুর ন্যায় অতিক্ষুদ্র যে অঙ্গাণুটি ক্রোমাটিন তন্তুর সাথে লেগে থাকে, সেটিই নিউক্লিওলাস।

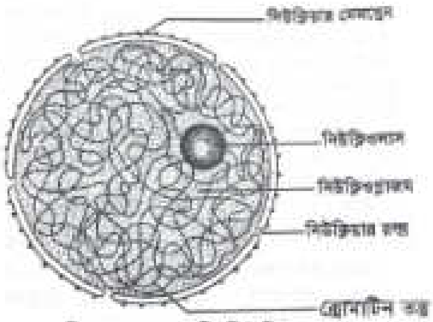

চিত্র ৩.৫: একটি নিউক্লিয়াস

কাজ : মাটি দিয়ে নিউক্লিয়াসের একটি মডেল বানাও যাতে ক্রোমাটিনতন্তু ও নিউক্লিওলাস থাকবে।

ক্রোমাটিন তন্তু : নিউক্লিয়াসের ভিতরে সুতার ন্যায় কুণ্ডলী পাকানো বা খোলা অবস্থায় যে অঙ্গাণুটি রয়েছে তাই ক্রোমাটিন তন্তু বলে। এটি জীবের বৈশিষ্ট্য বহন করে পরবর্তী প্রজন্মে নিয়ে যায়। এরা কোষের বৃদ্ধি বা যেকোনো ক্রিয়া-বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

কাজ : চিত্র এঁকে অঙ্গাণুর ভিত্তিতে একটি উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষের পার্থক্য একটি ছকে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : ক্রোমাটিন তন্তু, নিউক্লিওলাস, নিউক্লিওপ্লাজম ও সাইটোপ্লাজম।

পাঠ ৯-১০ : জীবদেহে কোষের ভূমিকা

কোষ কী তা তোমরা জেনেছ। কতগুলো কোষ একত্রিত হয়ে যখন একই ধরনের কাজ করে, তখন তাকে কলা বা টিস্যু বলে। আবার বিভিন্ন ধরনের কলা মিলে একটি তন্ত্র বা অঙ্গপ্রতঙ্গ গঠন করে। কোষের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদানের বিষয়ে নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

বিভিন্ন ধরনের কলা গঠন : অনেকগুলো কোষ সম্মিলিতভাবে একটি কলা ও কলাতন্ত্র গঠন করে। এ ক্ষেত্রে কলায় অবস্থিত সকল কোষ এক ধরনের কাজ করে। পরিবহন, ভারসাম্য রক্ষা করা ও দৃঢ়তা প্রদান করা এদের কাজ।

বিভিন্ন অঙ্গ গঠন : বিভিন্ন ধরনের কোষ ও কলা মিলিত হয়ে জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠন করে। যেমন– মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ইত্যাদি। আবার চোখ, কান, মুখ, হাত, পা, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, বৃক্ক, যকৃৎ, প্লিহা ইত্যাদি প্রাণীর বিভিন্ন অঙ্গ।

জীবের দেহ গঠন : ক্ষুদ্র কোষ থেকে জীবের দেহ সৃষ্টি হয়। ক্রমশ এই কোষ থেকেই জীবদেহের বৃদ্ধি ঘটে।

খাদ্য উৎপাদন : সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য উৎপাদন করতে পারে। সবুজ উদ্ভিদের কোষে ক্লোরোপাস্ট নামক প্লাস্টিড থাকে। এই ক্লোরোপাস্ট সূর্যালোকের উপস্থিতিতে পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইড সমন্বয়ে শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে।

শক্তি উৎপাদন : জীবের জীবন ধারণের জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। খাদ্য থেকে জীব শক্তি পায়।

খাদ্য ও পানি সঞ্চয় : কিছু কিছু উদ্ভিদের কোষ পানি সঞ্চয় করে রাখে। আবার কোনো কোনো কোষ খাদ্য মজুদ করে, যেমন : ফণিমনসা, আলু ইত্যাদি।

প্রয়োজনীয় উৎসেচক ও রস নিঃসরণ : বিশেষ করে প্রাণীতে এক ধরনের কোষ দেখা যায়, যার কাজ হলো প্রয়োজনীয় উৎসেচক ও বিভিন্ন ধরনের রস নিঃসরণ করা। যেমন- পিত্তরস, ইনসুলিন, জারক রস ইত্যাদি।

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- জীবদেহের গঠন ও কাজের একককে কোষ বা 'সেল' বলে।
- কোটি কোটি কোষ দ্বারা আমাদের শরীর গঠিত।
- কোষ দুই ধরনের, যথা-আদি কোষ ও প্রকৃত কোষ।
- সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াসের মিলিত রূপই প্রোটোপ্লাজম।
- উদ্ভিদ কোষের সাইটোপ্লাজমে প্লাস্টিড, কোষগহ্বর ইত্যাদি থাকে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর।

১. --------- কোষে কোষপ্রাচীর থাকে।
২. প্লাস্টিড --------- কোষের বৈশিষ্ট্য।
৩. --------- কোষে সাধারণত কোষগহ্বর থাকে না।
৪. কোষপ্রাচীর --------- পদার্থ দ্বারা তৈরি।
৫. --------- এর ভিতরে নিউক্লিওলাস ও ক্রোমাটিন তন্তু থাকে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. একটি প্রাণী কোষের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।
২. প্লাস্টিডের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
৩. উদ্ভিদ কোষে পাওয়া যায় কিন্তু প্রাণী কোষে পাওয়া যায় না; আবার প্রাণী কোষে পাওয়া যায় কিন্তু উদ্ভিদ কোষে পাওয়া যায় না এরূপ অঙ্গাণু গুলির নাম উল্লেখ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

১. পিয়াজের কোষ উদ্ভিদ কোষ কারণ এতে-

ক. কোষপ্রাচীর আছে　　খ. প্লাস্টিড নেই

গ. কোষগহ্বর নেই　　ঘ. মাইটোকন্ড্রিয়া আছে

২. কোন বিজ্ঞানী জীবকোষ আবিষ্কার করেন?

ক. আইজ্যাক নিউটন　　খ. রবার্ট হুক

গ. লিউয়েন হুক　　ঘ. ক্যারোলাস লিনিয়াস

৩. নিউক্লিয়াসের কাজ কী?

ক. কোষের আকার ও আকৃতি ঠিক রাখা　　খ. খাদ্য সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করা

গ. কোষের যাবতীয় কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করা　　ঘ. সাইটোপ্লাজম ধারণ করা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আয়াজ বাবার সাথে ঢাকায় বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যায়। গার্ডেনে সে বিভিন্ন বর্ণের গাছপালা দেখতে পায়। পরবর্তীতে সে পার্শ্ববর্তী চিড়িয়াখানায় যায়। সেখানে সে বিভিন্ন প্রাণী দেখতে পায়।

ক. নিউক্লিয়াস কী?

খ. কোষের শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র কোনটি? ব্যাখ্যা কর।

গ. আয়াজের পর্যবেক্ষণকৃত উদ্ভিদগুলো বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আয়াজের দেখা জীবগুলোর কোষীয় বৈশিষ্ট্যের তুলনা কর।

২.

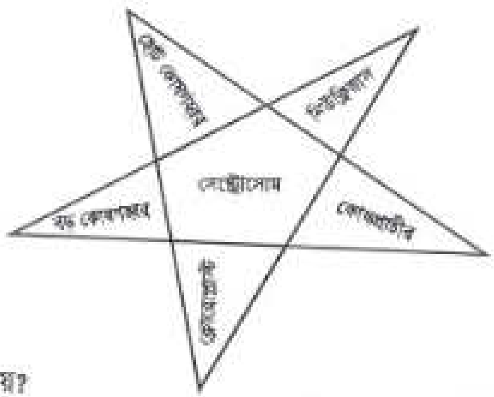

ক. কোষ কী?

খ. জনন কোষ বলতে কী বুঝায়?

গ. তারকাচিত্রে অবস্থিত প্রয়োজনীয় অঙ্গাণু ব্যবহার করে প্রাণী কোষের একটি চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করো।

ঘ. উদ্ভিদে খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তারকাচিত্রে অবস্থিত কোন অঙ্গাণু ভূমিকা পালন করে থাকে? ব্যাখ্যা কর।

নিজেরা কর

১. মাটি দিয়ে একটি জীবকোষের মডেল বানাও এবং এর বিভিন্ন অংশ কাগজের ফ্ল্যাগ দিয়ে চিহ্নিত কর।

২. তোমরা দলবদ্ধভাবে উদ্ভিদ কোষের প্রয়োজনীয়তা লিখ ও তা শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

চতুর্থ অধ্যায়
উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

ইতোপূর্বে আমরা বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিকরণ সম্পর্কে জেনেছি। আমরা জানি, উন্নত উদ্ভিদ দুই ধরনের যথা নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী উদ্ভিদ। আবৃতবীজী উদ্ভিদকে একটি আদর্শ উদ্ভিদ হিসেবে ধরে তার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী তা আমরা এ অধ্যায়ে জানব। একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের কোন কোন অংশ থাকে, কোথায় তাদের অবস্থান তা জানব। এর প্রধান অংশগুলোর প্রকারভেদ, কাজ ও মানবজীবনে এসব অঙ্গের অবদান কী তা আলোচনা করা হবে।

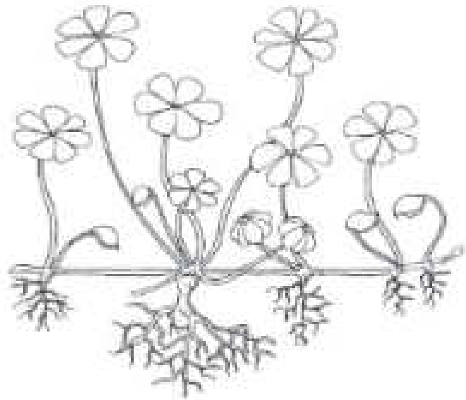

এই অধ্যায় শেষে আমরা

- উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মূলের প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন অংশ, প্রকারভেদ এবং কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কাণ্ডের প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন অংশ, প্রকারভেদ এবং কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পাতার প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন অংশ, প্রকারভেদ এবং কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ভিদ এবং মানবজীবনে মূল, কাণ্ড ও পাতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উদ্ভিদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ প্রদর্শন করব।

পাঠ-১ : আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদের বাহ্যিক গঠন

আমরা চারপাশের পরিবেশে অগণিত উদ্ভিদ দেখতে পাই। এসব উদ্ভিদের আকার ও গঠনে অনেক বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। কিছু কিছু উদ্ভিদের দেহে মূল কাণ্ড ও পাতা থাকে। এদের ফুল, ফল ও বীজ হয়। এরা সপুষ্পক উদ্ভিদ। যেমন- আম, জাম, ছোলা, লাউ, ধান, গম ইত্যাদি। ধান, গম, ঘাস একবীজপত্রী ও আম, কাঁঠাল, সরিষা, মরিচ দ্বিবীজপত্রী সপুষ্পক উদ্ভিদ। আবৃতবীজী সপুষ্পক উদ্ভিদকে আদর্শ উদ্ভিদ বলা হয় কারণ এরা সর্বোন্নত উদ্ভিদ।

একটি আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ

একটি আদর্শ সপুষ্পক উদ্ভিদকে মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল প্রভৃতি অংশে বিভক্ত করা যায়।

বিটপ : উদ্ভিদের যে অংশগুলো মাটির উপরে থাকে তাদের একত্রে বিটপ বলে। বিটপে কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফল থাকে। কাণ্ডে পর্ব, পর্বমধ্য ও শীর্ষ মুকুল থাকে। ফুলগুলো পাতার কক্ষে উৎপন্ন হয়। ফুলে বৃতি, দল, পুংকেশর ও গর্ভাশয় থাকে। এ কথাগুলোর সাথে পাশের পরিচিত মরিচ গাছের চিত্র মিলিয়ে দেখি।

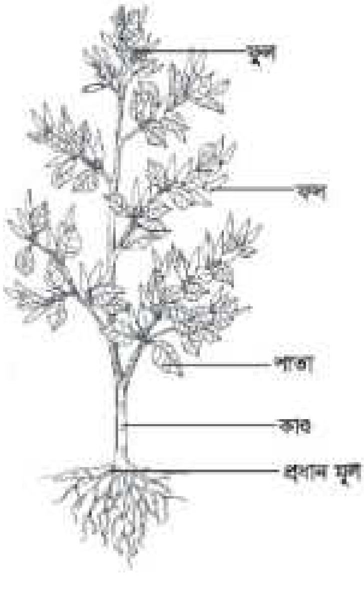

চিত্র ৪.১: একটি মরিচ গাছের বাহ্যিক গঠন

১। **কাণ্ড :** প্রধান মূলের সাথে লাগান মাটির উপরে উদ্ভিদের অংশটি কাণ্ড। কাণ্ডের গায়ে পর্ব ও পর্ব মধ্য থাকে। পর্ব থেকে পাতা উৎপন্ন হয়। কাণ্ড পাতা ও শাখা প্রশাখার ভার বহন করে।

২। **পাতা :** শাখা প্রশাখার গায়ে সৃষ্ট চ্যাপ্টা সবুজ অঙ্গটিই পাতা বা পত্র। পাতায় খাদ্য তৈরি হয়।

৩। **ফুল :** পত্র কক্ষে সাদা রঙের ছোটো ছোটো ফুল হয়। এই ফুল থেকে ফল অর্থাৎ মরিচ হয়।

৪। **ফল :** ফুল বুড়ো হয়ে ঝরে যায়। ঝরা ফুলের গোড়ায় ফুলের যে অংশটি থেকে যায় তা বড়ো হয়ে ফল সৃষ্টি করে। গর্ভাশয়ই বড়ো হয়ে ফলে পরিণত হয়। মরিচ গাছের ফলই মরিচ।

মূল : উদ্ভিদের পর্ব, পর্বমধ্য ও অগ্রমুকুলবিহীন অংশই মূল। সাধারণত মানুষ মনে করে উদ্ভিদের মাটির নিচের অংশই মূল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ বক্তব্যটি সত্য তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কাণ্ড, পত্র, ফুল, ফল মাটির নিচের জন্মে, যেমন- আলু, হলুদ, পিয়াজ ইত্যাদি। এ ব্যাপারে উপরের শ্রেণিতে তোমরা বিশদ জানতে পারবে।

> **কাজ :** বিদ্যালয়ের পাশে থেকে ছোট্ট একটি গাছ মূলসহ তুলে আন। এবার তার চিত্র এঁকে বিভিন্ন অংশের নাম লিখ।

সাধারণত মূল ভ্রূণমূল হতে উৎপন্ন হয়। মূলে পাতা, ফুল বা ফল হয় না। সাধারণত মূল নিম্নগামী। ভ্রূণমূলটি বৃদ্ধি পেয়ে প্রধান মূল গঠন করে। প্রধান মূল থেকে শাখা মূল, শাখা মূল থেকে প্রশাখা মূল উৎপন্ন হয়।

নতুন শব্দ : সপুষ্পক, বিটপ, কাণ্ড, পর্ব, পর্বমধ্য ও ভ্রূণমূল।

পাঠ-২ : একটি আদর্শ মূলের বিভিন্ন অংশ

মূলকে কয়েকটি অংশে ভাগ করা যায়। এর শেষ প্রান্তে টুপির মতো অংশটি হচ্ছে **মূলটুপি বা মূলত্র।** আঘাত থেকে মূলকে রক্ষা করা এর কাজ। এর পেছনের মসৃণ অংশটি বর্ধিষ্ণু অঞ্চল। এ স্থানে মূলের বৃদ্ধি ঘটে। এই এলাকার পেছনে সূক্ষ্ম লোমশ **মূলরোম** অঞ্চল অবস্থিত। মূলরোম দিয়ে উদ্ভিদ পানি শোষণ করে। এই অঞ্চলের পর মূলের স্থায়ী এলাকা অবস্থিত। স্থায়ী অঞ্চল থেকে মূলের শাখা ও প্রশাখা সৃষ্টি হয়।

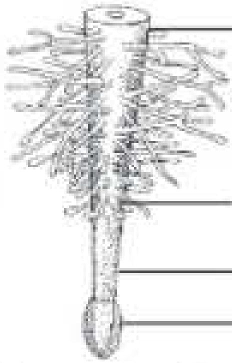

চিত্র ৪.২ : একটি আদর্শ মূলের বিভিন্ন অংশ

নূতন শব্দ : মূলরোম, মূলটুপি ও মূলত্র।

পাঠ ৩-৪ : মূলের প্রকারভেদ ও কাজ

সব গাছের মূল কি এক ধরনের হয়? ধানের মূল আর আম গাছের মূল কি এক ধরনের? বটের ঝুরিও আসলে এক ধরনের মূল। উদ্ভিদের প্রয়োজনে এ মূলগুলো ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। বটের ঝুরিমূল, কেয়া গাছের ঠেসমূল, পানের আরোহী মূল উদ্ভিদের প্রয়োজনে বিশেষ ধরনের কাজ করে।

আমরা খেয়াল করলে দেখব যে, সকল ধরনের উদ্ভিদের মূল এক রকমের নয়। একটি মরিচ বা একটি আম গাছের মূল অবশ্যই ধান, ভুট্টা বা ঘাস এর মূল হতে ভিন্ন রকমের। এরূপ ভিন্নতার জন্য মূলকে এর উৎপত্তি ও অবস্থান অনুযায়ী প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- ১। স্থানিক মূল ও ২। অস্থানিক মূল।

১। স্থানিক মূল: ভ্রূণমূল বৃদ্ধি পেয়ে প্রধান মূল হিসেবে সরাসরি মাটিতে প্রবেশ করে। প্রধান মূল শাখা প্রশাখা বিস্তার করে। তখন এদেরকে স্থানিক মূলতন্ত্র বা স্থানিক মূল বলে। যথা আম, জাম কাঁঠাল, লিচু, বেগুন, সরিষা, ইত্যাদি।

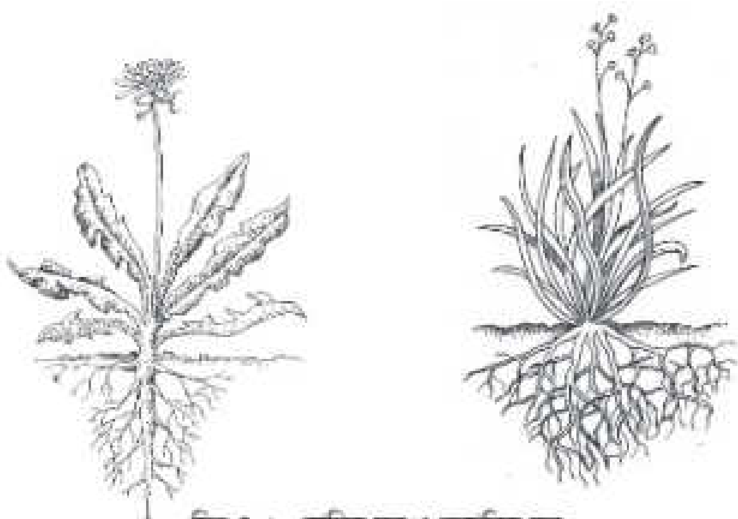
চিত্র ৪.৩ : স্থানিক মূল ও অস্থানিক মূল

কাজ : মূলসহ একটি মরিচের চারা ও একটি ধানের চারা সংগ্রহ কর। এদের মূলের মধ্যে কী কী পার্থক্য রয়েছে তার তালিকা কর।

২। **অস্থানিক মূল :** এসব মূল ভ্রূণমূল থেকে উৎপন্ন না হয়ে কাণ্ড ও পাতা থেকে উৎপন্ন হয়। এরা দুই ধরনের। যথা- ক) গুচ্ছ মূল ও খ) অগুচ্ছ মূল।

ক) গুচ্ছ মূল : ধান, ঘাস, বাঁশ ইত্যাদি উদ্ভিদের মূল লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, কাণ্ডের নিচের দিকে এক গুচ্ছ সরু মূল সৃষ্টি হয়েছে। এরা গুচ্ছমূল। ভ্রূণমূল নষ্ট হয়ে সে স্থান থেকেও গুচ্ছ মূল উৎপন্ন হতে পারে। সাধারণত একবীজপত্রী উদ্ভিদে গুচ্ছমূল থাকে। যেমন-ধান, নারিকেল, সুপারি ইত্যাদি।

খ) অগুচ্ছ মূল : এসব মূল একত্রে গাদাগাদি করে গুচ্ছাকারে জন্মায় না বরং পরস্পর থেকে আলাদা থাকে। কেয়া গাছের ঠেশমূল, বটের ঝুরিমূল এ ধরনের অগুচ্ছ মূল।

> **কাজ :** মূলসহ একটি ধানের চারা, সরিষার চারা, ঘাস তুলে এনে দেখ নারিকেল গাছের মূলের সাথে কোন কোনটি মিলে এবং অমিল কোথায় উল্লেখ কর।

মূল নিম্নলিখিত কাজসমূহ করে থাকে :

১। মূল উদ্ভিদকে মাটির সাথে শক্তভাবে আটকে রাখে ফলে ঝড় বাতাসে সহজে হেলে পড়ে না।
২। মূল মাটি থেকে পানি ও খনিজ পদার্থ শোষণ করে। আমরা জানি, মূলে মূলরোম অঞ্চল বলে একটি অংশ থাকে। এখানে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোম উৎপন্ন হয় যার মাধ্যমে উদ্ভিদ পানি ও খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করে।

নতুন শব্দ : প্রধানমূল, স্থানিকমূল, অস্থানিকমূল, গুচ্ছমূল, শোষণ ও মূলরোম।

পাঠ-৫ : কাণ্ডের বিভিন্ন অংশ

আমরা যখন আম পাড়তে গাছে উঠি, তখন মাটির ওপরে গাছের খাড়া লম্বা অংশটি আঁকড়ে ধরে তবেই গাছে উঠি। এটাই গাছের কাণ্ড। কুল গাছের যে ডালে বসে কুল খাই এগুলো শাখা। গাছের শাখাও কিন্তু কাণ্ডেরই অংশ। উদ্ভিদের যে অংশ থেকে শাখা-প্রশাখা পাতা উৎপন্ন হয়, তাই কাণ্ড। এতে পর্ব, পর্বমধ্য ও মুকুল থাকে।

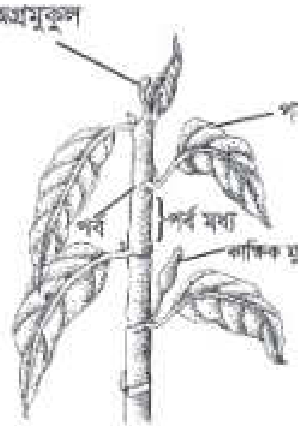

চিত্র ৪.৪ : একটি শাখা কাণ্ড

১। **পর্ব :** কাণ্ডের যে স্থান থেকে পাতা বের হয় তাকে পর্ব বা সন্ধি বলে।

২। **পর্বমধ্য :** পাশাপাশি দুটি পর্বের মধ্যবর্তী অংশটি **পর্বমধ্য**। পর্বমধ্য গাছকে খাড়া রাখতে ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। পর্বমধ্য থেকে কোনো ধরনের মূল, পাতা বা শাখা সৃষ্টি হয় না।

৩। **মুকুল :** কাণ্ডের সাথে পাতা যে কোণ সৃষ্টি করে তাকে **পত্রকক্ষ** বলে। সাধারণত মুকুল এ পত্রকক্ষে জন্মে। তবে শাখার অগ্রভাগেও মুকুল সৃষ্টি হয়। কাক্ষিক মুকুল পত্রকক্ষে এবং শীর্ষ মুকুল কাণ্ড বা শাখার অগ্রভাগে জন্মে।

> **কাজ :** একটি বৃক্ষ হতে ছোট্ট একটি শাখা নিয়ে তার বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা কর। এবার এর চিত্র আঁক এবং অংশগুলি চিহ্নিত করে দেখাও।

নতুন শব্দ : শীর্ষমুকুল, পত্রকক্ষ, পর্ব, পর্বমধ্য ও কাক্ষিক মুকুল।

পাঠ-৬ : কাণ্ডের শ্রেণিকরণ

একটি আম গাছের কাণ্ড, একটি লাউগাছের কাণ্ড এবং একটি নারকেল গাছের কাণ্ড লক্ষ করি। কোনোটির কাণ্ড বেশ শক্ত, কোনোটি দুর্বল আবার কোনোটির মধ্যে কোনো শাখা-প্রশাখা নেই। এ থেকে ধারণা করা যায় যে কাণ্ড বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তবে এদের প্রাথমিকভাবে দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা-**১) সবল কাণ্ড ও ২) দুর্বল কাণ্ড।**

১) সবল কাণ্ড : এসব কাণ্ড শক্ত ও খাড়াভাবে গাছকে দাঁড়াতে সাহায্য করে। যেমন : আম, জাম, নারিকেল, তাল ইত্যাদি গাছের কাণ্ড। এই কাণ্ডগুলোর কোনোটির শাখা-প্রশাখা থাকে আবার কোনোটির শাখা-প্রশাখা থাকে না।

ক) অশাখ কাণ্ড : এসব কাণ্ডের কোনো শাখা হয় না। কাণ্ডটি লম্বা হয়ে বেড়ে ওঠে। এর শীর্ষে পাতার মুকুট থাকে। খেয়াল করলে দেখবে নারিকেল, তাল, সুপারি ইত্যাদি গাছের কাণ্ড এ ধরনের হয়।

খ) শাখান্বিত কাণ্ড :

১. মঠ আকৃতি : কোনো কোনো গাছে প্রধান কাণ্ডটি থেকে এমনভাবে শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি হয় যে পূর্ণাঙ্গ গাছটিকে একটি মঠের ন্যায় দেখায়। এ গাছের নিচের দিকের শাখাগুলো বড়ো এবং ক্রমান্বয়ে উপরের দিকের শাখাগুলো ছোটো হয়ে থাকে।

সম্পূর্ণ গাছটি নিচে থেকে উপরের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে মঠের ন্যায় আকার ধারণ করে। দেবদারু, বিলেতি ঝাউ ইত্যাদি গাছে এ ধরনের কাণ্ড দেখা যায়।

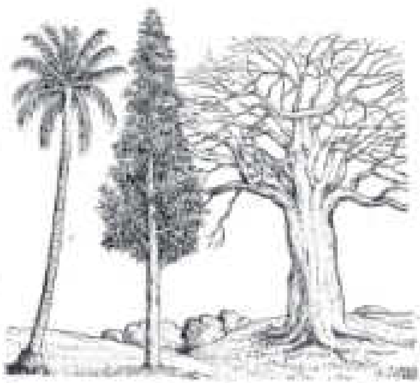

চিত্র ৪.৫ : অশাখ, মঠ আকৃতি, গম্বুজ আকৃতির কাণ্ড

২. গম্বুজ আকৃতি : কোনো কোনো গাছের প্রধান কাণ্ডটি খাটো ও মোটা হয় এবং শাখা ও প্রশাখাগুলো এমনভাবে এই প্রধান কাণ্ডে বিন্যস্ত হয় যে গাছটিকে একটি গম্বুজের ন্যায় দেখায়, যেমন- আম, কাঁঠাল, জাম ইত্যাদি।

৩. তৃণ কাণ্ড : এসব কাণ্ডে পর্ব ও পর্বমধ্য খুবই স্পষ্ট। পর্ব থেকে অস্থানিক মূল সৃষ্টি হতে দেখা যায়, যথা- বাঁশ, আখ ইত্যাদি। ক্ষেত্রবিশেষে এসব কাণ্ডের পর্বগুলো ফাঁপা বা ভরাট হতে পারে।

২) দুর্বল কাণ্ড : কিছু উদ্ভিদের কাণ্ড খাড়াভাবে দাঁড়াতে পারে না তাই মাটিতে বা মাচার উপরে বৃদ্ধি পায়। এদের কাণ্ডে সাধারণত কাষ্ঠ থাকে না তাই এরা দুর্বল ও নরম। এদের কোনোটি লতানো, কোনোটি শয়ান আবার কোনোটি আরোহিণী।

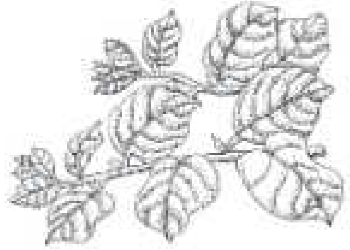

চিত্র ৪.৬ : ট্রেইলার বা শয়ান কাণ্ড

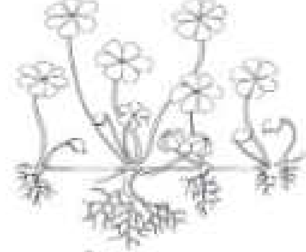

চিত্র ৪.৭ : ক্রিপার বা লতানো কাণ্ড

ক) ক্রিপার বা লতানো : এসব কাণ্ড মাটির উপর দিয়ে সমান্তরালভাবে বৃদ্ধি পায়। এদের প্রতিটি পর্ব থেকে গুচ্ছমূল বের হয়ে মাটিকে আঁকড়ে ধরে, যেমন- ঘাস, আমরুল ইত্যাদি।

খ) ট্রেইলার বা শয়ান : এসব কাণ্ড মাটির উপরে ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু পর্ব থেকে মূল বের হয় না। যথা- পুঁই, মটরশুটি ইত্যাদি।

গ) আরোহিণী : এ সকল কাণ্ড কোনো অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে উপরের দিকে বেড়ে ওঠে, এরা ক্লাইম্বার বা আরোহিণী। যথা- শিম, পান, বেত ইত্যাদি।

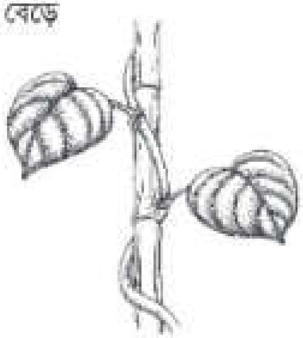

চিত্র ৪.৮ : আরোহিণী কাণ্ড

> কাজ : তোমরা দল বেঁধে বিদ্যালয়ের কাছাকাছি এলাকা থেকে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন গাছের কাণ্ড পর্যবেক্ষণ কর এবং কোন গাছের কাণ্ড কী ধরনের তা খাতায় নোট কর। শ্রেণিতে ফিরে কাণ্ডের শ্রেণিকরণ কর।

পাঠ-৭ : কাণ্ডের কাজ

গাছের কাণ্ড কী কী কাজ করে অনুমান করে তোমার খাতায় লিখ। এবার নিচের তালিকার সাথে তোমার তালিকা মিলিয়ে দেখ।

১। কাণ্ড পাতা, ফুল ও ফল এবং শাখা-প্রশাখার ভারবহন করে।

২। কাণ্ড শাখা-প্রশাখা ও পাতাকে আলোর দিকে তুলে ধরে যাতে সূর্যের আলো যথাযথভাবে পায়।

৩। কাণ্ড শোষিত পানি ও খনিজ লবণ শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুলে এবং ফলে পরিবহন করে।

৪। পাতায় প্রস্তুত খাদ্য কাণ্ডের মাধ্যমে দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

৫। কচি অবস্থায় সবুজ কাণ্ড সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে কিছু পরিমাণ খাদ্য প্রস্তুত করে।

পাঠ-৮ : একটি পাতার বিভিন্ন অংশ

কাণ্ড বা তার শাখা-প্রশাখার পর্ব থেকে পাশের দিকে উৎপন্ন চ্যাপ্টা অঙ্গটি হলো পাতা। পাতা সাধারণত চ্যাপ্টা ও সবুজ বর্ণের হয়। নিম্ন শ্রেণির উদ্ভিদে পাতা থাকে না। তবে ফার্ন ও মস জাতীয় উদ্ভিদে পাতার ন্যায় অঙ্গ থাকে। মসের পাতা প্রকৃত পাতা নয়।

আদর্শ পাতায় পত্রমূল, বৃন্ত ও ফলক এ তিনটি অংশ থাকে। যেমন : আম, জবা ইত্যাদি।

পাতার বিভিন্ন অংশ

একটি জবা পাতা নিয়ে পরীক্ষা করলেই এর তিনটি অংশ দেখা যাবে, যেমন- ১) পত্রমূল, ২) বৃন্ত বা বোঁটা ও ৩) পত্রফলক।

চিত্র ৪.৯ : একটি পাতার বিভিন্ন অংশ

১। **পত্রমূল :** পাতার এই অংশটি কাণ্ড বা শাখা-প্রশাখার গায়ে যুক্ত থাকে। কোনো কোনো উদ্ভিদের পত্রমূলের পাশ থেকে ছোট পত্রসদৃশ অংশ বের হয়। এগুলো উপপত্র। মটর গাছের পত্রমূলে এরূপ উপপত্র দেখা যায়।

২। **বৃন্ত বা বোঁটা :** পাতার দণ্ডাকার অংশটি হলো বৃন্ত বা বোঁটা। বৃন্ত বা বোঁটা পত্রমূল ও ফলককে যুক্ত করে। শাপলা, পদ্ম ইত্যাদি উদ্ভিদের বৃন্ত খুব লম্বা হয়। আবার শিয়াল কাঁটা গাছের পাতায় কোনো বোঁটাই থাকে না।

কাজ : বিদ্যালয়ের কাছাকাছি এলাকা থেকে যে কোনো একটি গাছের পাতা সংগ্রহ কর, পর্যবেক্ষণ কর ও চিত্র আঁক।

বৃন্ত বা বোঁটা পত্রফলককে এমনভাবে ধরে রাখে, যাতে সবচেয়ে বেশি সূর্যের আলো পেতে পারে। এ ছাড়া কাণ্ড আর ফলকের মধ্যে পানি, খনিজ লবণ ও তৈরি খাদ্যের আদান-প্রদান করা এর কাজ।

৩। **পত্রফলক :** পত্র বৃন্তের উপরে চ্যাপ্টা সবুজ অংশটি পত্র ফলক। বৃন্তশীর্ষ হতে যে মোটা শিরাটি ফলকের অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে সেটি মধ্যশিরা। এই মধ্যশিরা থেকে শিরা-উপশিরা উৎপন্ন হয়। ফলকের কিনারাকে পত্র কিনারা বলে।

পাতার সাধারণ কাজ : একটি পাতার সাধারণ কাজগুলি নিচে দেওয়া হলো :

ক) খাদ্য তৈরি করা পাতার প্রধান কাজ। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এরা খাদ্য প্রস্তুত করে।

খ) গ্যাসের আদান প্রদান করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শ্বাসকার্য পরিচালনার জন্য অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বের করে দেয়। আবার খাদ্য তৈরির জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে ও অক্সিজেন বের করে দেয়।

গ) উদ্ভিদ প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পানি গ্রহণ করে থাকে। এই অতিরিক্ত পানি পাতার সাহায্যে বাষ্পাকারে বাইরে বের করে দেয়।

নতুন শব্দ : পত্রমূল, বৃন্ত বা বোঁটা ও পত্রফলক।

পাঠ- ৯ : পাতার প্রকারভেদ

একটি আমের পাতা ও একটি তেঁতুলপাতা হাতে নিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে যে আমপাতার ফলকটি অখণ্ডিত। কিন্তু তেঁতুলপাতাটির ফলক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে খণ্ডিত। পত্রফলকের এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পত্রকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- ১) সরলপত্র ও ২) যৌগিকপত্র।

১। **সরলপত্র :** সরলপত্রে বৃন্তের উপরে একটিমাত্র পত্র ফলক থাকে। আম, জাম, কাঁঠাল, বট ইত্যাদি উদ্ভিদের পাতা সরলপত্র। একটি সরল পত্রের কিনারা অখণ্ডিত বা অসম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত থাকে।

২। **যৌগিকপত্র :** গোলাপ, নিম, তেঁতুল, কৃষ্ণচূড়া , নারকেল, সজনে ইত্যাদি উদ্ভিদের পাতা পরীক্ষা করে দেখলে দেখা যাবে যে প্রতিটি পাতায় অনেকগুলো ছোটো ছোটো ফলক থাকে। এরা অনুফলক। যৌগিক পত্রের ফলকটি সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত হয় এবং খণ্ডিত অংশগুলো পরস্পর হতে আলাদাভাবে অনুফলক সৃষ্টি করে। অনুফলক বা পত্রকগুলো যে দণ্ডে সাজানো থাকে তাকে **র‍্যাকিস** বা **অক্ষ** বলে। বিভিন্ন ধরনের যৌগিকপত্র রয়েছে। পত্রকের বিন্যাস অনুযায়ী যৌগিকপত্র দুই ধরনের, যথা- i) পক্ষল যৌগিকপত্র এবং ii) করতলাকার যৌগিকপত্র।

চিত্র ৪.১০ : বিভিন্ন রকমের পক্ষল যৌগিকপত্র

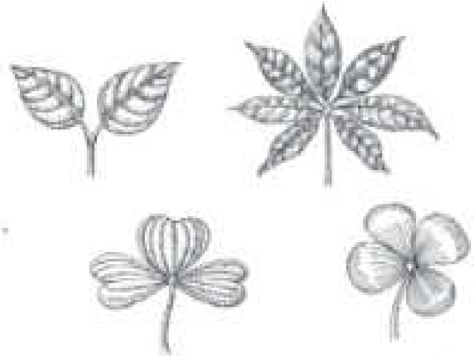

চিত্র ৪.১১ : বিভিন্ন রকমের করতলাকার যৌগিকপত্র

নতুন শব্দ : সরলপাতা, যৌগিক পাতা ও মধ্যশিরা।

পাঠ- ১০ : মানবজীবনে মূল, কাণ্ড ও পাতার প্রয়োজনীয়তা

আমরা উদ্ভিদের উপর নানাভাবে নির্ভরশীল। খাদ্য, পোশাক, ঘরবাড়ি তৈরির উপকরণ, ঔষধ ইত্যাদি বহুবিধ সামগ্রী আমরা উদ্ভিদ থেকে পাই। প্রাণী থেকে প্রাপ্ত দ্রব্যাদিও পরোক্ষভাবে উদ্ভিদেরই অবদান।

ক) মূলের ব্যবহার : মূলা, গাজর, শালগম ইত্যাদি উদ্ভিদের মূল উপাদেয় সবজি। শতমূলী, সর্পগন্ধা ইত্যাদি উদ্ভিদের মূল থেকে দামি ঔষধ তৈরি হয়।

খ) কাণ্ডের ব্যবহার : বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদের নরম কাণ্ড আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি। গোল আলু, আদা, পুঁই, ডাটা, কচু বা ওলকচুর কাণ্ড আমরা সবজি হিসেবে গ্রহণ করি। খেজুর ও আখের কাণ্ড হতে পাওয়া রস উপাদেয় পানীয়। বড়ো বড়ো কাণ্ড থেকে আমরা ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র তৈরির কাঠ পেয়ে থাকি। পাট বা শণের কাণ্ড থেকে প্রাপ্ত আঁশ দিয়ে দড়ি, ছালা, কাপড় ইত্যাদি তৈরি হয়।

গ) পাতার ব্যবহার : লাউশাক, পুঁইশাক, লালশাক, পালং, পাটশাক ও কলমিশাক ছাড়াও আরও নানা ধরনের শাক আমরা প্রতিদিন খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি। কলা, তাল ও আনারস গাছের পাতা থেকে আঁশ পাওয়া যায়। এই আঁশ দিয়ে নানা ধরনের শৌখিন দ্রব্য তৈরি হয়। তালপাতা ও গোলপাতার ছাউনি দেওয়া ঘর তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। তামাক পাতা থেকে বিড়ি-সিগারেট প্রস্তুত হয়। যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই খারাপ। খেজুর পাতা দিয়ে সুন্দর পাটি তৈরি হয়। তালপাতার পাখা তোমরা অনেকেই ব্যবহার করে থাকবে। বাসক, নিশিন্দা, কুর্চি, থানকুনি, গাঁদা ইত্যাদি গাছের পাতা থেকে মূল্যবান ঔষধ পাওয়া যায়।

নতুন শব্দ : মূল, কাণ্ড, মূলত্র, ভ্রূণ, শিরা, ফলক, বৃন্ত ও যৌগিকপত্র।

পাঠ-১১ : উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রতি আচরণ

উদ্ভিদ আমাদের অনেক উপকার করে। এ জন্য উদ্ভিদের বেশি বেশি যত্ন করা দরকার। অকারণে কখনও গাছ কাটবে না বা গাছের ডাল ভাঙবে না। তোমার-আমার বলে কথা নেই, গাছ জাতীয় সম্পদ ও পৃথিবীর জলবায়ু সংরক্ষণের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। খরা, অনাবৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঠেকাতেও গাছের যত্ন অতীব প্রয়োজনীয়। এসো আমরা অধিক গাছ লাগাই ও তার যত্ন নিই এবং অন্যদেরও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করি। পশুপাখির প্রতি সদয় হওয়া খুবই প্রয়োজন। গৃহপালিত পশুপাখি আমাদের অনেক উপকার করে। বনের পশুপাখিও প্রকৃতির সম্পদ। এদেরও যত্ন নিতে হবে। অনর্থক পশুপাখি ধ্বংস করব না। অতিথি পাখি শিকার করব না। এ ব্যাপারে সবাইকে উৎসাহিত করা দরকার।

> কাজ : গাছের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য একটি র‍্যালি আয়োজন কর।

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- মূল পানি শোষণ করে এবং গাছকে মাটির সাথে বেঁধে রাখে। মূল প্রধানত দুই ধরনের, স্থানিক ও অস্থানিক।
- কাণ্ড শাখা, পাতা ও ফল-ফুলের ভার বহন করে। কাণ্ড প্রধানত দুই ধরনের, সবল কাণ্ড ও দুর্বল কাণ্ড।
- পর্ব থেকে সৃষ্ট পার্শ্বীয় চ্যাপ্টা ও সবুজ অংশটি পাতা। পাতা দুই ধরনের, সরল ও যৌগিক।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. একটি সরল পত্রের প্রধান শিরাকে ------ বলা হয়।
২. অখণ্ড পত্রফলক আছে এরূপ পত্রকে ------ পত্র বলে।
৩. স্থানিক মূল বড়ো হয়ে যে মূল সৃষ্টি করে তাকে ------মূল বলে।
৪. ভ্রূণমূল নষ্ট হয়ে গুচ্ছাকারে যে মূল সৃষ্টি হয় তাকে ------ বলে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পত্রবৃন্ত কী? এর অবস্থান কোথায়?
২. পত্রের কাজ কী?
৩. সরলপত্রের প্রধান শিরাকে কী বলে?
৪. যৌগিকপত্রের র‍্যাকিস কী?
৫. যৌগিকপত্র কাকে বলে?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কাণ্ডের সাথে পাতা যে কোণ সৃষ্টি করে তার নাম -

ক. পর্ব খ. মুকুল
গ. পর্বমধ্য ঘ. পত্রকক্ষ

২. আখ তৃণ কাণ্ড। কারণ -

i. কাণ্ড খাট ও মোটা ii. পর্ব ও পর্বমধ্য খুবই স্পষ্ট

iii. পর্ব থেকে অস্থানিক মূল বের হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

নাফিছা খানমের তার বাড়ির আঙিনায় প্রথম বছর কুমড়া এবং পরবর্তী বছর পুঁইশাক আবাদ করলেন।

৩. নাফিছা খানমের প্রথম বছর আবাদকৃত উদ্ভিদটির কাণ্ডের প্রকৃতি কীরূপ?

ক. তৃণ খ. লতানো

গ. শয়ানো ঘ. আরোহিণী

৪. নাফিছা খানমের দ্বিতীয় বছরে আবাদকৃত উদ্ভিদের কাণ্ডের ক্ষেত্রে বলা যায়-

i. এটি মাটির উপরে ছড়িয়ে পড়ে ii. পর্ব থেকে মূল বের হয় না

iii. অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে বৃদ্ধি লাভ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ক. সপুষ্পক উদ্ভিদ কী?

খ. বিটপ বলতে কী বোঝায়?

গ. A ও B অংশের মধ্যে পার্থক্যগুলো উল্লেখ কর।

ঘ. A ও B অংশের গুরুত্ব আলোচনা কর।

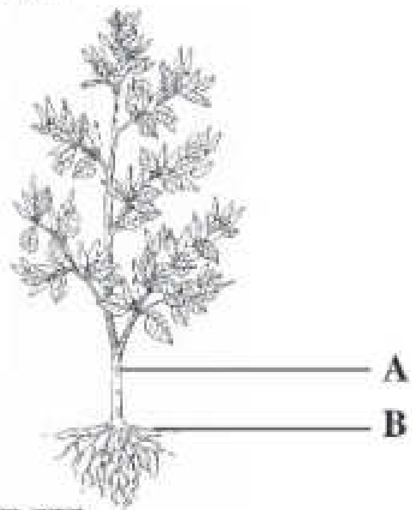

২. নোহান ও নাসিফ ছুটিতে গ্রামের বাড়ি বেড়াতে যায়। একদিন তারা গ্রামে ঘুরতে বেড়িয়ে উদ্ভিদ কাণ্ডের বিভিন্ন ধরনের বিন্যাস বিশেষভাবে লক্ষ করল। এদের মধ্যে কোনটির শাখা-প্রশাখার বিন্যাস মঠ আকৃতির, আবার কোনটির গম্বুজ আকৃতির। এই কাণ্ডগুলোর আকৃতি ও কাজ সম্পর্কে জানতে তারা কৌতূহলী হয়ে উঠল।

ক. মূল কাকে বলে?

খ. আম গাছের পাতার ধরন ব্যাখ্যা কর।

গ. নোহান ও নাসিফের পর্যবেক্ষণকৃত উদ্ভিদ কাণ্ডের কাজ বর্ণনা কর।

ঘ. তুমি কীভাবে নোহান ও নাসিফের পর্যবেক্ষণকৃত কাণ্ডের শাখা-প্রশাখার বিন্যাসকে আলাদা করবে? ব্যাখ্যা কর।

নিজে কর

তোমরা দল বেঁধে বিদ্যালয়ের কাছাকাছি এলাকা থেকে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন গাছের কাণ্ড, পাতা ও মূল পর্যবেক্ষণ কর এবং কোন গাছের কাণ্ড, পাতা ও মূল কী ধরনের তা খাতায় নোট কর। শ্রেণিতে ফিরে এদের শ্রেণিকরণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

সালোকসংশ্লেষণ

পৃথিবীর প্রতিটি জীবের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এ খাদ্য কোথা থেকে আসে, তা কি তোমরা জান? সাধারণত সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। তবে এর বাইরে সবুজ শৈবাল ও কিছু ব্যাকটেরিয়াও খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। এ অধ্যায়ে আমরা সবুজ উদ্ভিদ কিভাবে খাদ্য প্রস্তুত করে সে বিষয়ে জানতে পারব। উদ্ভিদ নিজে প্রস্তুতকৃত খাদ্য ব্যবহার করে তার দেহের বৃদ্ধি ও অন্যান্য কাজে লাগায়। সবুজ উদ্ভিদ কীভাবে খাদ্য প্রস্তুত করে। এ অধ্যায়ে সে বিষয়ে আমরা জানতে পারব।

এই অধ্যায় শেষে আমরা

- উদ্ভিদ কীভাবে খাদ্য প্রস্তুত করে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সালোকসংশ্লেষণের উপর জীবজগতের নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য প্রস্তুতে উদ্ভিদের অবদান উপলব্ধি করতে পারব এবং উদ্ভিদের প্রতি সংবেদনশীল হব।

পাঠ ১-২ : উদ্ভিদ কীভাবে খাদ্য প্রস্তুত করে

কাজ করার জন্য শক্তি লাগে তা সে কাজ কোনো যন্ত্র করুক বা কোনো জীবই করুক। মোটরগাড়ি চলে পেট্রোল বা ডিজেলের শক্তি দ্বারা। তোমার শ্রেণিকক্ষের পাখা ঘুরে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে। আমরা যে হাঁটাচলা করি, নানা ধরনের কাজ করি তার জন্যও তো শক্তি লাগে। সে শক্তি কোথা থেকে আসে? আমরা খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে সেই শক্তি পেয়ে থাকি। এখন খাবারের মধ্যে শক্তি এলো কেমন করে। আমরা জানি, পৃথিবীর সমস্ত শক্তির উৎস হলো সূর্য। যে জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের সবুজ অংশে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে পানি ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে কাজে লাগিয়ে শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপাদন করে তাকে সালোকসংশ্লেষণ বলে।

উদ্ভিদের পাতার সবুজ প্লাস্টিড সালোকসংশ্লেষণে অংশ নেয়। এ প্লাস্টিডের ভিতরে সৌরশক্তি, পানি এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বিক্রিয়া করে অক্সিজেন ও গ্লুকোজ উৎপন্ন করে।

পাতাকে সালোকসংশ্লেষণের প্রধান স্থানরূপে কেন গণ্য করা হয়। কারণ–

১. পাতা চ্যাপ্টা ও সম্প্রসারিত হওয়ায় বেশি পরিমাণ সূর্যরশ্মি এবং অল্প সময়ে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষিত হয়।

২. পাতার কোষগুলোতে ক্লোরোপ্লাস্টের সংখ্যা অনেক বেশি।

৩. পাতায় অসংখ্য পত্ররন্ধ্র থাকায় সালোকসংশ্লেষণের সময় গ্যাসীয় পদার্থের আদান প্রদান সহজে ঘটে।

পাঠ ৩-৬ : সালোকসংশ্লেষণ পদ্ধতি

স্থলজ উদ্ভিদ মাটি থেকে মূলরোম দ্বারা পানি শোষণ করে। নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদগুলো দেহতল দিয়ে পানি সংগ্রহ করে। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আলো একটি অপরিহার্য উপাদান। আলোর প্রধান উৎস সূর্য।

সালোকসংশ্লেষণের সময় বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড পত্ররন্ধ্রের ভিতর দিয়ে পাতায় প্রবেশ করে। এরপর সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোফিলের সহায়তায় পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের বিক্রিয়া ঘটে ও গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়। সালোকসংশ্লেষণের সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

$$\text{কার্বন ডাই-অক্সাইড} + \text{পানি} \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলো}} \text{গ্লুকোজ} + \text{অক্সিজেন} + \text{পানি}$$

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি দুটি প্রথক পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। পর্যায় দুটি হলো- (১) আলোক পর্যায় ও (২) আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়। এ বিষয় পরবর্তী শ্রেণিতে আরও বিশদ জানতে পারবে। সালোকসংশ্লেষণে যে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় তা নিচের পরীক্ষার সাহায্যে বুঝতে পারবে।

সালোকসংশ্লেষণে অক্সিজেন নির্গমন পরীক্ষা

পরীক্ষার উপকরণ: একটা বিকার, একটা ফানেল, একটা টেস্টটিউব, পানি, সতেজ জলজ উদ্ভিদ হাইড্রিলা ও একটা দিয়াশলাই।

কার্যপদ্ধতি:

বিকারটির দুই-তৃতীয়াংশে পানি দিয়ে পূর্ণ করি। সতেজ হাইড্রিলা উদ্ভিদগুলো বিকারের পানিতে রেখে ফানেল দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দেই যাতে হাইড্রিলা উদ্ভিদগুলোর কাণ্ড ফানেলের নলের উপরের দিকে থাকে।

এরপর বিকারে আরও পানি ঢালি যাতে ফানেলের নলটা সম্পূর্ণভাবে পানিতে ডুবে থাকে। এবার টেস্টটিউবটা পানি দিয়ে পূর্ণ করে বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে বন্ধ করে ফানেলের নলের উপর এমনভাবে উল্টিয়ে দিই যাতে টেস্টটিউবের পানি বের না হয়ে যায়। এরপর এসব কিছুকে সূর্যালোকে রাখি।

পর্যবেক্ষণ : কিছুক্ষণ পর দেখতে পাব হাইড্রিলা উদ্ভিদগুলোর কাণ্ডের প্রান্ত দিয়ে বুদবুদ আকারে গ্যাস বের হয়ে টেস্টটিউবে জমা হচ্ছে এবং টেস্টটিউবের পানি নিচে নেমে যাচ্ছে। টেস্টটিউবটা প্রায় সম্পূর্ণটা গ্যাসে পূর্ণ হলে, দিয়াশলাইয়ের একটা সদ্য নিবন্ত কাঠি টেস্টটিউবের মুখে প্রবেশ করালে, নিবন্ত কাঠিটি দপ করে জ্বলে উঠবে। দিয়াশলাইয়ের কাঠিটা কেন দপ করে জ্বলে উঠল? এতে কী প্রমাণিত হয়?

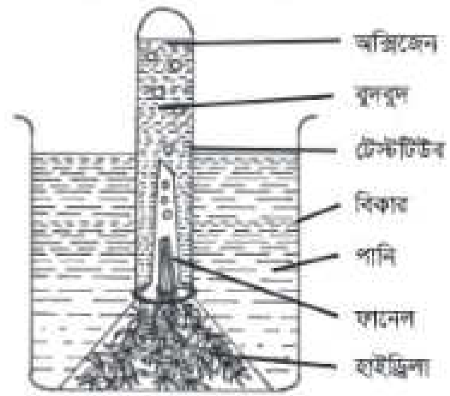

চিত্র ৫.১ : সালোকসংশ্লেষণে অক্সিজেন নির্গমন পরীক্ষা

পাঠ-৭ : জীবজগতে সালোকসংশ্লেষণের তাৎপর্য ও গুরুত্ব

সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমেই সূর্যালোক ও জীবন এর মধ্যে সেতুবন্ধনের সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে সালোকসংশ্লেষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে।

খাদ্য উৎপাদন

১. জীবজগতের জন্য প্রাথমিক খাদ্য শর্করা একমাত্র সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে উৎপন্ন হয়।
২. প্রাণী হোক আর উদ্ভিদ হোক জীবের কর্মচাঞ্চল্যের মূলে আছে খাদ্য। কারণ খাদ্যের সাথে শ্বসনের নিবিড় সম্পর্ক। শ্বসনের ফলে শক্তি নির্গত হয়। তাই তাপ শক্তি সরবরাহকারী শ্বসন প্রক্রিয়াটির উপর উদ্ভিদ ও প্রাণী একান্তভাবে নির্ভরশীল।

পরিবেশে গ্যাস বিনিময়

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষিত হয় এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। ফলে প্রাণিকুলের জন্য ক্ষতিকারক কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষিত হয় এবং শ্বসনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলে সরবরাহ করে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করে।

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা বলা যায় যে জীবনের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ নির্ভর করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার উপর। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বন্ধ হলে মানব সভ্যতা নিঃসন্দেহে ধ্বংস হবে। সে কারণে আমাদের উদ্ভিদ রক্ষায় আরও সচেতন হতে হবে।

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- সালোকসংশ্লেষণে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানি গৃহীত হয় এবং গ্লুকোজ ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে।
- সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের ভারসাম্য রক্ষা হয়।

নতুন শব্দ : সালোকসংশ্লেষণ ও শর্করা খাদ্য।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কোন জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হয়?

ক. শর্করা খ. আমিষ

গ. স্নেহ ঘ. ভিটামিন

২. সালোকসংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান হলো-

i. পানি ii. আলো

iii. অক্সিজেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বিকালে হিমু মাঠে ফুটবল খেলতে যায়। কিন্তু মাঠের মাঝে ঘাসের উপর একটি ইট পড়ে থাকতে দেখে। তখন সে ঘাসের উপর থেকে ইটটি সরিয়ে ফেলে এবং দেখে যে ইটের নিচের ঘাসগুলো সাদা হয়ে গেছে। অথচ পাশের ঘাসগুলো সবুজই রয়ে গেছে।

৩. পাশের ঘাসগুলো সবুজ থাকার কারণ-

i. পানি ii. সূর্যের আলো

iii. কার্বন ডাই-অক্সাইড

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. কোন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হওয়ার কারণে ঘাসগুলো সাদা হলো?

ক. ব্যাপন খ. অভিস্রবণ

গ. শ্বসন ঘ. সালোকসংশ্লেষণ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

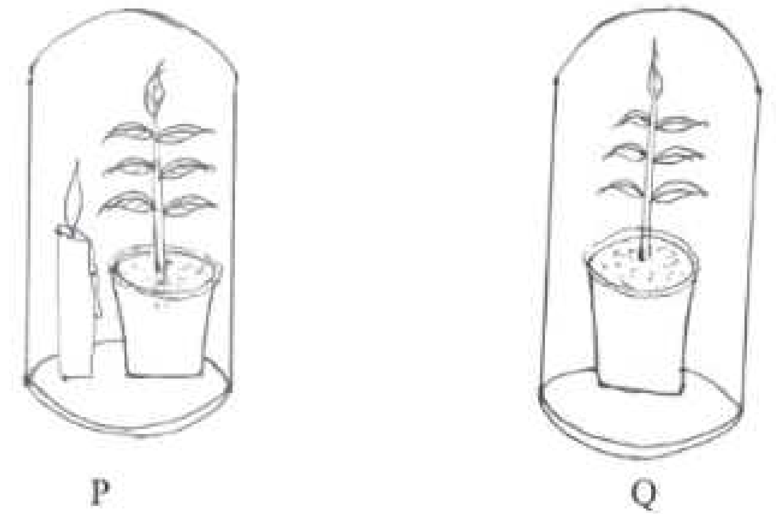

ক. সালোকসংশ্লেষণ কাকে বলে?

খ. সালোকসংশ্লেষণ প্রধানত উদ্ভিদের পাতায় সংঘটিত হয় কেন?

গ. P বেলজারে মোমবাতিটি জ্বলে থাকার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্রে প্রদর্শিত অবস্থায় Q বেলজারের গাছটি বেঁচে থাকবে কি? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২. $$\text{কার্বন ডাই-অক্সাইড} + R \xrightarrow[\text{ক্লোরোপ্লাস্ট}]{\text{আলো}} S + \text{পানি} + \text{অক্সিজেন}$$

ক. পৃথিবীতে সকল শক্তির উৎস কী?

খ. রাতে সালোকসংশ্লেষণ হয় না কেন?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিক্রিয়ায় কীভাবে S যৌগটি তৈরি হয়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জীবজগতে উল্লিখিত বিক্রিয়ার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংবেদি অঙ্গ

আমাদের দেহ একটি আজব যন্ত্র। যন্ত্রটির গড়ন এমন নিখুঁত যে এর কথা ভাবতেই অবাক লাগে। যন্ত্রের প্রতিটি অংশ মাপে মাপে বানানো। একটুও কম-বেশি নেই। আর যন্ত্রটিকে ঠিক ঠিক চালানোর জন্য প্রতিটি অংশ নিজ নিজ কাজ করে চলে। কাউকে কিছু বলতে হয় না। কার কী কাজ সে আপনিই বুঝে নিচ্ছে। আমাদের কিছু বুঝার আগেই ঘটনা ঘটে যায়। যেমন- চোখের দিকে সাঁই করে একটি মাছি উড়ে এলো ওমনি চোখের পাতা গেল বন্ধ হয়ে। অসাবধানে গরম চুলায় হাত পড়লে, তুমি হাত সরিয়ে নেবে। পায়ে কাঁটা ফুটার সাথে সাথে 'উঃ মাগো' বলে কাতরাবে। সারা শরীর জেনে গেল কী একটা পায়ে বিঁধল। আমরা এগুলো অনুভব করতে পারি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। এ অধ্যায়ে আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সম্পর্কে আলোচনা করব।

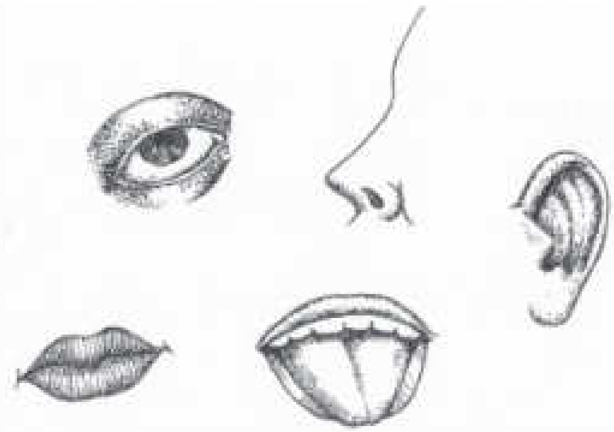

এই অধ্যায় শেষে আমরা

- সংবেদি অঙ্গসমূহের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণে সংবেদি অঙ্গের ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারব।
- সংবেদি অঙ্গের যত্ন নেওয়ার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সংবেদি অঙ্গের যত্নের বিষয়ে নিজে সচেতন হব ও অন্যকে সচেতন করব।

পাঠ ১-৩ : সংবেদি অঙ্গ

আনিকা এবার বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে ষষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। ও বরাবরই লেখাপড়ায় ভালো। সবাই বলে ওর মাথা ভালো। মাথা ভালো মানে মগজ ভালো। আমাদের দেহের চালক হচ্ছে মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ককে আমরা মগজ বলে থাকি। আমাদের দেহের সব কাজই চলছে মস্তিষ্কের হুকুমে। মস্তিষ্ক থাকে মাথার খুলির মধ্যে। খুলির মাঝখানে বসেই আমাদের দেহের বাইরের ও ভিতরের কাজকর্ম চালায় কীভাবে? চোখ, কান, নাক, ত্বক ও জিহ্বা বাইরের সকল খবরা-খবর জোগাড় করে মস্তিষ্ককে জানিয়ে দেয়। চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি, জিহ্বা দিয়ে আমরা খাবারের স্বাদ গ্রহণ করি, ত্বক দিয়ে গরম, ঠান্ডা, তাপ, চাপ অনুভব করি। এগুলো সংবেদি অঙ্গ। এদের সাহায্যে মস্তিষ্ক জানতে পারে বাইরের সকল খবরা-খবর। যেমন : তুমি রাস্তা পার হবে, হঠাৎ করে গাড়ি তোমার সামনে এসে পড়ল। তোমার চক্ষু তখনই জানিয়ে দেবে মস্তিষ্ককে। মস্তিষ্ক তখন তোমার মাংসপেশিদের বলবে দাঁড়িয়ে যাও, এখন রাস্তা পারাপারের দরকার নেই। অমনি তোমার পা দুটো দাঁড়িয়ে যাবে।

চোখ

আমরা চোখ বা অক্ষি দিয়ে পৃথিবীর সকল জিনিস দেখতে পাই। চোখ কীভাবে গঠিত? মাথার সামনে দুটো অক্ষি কোটরের মধ্যে এক জোড়া চোখ থাকে। ছয়টি পেশির সাহায্যে প্রতিটি চোখ অক্ষি কোটরে আটকানো থাকে। এই পেশিগুলোর সাহায্যে অক্ষিগোলক নড়াচড়া করানো যায়। আমরা যাকে অশ্রু বলি তা হলো চোখের পানি। এ অশ্রু আসে কোথা থেকে? অশ্রুগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত তরল যা চোখের পানি বা অশ্রু নামে পরিচিত। অশ্রু সবসময় চোখকে ভেজা রাখে, বাইরের ধুলাবালি ও জীবাণু পড়লে তা ধুয়ে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। চোখের ত্বক স্বচ্ছ আর পেছনের অংশ কালো। তার ফলে আমাদের চোখ হয়েছে ছোট্ট ক্যামেরার মতো। চোখের বিভিন্ন অংশ ও কাজগুলো নিম্নরূপ–

(১) চোখের পাতা : চোখের বাইরের আবরণ। চোখের পাতা খোলা ও বন্ধ করা যায়। এটা বন্ধ করে চোখকে ধুলাবালি থেকে রক্ষা করা যায়।

(২) কনজাংকেটিভা : চোখের পাতা খুললেই চোখের যে অংশটুকু আমরা দেখতে পাই, সে অংশটুকু একটা পাতলা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে তার নাম কনজাংকেটিভা। এই পর্দাটি জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হলেই তাকে কনজাংটিভাইটিস বা চোখ উঠা রোগ বলে।

(৩) অক্ষিগোলক : এটি গোলাকার বলের মতো অঙ্গ। গোলকটি তিনটি স্তর নিয়ে গঠিত।

ক) স্ক্লেরা : অক্ষিগোলকের বাইরের সাদা, শক্ত ও পাতলা স্তরটি হলো স্ক্লেরা। এটি চোখের আকৃতি রক্ষা করে। এর ভিতর দিয়ে কোনো আলো প্রবেশ করতে পারে না।

কর্নিয়া : স্ক্লেরার সামনের চকচকে অংশটি হলো কর্নিয়া। এ অংশটি একেবারেই স্বচ্ছ। এর ভিতর দিয়েই আলো চোখের ভিতর প্রবেশ করে।

খ) কোরয়েড : স্ক্লেরা স্তরের নিচের স্তরটি কোরয়েড। এটা একটা ঘন রঞ্জিত পদার্থের স্তর। এখানে বহু রক্তনালি প্রবেশ করে।

আইরিশ : কর্নিয়ার পেছনে কালো গোলাকার পর্দা থাকে। একে আইরিশ বলে। এটি কোরয়েডের অংশ আইরিশের মাঝখানে একটি ছিদ্র থাকে, যাকে পিউপিল বলে। আইরিশ পেশি দিয়ে তৈরি। একে আমরা সাধারণত চোখের মণি বলে থাকি। আইরিশের পেশিগুলো সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে। আইরিশের পেশি সংকোচন প্রসারণের ফলে পিউপিল ছোটো বড়ো হতে পারে। এর ফলে আলোকরশ্মি রেটিনায় প্রবেশ করতে পারে।

লেন্স : পিউপিলের পেছনে একটি দ্বি-উত্তল লেন্স থাকে। লেন্সটির মাঝখানের দুই দিক উঁচু আর আগাটা সরু। লেন্সটি এক বিশেষ ধরনের সিলিয়ারি পেশি দ্বারা আটকানো থাকে। এ পেশিগুলো সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে। এদের সংকোচন প্রসারণ দরকার মতো লেন্সের আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে।

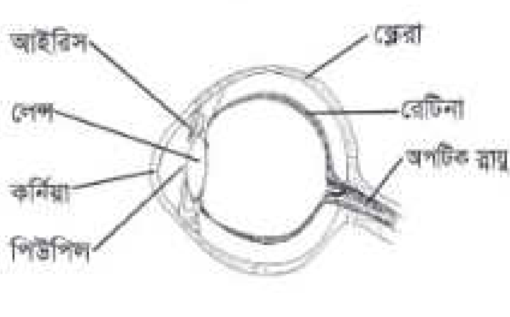

চিত্র ৬.১ : চোখের অন্তঃগঠন

গ) রেটিনা : রেটিনা অক্ষিগোলকের সবচেয়ে ভিতরের স্তর। এটি একটি আলোক সংবেদি স্তর। এখানে রড ও কোন নামে দুই ধরনের কোষ রয়েছে।

চোখের লেন্সটি চক্ষু গোলককে সামনে ও পেছনে দুটি অংশে বিভক্ত করে। এই অংশগুলোকে প্রকোষ্ঠ বলে। সামনের প্রকোষ্ঠে জলীয় এবং পেছনের প্রকোষ্ঠে এক বিশেষ ধরনের জেলীর মতো তরল পদার্থ থাকে, যা চক্ষুগোলকে আলোকরশ্মি প্রবেশ, পুষ্টি সরবরাহ এবং চক্ষুগোলকের আকার বজায় রাখতে সহায়তা করে।

চোখের যত্ন : চোখ একটি কোমল অঙ্গ, খুব যত্নে রাখতে হবে। ঠিকমতো যত্ন না নিলে চোখে নানা অসুখ হতে পারে। যেভাবে চোখের যত্ন নেওয়া যায় তাহলো-

- ঘুম থেকে উঠে ও বাইরে থেকে আসার পর অবশ্যই পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে চোখ দুটি পরিষ্কার করা।
- চোখ মোছার জন্য পরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করা।
- নিয়মিত সবুজ শাকসবজি ও রঙিন ফলমূল খাওয়া। এগুলোতে ভিটামিন এ থাকে। এগুলো চোখের জন্য খুবই ভালো। এগুলো খেলে রাতকানা হওয়া এড়ানো যায়।

কাজ : মডেল বা চার্টের সাহায্যে চোখের বিভিন্ন অংশগুলো চিনে নাও। এবার খাতায় মানুষের চোখের একটি চিত্র এঁকে এর অংশগুলোর নাম লিখ।

নতুন শব্দ : সংবেদি অঙ্গ, রেটিনা, লেন্স, অক্ষিগোলক, পিউপিল, আইরিশ, স্ক্লেরা ও কনজাংকটিভা।

পাঠ ৪-৫ : কান বা কর্ণ

আমরা কী দিয়ে শুনি? আমরা কান দিয়ে শুনি। কান না থাকলে আমরা শুনতে পেতাম না। কথাও বলতে পারতাম না, কারণ কথা বলাটা তো শিখতে হয় শুনে শুনে।

আমাদের মাথার দুই পাশে দুটো কান বা কর্ণ আছে। কর্ণ বা কান আমাদের শুনতে ও দেহের ভারসাম্য রক্ষার প্রধান অঙ্গ হিসেবেও কাজ করে। আমাদের কান তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা- ১. বহিঃকর্ণ, ২. মধ্যকর্ণ ও ৩. অন্তঃকর্ণ।

১। **বহিঃকর্ণ :** পিনা, কর্ণকুহর ও কর্ণপটহ নিয়ে বহিঃকর্ণ গঠিত।

চিত্র ৬.২ : কানের অন্তঃগঠন

(ক) পিনা : এটি কানের বাইরের অংশ। মাংস ও কোমলাস্থি দিয়ে গঠিত। শব্দ কর্ণকুহরে পাঠানো এর প্রধান কাজ।

(খ) কর্ণকুহর : পিনা একটি নালির সাথে যুক্ত। এ নালিটিকে কর্ণকুহর বলে।

(গ) কর্ণপটহ : কর্ণকুহর শেষ হয়েছে একটা পর্দায়। এ পর্দাটির নাম কর্ণপটহ বা টিমপেনিক পর্দা। কর্ণপটহ বহিঃকর্ণের শেষ অংশ।

২। **মধ্যকর্ণ :** বহিঃকর্ণ ও অন্তঃকর্ণের মাঝখানে মধ্যকর্ণ অবস্থিত। এটা একটা বায়ুপূর্ণ থলি যার মধ্যে ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস নামে তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাড় বা অস্থি রয়েছে। অস্থিসমূহের মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গ বা ঢেউ অন্তঃকর্ণে পৌছায়। কানের সাথে গলার সংযোগের জন্য ইউস্টেশিয়ান টিউব নামে একটি নল আছে। এ নলটির কাজ হলো কর্ণপটহের বাইরের ও ভেতরের বায়ুর চাপ সমান রাখা।

৩। **অন্তঃকর্ণ :** এটি অডিটরি ক্যাপসুল অস্থির মধ্যে অবস্থিত। অন্তঃকর্ণ দুটি প্রধান প্রকোষ্ঠে বিভক্ত।

(ক) ইউট্রিকুলাস : অন্তঃকর্ণের এ প্রকোষ্ঠটি তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালি দিয়ে গঠিত। এদের ভিতরে আছে খুব সূক্ষ্ম লোমের মতো স্নায়ু ও রস। নালির ভিতরের এ রস যখন নড়ে বা আন্দোলিত হয়, তখনই স্নায়ুগুলো উদ্দীপ্ত হয়। আর তখনই সে উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পৌছায়। এই অংশ দেহের ভারসাম্য রক্ষার কাজ করে।

(খ) স্যাকুলাস : অন্তঃকর্ণের এই প্রকোষ্ঠের চেহারা অনেকটা শামুকের মতো প্যাঁচানো নালিকার মতো। একে ককলিয়া বলে। ককলিয়ার ভেতরে শ্রবণ সংবেদি কোষ থাকে। প্যাঁচানো নালিকা এক ধরনের রসে পূর্ণ থাকে। এই অংশ শ্রবণের কাজ করে।

কানের যত্ন : কান আমাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয়। কানের সমস্যার কারণে আমরা বধির হয়ে যেতে পারি। কানের যত্ন নেওয়ার জন্য যা করতে হবে, তাহলো-

- নিয়মিত কান পরিষ্কার করা।
- গোসলের সময় কানে যেন পানি না ঢোকে সেদিকে সতর্ক থাকা।
- কানে বাইরের কোনো বস্তু বা পোকামাকড় ঢুকলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া।
- উচ্চ শব্দে গান না শুনা।

পাঠ- ৬

> কাজ : মডেল বা চার্টের সাহায্যে কানের বিভিন্ন অংশগুলো চিনে নাও। এবার খাতায় মানুষের কানের একটি চিত্র এঁকে এর অংশগুলোর নাম লিখ। বিভিন্ন অংশের কাজ উল্লেখ কর।

নতুন শব্দ : কর্ণপটহ, মধ্যকর্ণ, অন্তঃকর্ণ, অর্ধবৃত্তাকার নালি ও ককলিয়া।

পাঠ -৭ : নাক

নাক : আমরা নাক দিয়ে কোনটা সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ তা অনুভব করতে পারি। নাক দিয়ে আমরা শ্বাস নেই। ফুলের সুগন্ধ প্রাণভরে গ্রহণ করি আর পচা, ময়লা ও আবর্জনার গন্ধ পেলে নাকে কাপড় দেই। মুখ গহ্বরের উপরে নাক অবস্থিত। এর দুটো অংশ আছে, (১) নাসারন্ধ্র ও (২) নাসাপথ।

(১) **নাসারন্ধ্র :** নাকের যে ছিদ্র দিয়ে বাতাস দেহের ভেতরে ঢোকে তাকে নাসারন্ধ্র বলে।

(২) **নাসাপথ :** এটা নাসারন্ধ্র থেকে গলার পেছন ভাগ বা গলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত একটি গহ্বর। এ গহ্বরটি ত্রিকোণাকার। পাতলা প্রাচীর দিয়ে গহ্বরটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এর সামনের ভাগ লোম দ্বারা আবৃত থাকে ও পেছনের দিকটা পাতলা আবরণী ঝিল্লি দ্বারা আবৃত থাকে। এই ঝিল্লিকে ঘ্রাণঝিল্লিও বলা হয়। এতে থাকে সূক্ষ্ম রক্তনালিকা যা অসংখ্য ঘ্রাণকোষের সাথে সংযোগ রক্ষা করে।

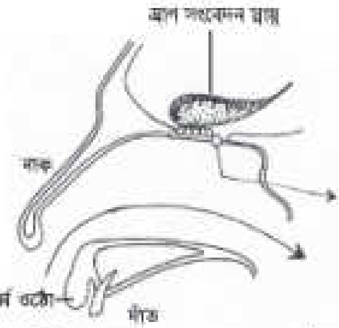

চিত্র ৬.৩ : নাকের অন্তঃগঠন

নাকের যত্ন : নাক দিয়ে আমরা ঘ্রাণ নিই। শ্বাস-প্রশ্বাস চালাই, নাকের মধ্যে শ্লেষ্মা ঝিল্লির আবরণ থাকে। শিশুদের নাকের শ্লেষ্মার সাথে ধুলাবালি জমে, এগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

জিহ্বা

রাকিবের খুব মিষ্টি পছন্দ। মিষ্টি দেখলে ওর জিভে পানি আসে। জিভ বা জিহ্বা দিয়ে আমরা খাদ্যবস্তুর টক, ঝাল, মিষ্টি, তিতা স্বাদ গ্রহণ করে থাকি। এটা আমাদের স্বাদ ইন্দ্রিয়। মুখ গহ্বরে অবস্থিত লম্বা পেশিবহুল অঙ্গটি হল জিহ্বা। জিহ্বার উপরে একটি আস্তরণ আছে, এতে বিভিন্ন স্বাদ গ্রহণের জন্য স্বাদ কোরক থাকে।

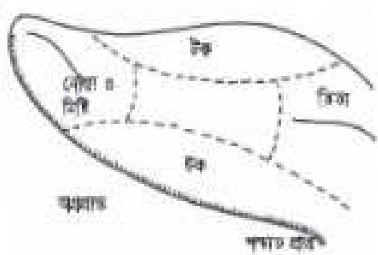

চিত্র ৬.৪ : জিহ্বার গঠন ও স্বাদ অঞ্চল

জিহ্বার কাজ

- খাদ্যের স্বাদগ্রহণ করা।
- খাবার গিলতে সাহায্য করা।
- খাদ্যবস্তুকে নেড়েচেড়ে দাঁতের নিকট পৌঁছে দেয়। ফলে খাদ্যবস্তু চিবানো সহজতর হয়।
- খাদ্যবস্তুকে লালার সাথে মিশ্রিত করতে সাহায্য করে।
- জিহ্বা আমাদের কথা বলতে সাহায্য করে।

জিহ্বার যত্ন

খাদ্য পরিপাকের জন্য জিহ্বা একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। জিহ্বার যত্ন নিতে হলে যা করতে হবে তা হলো-

- দাঁত ব্রাশ করার সময় নিয়মিত জিহ্বা পরিষ্কার করা।
- শিশুদের নিয়মিত জিহ্বা পরিষ্কার করা উচিত। তা না হলে জিহ্বায় ছত্রাকের সংক্রমণ হতে পারে।
- অনেক রোগের কারণে জিহ্বার উপর সাদা বা হলদে পর্দা পড়ে। জ্বর হলে সাধারণত এটা হয়। এ সময় পানিতে লবণ গুলে কুলকুচি করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।
- শিশুদের জিহ্বা নিয়মিত পরিষ্কার না করলে জিহ্বার উপর দইয়ের মতো দেখতে ছোটো ছোটো দাগ দেখা দেয়। এটা এক প্রকার ছত্রাকের সংক্রমণ থেকে হয়।
- মুখ ও জিহ্বায় ঘা হলে অতি তাড়াতাড়ি ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

নতুন শব্দ : স্বাদ কোরক, নাসাপথ ও গলবিল।

পাঠ-৮ : ত্বক ও ত্বকের যত্ন

আমরা শরীরের উপর দিয়ে পিঁপড়ে হেঁটে গেলে টের পাই। কোনো জিনিস গরম না ঠান্ডা তা বুঝতে পারি। কেউ তোমাকে ছুঁলে তাও বুঝতে পার। এগুলো কে করে? কীভাবে ঘটে? চর্ম বা ত্বকের সাহায্যে এগুলো ঘটে।

ত্বক বা চামড়া

যেসব অঙ্গ দিয়ে আমাদের দেহ গঠিত, সেগুলো যাতে রোগজীবাণু বা বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা পায়, সেজন্য সমস্ত দেহ চামড়া বা ত্বক দিয়ে ঢাকা থাকে। এ ত্বকই হচ্ছে আমাদের দেহের আবরণ। ত্বকের দুটি স্তর আছে, একটি উপচর্ম বা বহিঃত্বক এবং অন্যটি অন্তঃচর্ম বা অন্তঃত্বক।

উপচর্ম : উপচর্ম হচ্ছে ত্বকের বাইরের আবরণ। হাতের তালু ও পায়ের তালুর চামড়া বা ত্বক খুব পুরু আবার ঠোঁটের চামড়া বা ত্বক পাতলা। এ উপচর্ম থেকেই লোম, চুল ও নখের উৎপত্তি হয়। উপচর্মে লোমকূপও রয়েছে।

অন্তঃচর্ম বা অন্তঃত্বক : অন্তঃত্বকে রয়েছে রক্তনালি ও স্নায়ু। এ ছাড়াও রয়েছে লোমের মূল, ঘর্মগ্রন্থি, তেলগ্রন্থি, স্বেদগ্রন্থি ইত্যাদি। লোমহীন স্থানে অর্থাৎ করতল ও পদতলে স্বেদগ্রন্থির সংখ্যা বেশি থাকে।

ত্বকের সাধারণ কাজ

- দেহের ভিতরের কোমল অংশকে বাইরের আঘাত, ঠান্ডা, গরম, রোদ ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে।
- দেহে রোগজীবাণু ঢুকতে বাধা দেয়।
- ঘাম বের করে দিয়ে শরীর ঠান্ডা ও সুস্থ রাখে।
- দেহের ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয়।
- সূর্য রশ্মি থেকে দেহকে রক্ষা করে।

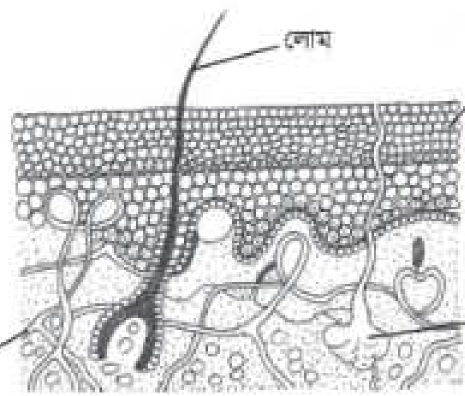

চিত্র ৬.৫ : ত্বকের অনুচ্ছেদ

ত্বকের যত্ন

ত্বক আমাদের দেহের বাইরের আবরণ তৈরি করে। ত্বকের যত্ন নিতে হলে যা করা দরকার, তা হলো-

- নিয়মিত গোসল করা। নিয়মিত গোসল করলে ত্বক বা চামড়ার সংক্রমণ, খুশকি, চুলকানি ইত্যাদি সমস্যা এড়ানো যায়।
- অন্যের ব্যবহার করা তোয়ালে ব্যবহার করা উচিত নয়। দুই-একদিন পরপর নিজের ব্যবহৃত তোয়ালে বা গামছা গরম পানি ও সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা।
- ত্বকে কোনো রকম রোগ (যেমন- খোসপাঁচড়া, দাদ) দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো মলম ব্যবহার করা যাবে না।

কাজ : মডেল বা চার্ট দেখে ত্বকের চিত্র অঙ্কন কর এবং এর বিভিন্ন অংশে চিহ্নিত করো।

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম-

- চোখের লেন্স দ্বিউত্তল।
- সিলিয়ারি পেশি সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে লেন্সকে বাঁকাতে, গোল ও চ্যাপ্টা করতে পারে।
- আইরিশ পেশি সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে পিউপিল ছোট বড় করা যায়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর।

১. ------------ ভেতর দিয়ে আলো প্রবেশ করে।
২. ------------ মধ্যে তিনটি ক্ষুদ্র অস্থি থাকে।
৩. ---------- বহিঃকর্ণের শেষ অংশ।
৪. জিহ্বায় স্বাদ ------------ থাকে।
৫. ঘ্রাণ কোষগুলো বিশেষ স্নায়ুর সাহায্যে -------------- সাথে সংযোগ রক্ষা করে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আমাদের দেহের চালক কোনটি?

ক. হাত　　খ. পা
গ. চোখ　　ঘ. মস্তিষ্ক

২. ঘাম তৈরি হয় কোথায়?

ক. উপচর্মে　　খ. অন্তঃত্বকে
গ. ঘর্মগ্রন্থিতে　　ঘ. লোমকূপে

নিচের অংশটুকু পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

বারো বছর বয়সী একজন ছেলে রতন অনিয়মিতভাবে গোসল করে, এমনকি গোসলের পর নির্দিষ্ট তোয়ালে ব্যবহার করে না। সম্প্রতি তার মাথায় খুশকির মাত্রা খুব বেড়েছে। এ ছাড়া তার গায়ে খোসপাঁচড়া হওয়ায় সে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে মলম কিনে লাগায়।

৩. রতনের মাথায় কীসের সমস্যা হয়েছে?

ক. ত্বকের　　খ. চুলের
গ. গ্রন্থির　　ঘ. মস্তিষ্কের

৪. খোসপাঁচড়া যাতে না হয় সে জন্য রতনের

i. নিয়মিত গোসল করতে হবে　　ii. পরিষ্কার তোয়ালে ব্যবহার করতে হবে
iii. যেকোনো মলম লাগাতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. জিহ্বাকে স্বাদ ইন্দ্রিয় বলা হয় কেন?
২. মধ্যকর্ণ কীভাবে শ্রবণে সহায়তা করে?
৩. চোখের রেটিনার কাজ কী?
৪. চোখের লেন্স নষ্ট হয়ে গেলে কী ঘটবে?
৫. ত্বকের কাজ কী?

নিজেরা কর

১. তোমার জিহ্বা যে একটি স্বাদ ইন্দ্রিয় তা তুমি কীভাবে নির্ণয় করবে বর্ণনা কর।
২. চোখের একটি চিত্র এঁকে লেন্স ও রেটিনা চিহ্নিত কর এবং চিত্রের পাশে এর কাজ লিখ।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পাশের চিত্র দেখে নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
ক. স্ক্লেরা কী?
খ. চোখের G অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে কী ঘটবে?
গ. B অংশের কাজ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. J অংশ কীভাবে আমাদের দেখতে সাহায্য করে আলোচনা কর।

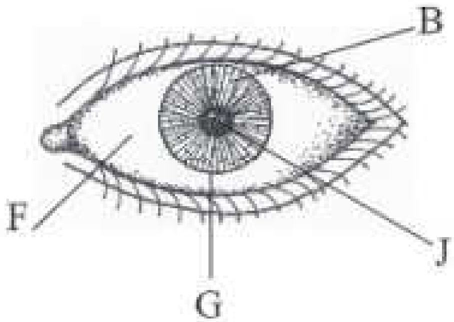

২. পাশের চিত্র দেখে নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
ক. সংবেদি অঙ্গ কাকে বলে?
খ. A চিহ্নিত অংশে না থাকলে কী ঘটবে ব্যাখ্যা কর।
গ. E চিহ্নিত অংশের কাজ উল্লেখ কর।
ঘ. C ও F চিহ্নিত অংশের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।

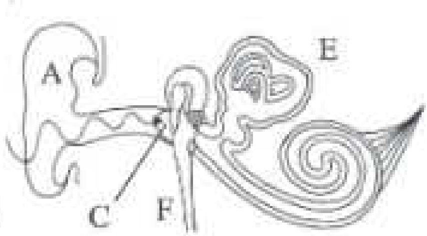

সপ্তম অধ্যায়

পদার্থের বৈশিষ্ট্য ও বাহ্যিক প্রভাব

লোহা, তামা, রবার, কাঠ ইত্যাদি হাজারো রকমের পদার্থ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন বলেই এদের একেকটি একেক কাজে ব্যবহৃত হয়।

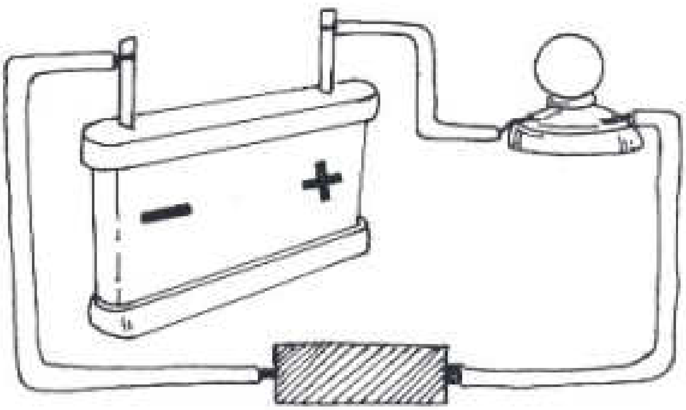

এই অধ্যায় শেষে আমরা

- পদার্থের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করতে পারব।
- বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে পদার্থের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারব।
- তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ধাতু এবং অধাতুর কল্যাণকর দিক উপলব্ধি করব এবং এদের ব্যবহার ও সংরক্ষণে যত্নশীল হব।
- পরীক্ষণের সাহায্যে ধাতু এবং অধাতুর তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতা নির্ণয় করতে পারব।
- গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরীক্ষণের সাহায্যে পদার্থের গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয় করতে পারব।
- থামা ঘড়ি ও থার্মোমিটার সুনিপুণভাবে ব্যবহারে সক্ষম হব।
- শীতলীকরণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আঘাতে ধাতু এবং অধাতুর পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরীক্ষণ কার্যক্রম চলাকালে পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হব এবং অন্যদের সচেতন করব।

পাঠ ১-৩ : পদার্থের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিন্যাস

কোনো কিছু করতে গেলেই আমাদের নানা রকম জিনিস ব্যবহার করতে হয়। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই আমাদের হাত মুখ ধোয়ার জন্য পানি থেকে শুরু করে নানা রকম খাদ্যসামগ্রী, হাঁড়িপাতিল, কাপড়চোপড়, খেলনা, পাথর, সাইকেল, ফুটবল, মার্বেল, বইপত্রসহ হাজারো রকমের জিনিস আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করছি। এদের মধ্যে কোনোটি নরম, কোনোটি শক্ত, কোনোটি দেখতে চকচকে, কোনোটি গোল, কোনোটি চ্যাপ্টা ইত্যাদি। কিন্তু এ গুলো সবই পদার্থ। এগুলো সবকয়টিই জায়গা দখল করে এবং প্রত্যেকেরই ভর আছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, যা জায়গা দখল করে ও যার ভর আছে তাকেই পদার্থ বলে। পদার্থের কিছু অতিক্ষুদ্র কণার আয়তন অবশ্য খুবই নগণ্য।
পৃথিবীতে হাজারো রকমের পদার্থ রয়েছে এবং তাদেরকে নানাভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। এর একটি শ্রেণিবিন্যাস হলো পদার্থের অবস্থার উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। এক টুকরো বরফ নিয়ে একটি পাত্রে রেখে দিলে কি ঘটে? এটি পানিতে পরিণত হয়। আবার ঐ পানিকে তাপ দিলে তা বাষ্পে পরিণত হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পানি তিনটি অবস্থায় থাকতে পারে। আর তাহলো বরফ, পানি আর বাষ্প। যখন বরফ আকারে থাকে তখন এটিকে বলা হয় কঠিন অবস্থা। পানির আকারে থাকলে তখন এটিকে বলা হয় তরল অবস্থা আর বাষ্প আকারে থাকলে এটি হলো গ্যাসীয় অবস্থা। তাই অবস্থাভেদে পদার্থকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

পদার্থ

কঠিন | তরল | গ্যাসীয় বা বায়বীয়

এখানে প্রশ্ন হলো কী কী বৈশিষ্ট্য থাকলে একটি পদার্থ কঠিন, তরল অথবা বায়বীয় হবে?

কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকৃতি আছে। কোনো বস্তু যতটুকু জায়গা দখল করে সেটিই ঐ বস্তুর আয়তন। সকল কঠিন বস্তুই জায়গা দখল করে, তাই সকল কঠিন বস্তুরই আয়তন আছে। কঠিন পদার্থের আয়তন ও আকার সহজে পরিবর্তন করা যায় না। এরা যথেষ্ট দৃঢ় অর্থাৎ এদের দৃঢ়তা আছে। তবে কিছু কিছু কঠিন পদার্থের দৃঢ়তা কম যেমন : সরিষার দানা, ভাত, কলা ইত্যাদি।

তরল পদার্থের নির্দিষ্ট কোনো আকৃতি নেই। এটি যে পাত্রে রাখা হয় ঐ পাত্রের আকৃতি ধারণ করে। তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন আছে। কারণ কঠিন পদার্থের মতো এরাও জায়গা দখল করে। এদের আয়তন পরিমাপ করা যায়। এই আয়তন কি পরিবর্তন হয়? না, পাত্রভেদে আকৃতি পরিবর্তন হলেও আয়তন কিন্তু একই থাকে। যেহেতু তরল পদার্থের নির্দিষ্ট কোনো আকৃতি নেই, আকৃতি পরিবর্তনশীল, সেহেতু বলা যায় যে এরা কঠিন পদার্থের মতো দৃঢ় নয়। অর্থাৎ তরল পদার্থের দৃঢ়তা নেই।

গ্যাসের বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্য আমরা বাতাসের কথাই ধরি। বাতাসের কোন নির্দিষ্ট আকৃতি নেই। গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন আছে কি? তোমরা দুটি সিলিন্ডারের কথা চিন্তা কর কর যার একটি ছোট আর একটি বড়। এখন যদি সমপরিমাণ গ্যাস দুই সিলিন্ডারে রাখ তাহলে এখন যদি সমপরিমাণ গ্যাস দুই সিলিন্ডরে রাখ

তাহলে তা ছোটো সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে যেমন সম্পূর্ণ সিলিন্ডার জুড়ে থাকবে, তেমনি একই পরিমাণ গ্যাস বড়ো সিলিন্ডারে রাখলেও তা সম্পূর্ণ সিলিন্ডার জুড়ে থাকবে। তাহলে বলা যায় যে, একই প মাণ গ্যাস ছোটো পাত্রে রাখলে এর আয়তন কম হয় অথচ বড়ো পাত্রে রাখলে এর আয়তন বেশি হয়। অর্থ্যাৎ গ্যাসীয় পদার্থ যে পাত্রে রাখা হয় ঐ পাত্রের আয়তনই গ্যাসের আয়তন। গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট আকৃতি ও আয়তন নেই। দৃঢ়তা তো নেই বটেই।

এ ছাড়া পদার্থকে যেসব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করা যায় তা হলো ঘনত্ব, কাঠিন্য, নমনীয়তা তাপ পরিবাহিতা ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতা।

কাজ : তোমার বাড়ি ও স্কুল থেকে নিচের জিনিসগুলো সংগ্রহ কর।
চক, পেনসিল, নোটবুক, রবার, ডাস্টার, হাতুড়ি, তারকাঁটা, সাবান, সাইকেলের চাকার স্পোক, ক্রিকেট ব্যাট, দিয়াশলাইয়ের বাক্স, লবণ, অ্যালুমিনিয়ামের থালাবাসন ও স্কুলের ঘন্টা। এসের কোনো কোনোটা কাগজ, কাঠের ও ধাতুর তৈরি এবং কোন কোনোটা এসবের কোনোটা দিয়ে তৈরি নয়। কোনটি চক্ চক্ করে এবং কোনটি করে না সে অনুযায়ী এদের ভাগ কর।

কাঠিন্য ও নমনীয়তা

কোনো পদার্থ নরম, কোনোটা শক্ত, কোনোটা নমনীয়, কোনোটা অনমনীয়। নিজেরা কাজটি করো। এদের সম্পর্কে জানো।

কাজ : একটি অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র, একখণ্ড রবার, একখণ্ড কাঠ, মোমবাতি, এক টুকরা পাথর ও একটি প্যারেক নাও। এগুলোতে একটি ধাতব চাবি দিয়ে দাগ কেটে দেখ। কোনোটাতে খুব সহজে দাগ কাটা যায়। কোনোটাতে দাগ কাটা কঠিন। দুই আঙুলের মাঝে নিয়ে এদের প্রত্যেককে চাপ দিয়ে দেখ। দেখো কোনটা নমনীয়, কোনটা শক্ত ও অনমনীয়। এদের মধ্যে কোনটা খসখসে, কোনটা মসৃণ ও কোনটা ভঙ্গুর?

এবার নিচের মতো সারণি কর।

বস্তুর নাম	শক্ত	নরম	নমনীয়	অনমনীয়
১।				
২।				
৩।				
৪।				
৫।				
৬।				

ঘনত্বের ভিত্তিতে পদার্থকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। তবে দেখা গেছে ধাতুর ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। পরবর্তী পাঠগুলোতে আমরা পদার্থের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব।

পাঠ ৪- ৬ : ধাতু ও অধাতুর বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মৌলিক পদার্থকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি হলো ধাতু ও অন্যটি অধাতু। এখন আমরা ধাতু ও অধাতুর কিছু বৈশিষ্ট্য জেনে নিই।

ধাতু : অ্যালুমিনিয়ামের নানা রকম পাত্র, সোনার গহনা, তামার বৈদ্যুতিক তার -এগুলোকে আমরা নানা কাজে ব্যবহার করি। এ পদার্থগুলো দেখতে কেমন? চকচকে। এটি হলো বেশিরভাগ ধাতুর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

অন্যদিকে রান্নার কাজে আমরা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র বা লোহার কড়াই ব্যবহার করি। কেন? কারণ এগুলো চুলার আগুন থেকে তাপ পরিবহন করে রান্নার মূল উপাদানে (যেমন-চাল বা মাছ) পৌঁছে দেয় ও উপাদানগুলো ঐ তাপে সিদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ ধাতুসমূহের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা ভালোভাবে তাপ পরিবহন করে। তাই এদের তাপ সুপরিবাহী বলে।

আবার বিদ্যুৎ পরিবহনে তামার তার ব্যবহার করার কারণ কী? বিদ্যুৎ পরিবহন করা। অর্থাৎ ধাতব পদার্থসমূহ বিদ্যুৎ সুপরিবাহী। এককথায় বলা যায়, ধাতু বা ধাতব পদার্থসমূহ সাধারণত দেখতে চকচকে, এবং এরা তাপ ও বিদ্যুৎ সুপরিবাহী হয়।

অধাতু : তোমরা কি বলতে পারবে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন বা হাইড্রোজেন গ্যাস দেখতে কেমন? বলতে পারবে না, কারণ ধাতুর মতো চকচকে বা এ জাতীয় চোখে পড়ার মতো বৈশিষ্ট্য এদের নেই। আবার এগুলো ধাতুর ন্যায় তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহনও করে না। তাই এদেরকে তাপ ও বিদ্যুৎ কুপরিবাহী বা অপরিবাহী পদার্থ বলা হয়।

কাজ : তোমরা ম্যাগনেসিয়াম রিবন, দস্তার পাত, প্লাস্টিক, কাঠের ও স্টিলের স্কেল রোদে রাখ ও ভালোভাবে লক্ষ্য কর কোনটি চক চক করে ও কোনটি করে না, এবং এই তথ্য ছকে লিপিবদ্ধ কর।

ছক

পদার্থের নাম	বৈশিষ্ট্য

কাজ : ধাতব পদার্থের (তামা) তাপ পরিবাহিতা পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : তামার মোটা তার (২০ সেন্টিমিটার), দুটি কর্ক বা শোলার টুকরা, দিয়াশলাই, মোমবাতি বা স্পিরিট ল্যাম্প।

পদ্ধতি : কর্কের মধ্য দিয়ে তামার তার সতর্কতার সাথে এমনভাবে প্রবেশ করাও যাতে একটি তারের মাঝ বরাবর থাকে। মোমবাতিটি জ্বালাও। তামার তারের এক প্রান্ত ধরে অপর প্রান্ত মোমবাতিটির শিখার উপর ধর। এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত হাতে গরম অনুভব না কর ততক্ষণ পর্যন্ত ধরে রাখ।

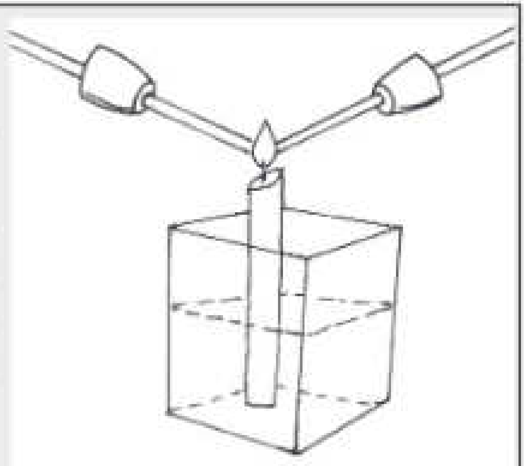

চিত্র ৭.১ : ধাতব পদার্থের তাপ পরিবাহিতা

এখানে কর্ক ব্যবহারের কারণ কী? মোমবাতির শিখা থেকে সরাসরি তাপ যেন হাতে না লাগতে পারে সে জন্য এটি ব্যবহার করা হয়েছে। এখন তোমরা বল তাহলে তামার তারের যে প্রান্ত হাতে ধরে রেখেছ সেখানে গরম অনুভব করছ কেন? মোমবাতির শিখা থেকে তারের এক প্রান্ত তাপ গ্রহণ করছে এবং তামা তাপ সুপরিবাহী হওয়ায় তা তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অপর প্রান্তে পৌঁছেছে। যদি তা না হতো তাহলে তুমি হাতে গরম অনুভব করতে না। তাহলে এই পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে তামা তাপ সুপরিবাহী। তামার মতো সকল ধাতুই তাপ পরিবহন করে।

যে সমস্ত যন্ত্রে তাপ পরিবহন প্রয়োজন হয় (যেমন- রেফ্রিজারেটর, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র, সৌরপ্যানেল ইত্যাদি) সে সমস্ত ক্ষেত্রে ধাতব পদার্থ ব্যবহৃত হয়। তাই এদের সদ্ব্যবহার করা বা অপচয় রোধ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

কাজ : বিভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবাহিতা পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি কাচের চামচ, ১টি প্লাস্টিকের চামচ, ১টি অ্যালুমিনিয়ামের চামচ, ৩টি ১ টাকার মুদ্রা, ১টি ৬০০ মিলিলিটারের বিকার, ৩০০ মিলিলিটার পানি ও স্পিরিট ল্যাম্প, মোম, দিয়াশলাই, থামা ঘড়ি।

পদ্ধতি : দিয়াশলাই জ্বালিয়ে মোমে অল্প তাপ দিয়ে কিছুটা নরম হলে কিছু মোম প্রতিটি চামচের হাতলের উপর চাপ দিয়ে বসাও। এবার মুদ্রাগুলি মোমের উপর রেখে এমনভাবে চাপ দাও যাতে মুদ্রাগুলো চামচের সাথে লেগে থাকে। বিকারে ৩০০ মিলিলিটারের মতো পানি নাও। স্পিরিট ল্যাম্পের উপর বিকারটি বসাও। এখন চামচ তিনটিকে পৃথক পৃথক সুতা দিয়ে বেঁধে বিকারে এমনভাবে ডুবাও যাতে মুদ্রাগুলো বিকারের উপরিভাগের বাইরে থাকে। এবার স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালিয়ে বিকারে তাপ দিতে থাক। মুদ্রাগুলোর দিকে চোখ রাখ। থামা ঘড়ির সাহায্যে কোন মুদ্রাটি চামচ থেকে আলাদা হতে কত সময় লাগে তা নির্ণয় কর।

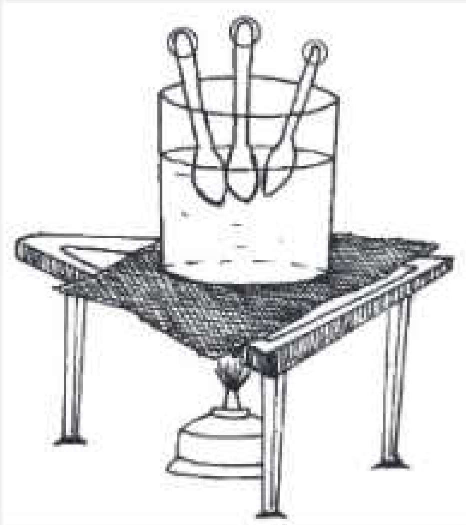

চিত্র ৭.২ : বিভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবাহিতা

কোন চামচ থেকে সবার আগে, কোনটি থেকে সবার পরে মুদ্রা আলাদা হলো? আলাদাই বা হলো কেন? নিঃসন্দেহে অ্যালুমিনিয়ামের চামচ থেকে সবার আগে মুদ্রা আলাদা হলো, কারণ অ্যালুমিনিয়াম তাপ সুপরিবাহী বলে বিকারের গরম পানি থেকে তাপ তুলনামূলকভাবে দ্রুত পরিবাহিত করে মোমে পৌঁছায়। ফলে মোম গলে যায় এবং মুদ্রা মোম থেকে সবার আগে আলাদা হয়ে যায়। পক্ষান্তরে প্লাস্টিকের তাপ পরিবাহিতা সবচেয়ে কম বলে প্লাস্টিকের চামচের গরম প্রান্ত থেকে তুলনামূলকভাবে ধীর গতিতে তাপ পরিবাহিত হয়ে ঠান্ডা প্রান্তে অর্থাৎ মোমের দিকে যায়। ফলে মোম গলতে সময় বেশি লাগে। আর সেকারণেই সবার পরে মোম থেকে মুদ্রা আলাদা হয়। আবার কাচের তাপ পরিবাহিতা অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে কম কিন্তু প্লাস্টিকের চেয়ে বেশি বলে প্লাস্টিকের চেয়ে দ্রুত কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে ধীর গতিতে মোমে পৌঁছায়। ফলে কাচের চামচ থেকে মুদ্রা আলাদা হতে এলুমিনিয়ামের চেয়ে বেশি কিন্তু প্লাস্টিকের চেয়ে কম সময় লাগে।

পাঠ ৭-৮ : ধাতু ও অধাতুর বিদ্যুৎ পরিবাহিতা

এর আগে তোমরা জেনেছ যে ধাতুসমূহ সাধারণত বিদ্যুৎ পরিবাহী ও অধাতুসমূহ বিদ্যুৎ অপরিবাহী বা কুপরিবাহী হয়। এখন তোমরা নিজেরাই দেখবে কীভাবে ধাতুসমূহ বিদ্যুৎ পরিবাহী হিসেবে ও অধাতুসমূহ বিদ্যুৎ অপরিবাহী হিসেবে কাজ করে।

কাজ : ধাতুর বিদ্যুৎ পরিবাহিতা পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি ব্যাটারি, একটি বৈদ্যুতিক বাল্ব, ২টি বৈদ্যুতিক তার, স্টিলের চামচ, অ্যালুমিনিয়ামের টুকরা, রবার, কাঠ ও প্লাস্টিকের চামচ।

পদ্ধতি : ব্যাটারিটি নাও ও দেখ এক প্রান্তে যোগ চিহ্ন (+) অপর প্রান্তে বিয়োগ চিহ্ন (-) দেওয়া আছে। ১টি তামার তার ব্যাটারির এক প্রান্তে এবং অপরটি অপর প্রান্তে আটকিয়ে দাও (চিত্র ৭.৩-এর মতো)। তোমাদের যেকোন একজন বৈদ্যুতিক বাল্বটি নাও। লক্ষ কর বাল্বের যে প্রান্ত আমরা সকেটে প্রবেশ করাই সে প্রান্তে দুই পাশে একটু উঁচু করে বসানো দুটি ধাতব সংযোগ বিন্দু বা মোটা তারের মতো সংযোগ বিন্দু আছে। এবার দুটি তারের একটির খোলা প্রান্ত ঐ দুটি বিন্দুর একটিতে আর অপর তারটির খোলা প্রান্ত অপর সংযোগ বিন্দুতে আটকাও।

চিত্র ৭.৩ : বিদ্যুৎ পরিবাহিতা

কী দেখতে পাচ্ছ তোমরা? বাল্বটি জ্বলে উঠেছে। কারণ তামার তার বিদ্যুৎ সুপরিবাহী বলে এটি ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ পরিবহন করে বাল্বে পৌঁছে দেয়। আর সে কারণেই বাল্ব জ্বলে ওঠে। যদি তামার তার বিদ্যুৎ পরিবাহী না হতো তাহলে বিদ্যুৎ পরিবহন হতো না, ফলে বাল্বও জ্বলত না। এবার তার দুটির সংযোগ খুলে এদের মাঝে লোহা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি দিয়ে সংযোগ দাও। দেখ কী ঘটে।

এরপর কাঠের টুকরা, প্লাস্টিক, রাবার ইত্যাদি দিয়ে দুটো তারের সংযোগ কর। এখন কি বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বলছে? না জ্বলছে না। কারণ রবার, প্লাস্টিক ও কাঠের টুকরা বিদ্যুৎ অপরিবাহী হওয়ায় এটি ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ চার্জ পরিবহন করতে পারছে না।

পাঠ ৯-১১ : গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক

কাজ : কঠিন পদার্থের গলনাঙ্ক সম্পর্কে জানা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি বিকার, মোম, থার্মোমিটার, টেস্টটিউব ও স্পিরিট ল্যাম্প।

পদ্ধতি : টেস্টটিউবে কিছু ছোটো ছোটো মোমের টুকরা নাও। বিকারটিতে পানি নিয়ে স্পিরিট ল্যাম্পের উপর রাখ। চিত্রের মতো করে স্ট্যান্ডের সাথে আটকিয়ে টেস্টটিউব ও থার্মোমিটার বিকারের পানিতে ডুবাও যাতে এদের কোনটিই বিকারের তলা স্পর্শ না করে বা গায়ে না লাগে। স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে বিকারের তলায় তাপ দিতে থাক। থার্মোমিটারের ও টেস্টটিউবে রাখা মোমের দিকে খেয়াল কর। থার্মোমিটারে কি তাপমাত্রা বাড়ছে? মোমের অবস্থার কি কোনো পরিবর্তন ঘটেছে? থার্মোমিটারে তাপমাত্রা ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি আসলে মোমের অবস্থা খুব ভালোভাবে খেয়াল কর।

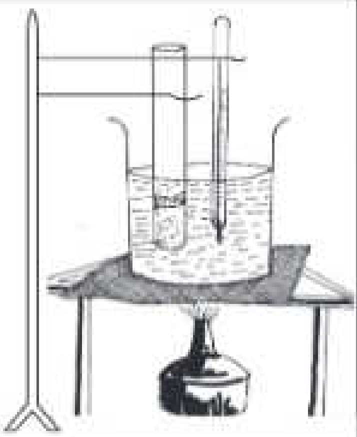

চিত্র ৭.৪ : গলনাঙ্ক নির্ণয়

মোম কি গলে যাচ্ছে? মোম গলা শুরু হলে থার্মোমিটারে তাপমাত্রা দেখ। কত আছে তাপমাত্রা? ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস? এই ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলো মোমের গলনাঙ্ক। তাহলে যে তাপমাত্রায় কোনো কঠিন পদার্থ গলে তরলে রূপান্তরিত হয়, ঐ তাপমাত্রাকে ঐ পদার্থের গলনাঙ্ক বলে। মোমের মতো প্রতিটি কঠিন পদার্থের একটি গলনাঙ্ক আছে। তোমরা বরফের গলনাঙ্ক নির্ণয় কর।

স্ফুটনাঙ্ক

কোনো পাত্রে পানি নিয়ে তাপ দিতে থাকলে কী ঘটে? পানির তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং একপর্যায়ে ফুটতে শুরু করে। যে তাপমাত্রায় পানি ফুটতে শুরু করে সেই তাপমাত্রাই হলো এর স্ফুটনাঙ্ক। পানির ন্যায় প্রতিটি তরল পদার্থের একটি নির্দিষ্ট স্ফুটনাঙ্ক আছে। চলো আমরা পানির স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয় করি।

কাজ : পানির স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি বিকার, পানি, থার্মোমিটার ও স্পিরিট ল্যাম্প।

পদ্ধতি : পাত্রের অর্ধেক ভরে পানি নাও। স্পিরিট ল্যাম্পের উপর বিকারটি বসাও। চিত্রের মতো করে থার্মোমিটারটি পাত্রের পানিতে ডুবাও। এবার তাপ দাও, আর থার্মোমিটারে তাপমাত্রা লক্ষ্য কর। থার্মোমিটারের তাপমাত্রা ৯৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে সতর্কভাবে বিকারের পানি ও থার্মোমিটারের দিকে খেয়াল কর।

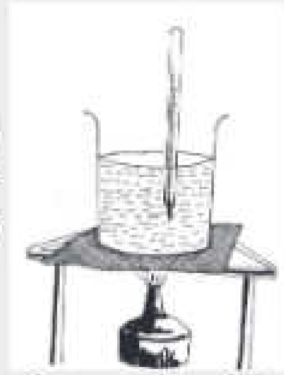

চিত্র ৭.৫ : স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয়

পানি ফুটতে শুরু করলে থার্মোমিটারের তাপমাত্রা দেখ। এই তাপমাত্রাই হলো পানির স্ফুটনাঙ্ক। এই তাপমাত্রা কত? ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তোমরা ইথার বা স্পিরিটের স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয় করতে পার। তবে জৈবপদার্থ দাহ্য হওয়ায় সরাসরি তাপ দেওয়া যাবে না। একটি অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে পানি নিয়ে তাতে ইথার বা স্পিরিটের বিকারটি রেখে তাপ দিতে হবে।

আঘাতে ধাতু ও অধাতুর পরিবর্তন

কাজ : আঘাতে ধাতু ও অধাতুর পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : লোহার প্লেট, তামার পাত্র ও একটি হাতুড়ি।

পদ্ধতি : এক হাতে লোহার প্লেট নিয়ে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত কর। কী ঘটল? লোহার প্লেটটি কি আঘাতের ফলে ভেঙে গেল? একইভাবে তোমরা তামার পাত্রটি নিয়েও হাতুড়ি দিয়ে আঘাত কর। কী ঘটল? এবার গন্ধক ও কয়লা নিয়ে তাতে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে দেখ।

লোহার ও তামার প্লেটে আঘাতের ফলে ঝনঝন শব্দ হলো এবং ভাঙল না। তাহলে আমরা বলতে পারি যে আঘাতে ধাতব পদার্থসমূহ সাধারণত ঝনঝন শব্দ করে এবং খুব সহজে ভাঙে না। অর্থাৎ ধাতুসমূহ ভঙ্গুর নয়। অপর দিকে সালফার ও কার্বন ভেঙে যাবে এবং ঝনঝন শব্দ হবে না।

সাবধানতা: সালফার (গন্ধক) বা কার্বন (কয়লার ছোটো টুকরা) যেন চোখে না ঢুকে বা হাতে না লেগে যায়, সেজন্য নিরাপত্তা চশমা, হাতমোজা পরে নিতে হবে।

হিমাঙ্ক

আমরা জন্মদিনে বা বিদ্যুৎ চলে গেলে মোমবাতি জ্বালাই। এখানে কী ঘটে? মোমবাতির একটি অংশ পুড়ে আলো দেয় আর আরেকটি অংশ আগুনে গলে মোমবাতির গা বেয়ে পড়তে থাকে যা কিছুক্ষণ পরে আবার জমে কঠিন মোমে পরিণত হয়। তরল মোম থেকে কঠিন মোম হওয়ার প্রক্রিয়া হলো কঠিনীভবন। যে তাপমাত্রায় তরল মোম জমে কঠিন হয়ে যায় তাকে বলে এর হিমাঙ্ক। মোমের ন্যায় প্রতিটি তরল পদার্থের ক্ষেত্রেই এমনটি হতে পারে।

১০৫

কাজ : হিমাঙ্ক নির্ণয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি টেস্টটিউব, ১টি বিকার, ১টি স্ট্যান্ড, কিছু মোম, পানি, ১টি থার্মোমিটার, স্পিরিট ল্যাম্প, তারজালি, ত্রিপদী স্ট্যান্ড ও ক্ল্যাম্প।

পদ্ধতি : টেস্টটিউবে কিছু মোম নাও। বিকারের তিন-চতুর্থাংশ ভরে পানি নাও। ত্রিপদী স্ট্যান্ডের উপর তারজালি রেখে তার উপরে বিকারটি বসাও। টেস্টটিউবটি বিকারের পানিতে চিত্রের মতো করে ডুবাও। স্পিরিট ল্যাম্প দিয়ে মোম পুরোপুরি না গলা পর্যন্ত বিকারের তলায় তাপ দিতে থাক। এবার থার্মোমিটার টেস্টটিউবের ভিতরে প্রবেশ করাও যাতে এর নিচের অংশ গলন্ত মোমে ডুবে থাকে। থার্মোমিটারসহ টেস্টটিউবটি বিকার থেকে তুলে এনে স্ট্যান্ডের সাথে আটকিয়ে রাখ। টিস্যু পেপার দিয়ে টেস্টটিউবটি মুছে ফেল। থার্মোমিটারে তাপমাত্রা খেয়াল কর। যে মুহূর্তে মোম জমে যাওয়া শুরু করল সেই মুহূর্তে তাপমাত্রা কত তা লেখে নাও।

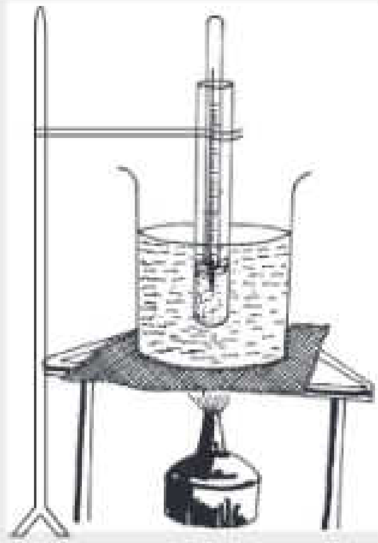
চিত্র ৭.৬ : শীতলীকরণ তাপমাত্রা নির্ণয়

কত তাপমাত্রায় মোম জমতে শুরু করল? ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস? হ্যাঁ, ঠিক তাই। এই তাপমাত্রা অর্থাৎ ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসই হলো মোমের হিমাংক। তোমরা মোমের গলনাংকও পেয়েছিলে ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ একটি বস্তুর গলনাংক ও হিমাঙ্ক একই। তোমরা বলতো পানির হিমাঙ্ক কত? শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাহলে পানির গলনাঙ্কও কিন্তু শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস।

কোনো একটি বস্তুর তাপমাত্রা যদি হিমাঙ্কের উপরে থাকে এবং হিমাঙ্ক যদি পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রার চেয়ে বেশি হয়, তবে পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রায় বস্তুটিকে রেখে দিলে তা ধীরে ধীরে তাপ হারাতে থাকে, ফলে এর তাপমাত্রা কমতে থাকে এবং যখন তাপমাত্রা হিমাঙ্কে চলে আসে, তখন এটি কঠিনে পরিণত হয়। যেমনটি মোমের ক্ষেত্রে হয়েছে। মোম যখন তরল অবস্থায় ছিল, তখন এর তাপমাত্রা ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি ছিল। মোমসহ টেস্টটিউবকে বিকার থেকে তুলে আনায় এটি ধীরে ধীরে তাপ ছেড়ে দেয়। ফলে তাপমাত্রা কমতে থাকে, এভাবে কমতে কমতে যখন তা হিমাঙ্কে পৌঁছায় অর্থাৎ ৫৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে আসে, তখন মোম জমে কঠিন অবস্থায় চলে আসে।

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- যার ভর আছে ও যা জায়গা দখল করে তাই পদার্থ। অবস্থাভেদে পদার্থ কঠিন, তরল ও বায়বীয় -এই তিন রকম হয়।
- কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকৃতি, আয়তন ও দৃঢ়তা আছে। তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন থাকলেও আকার ও দৃঢ়তা নেই।
- বায়বীয় বা গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট আকৃতি, আয়তন ও দৃঢ়তা কোনোটিই নেই।
- মৌলিক পদার্থ ধাতু ও অধাতু এই দুইরকম হয়। ধাতুসমূহ সাধারণত চকচকে হয়। এরা তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহন করে এবং আঘাত করলে ঝনঝন শব্দ হয়। ধাতুসমূহ সহজে ভাঙে না।

- অধাতুসমূহ সাধারণত চকচকে হয় না। এরা তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহন করে না এবং আঘাত করলে ঝনঝন শব্দ করে না। অধাতুসমূহ সহজেই ভেঙে যায়।
- যে তাপমাত্রায় কোনো কঠিন পদার্থ তরলে পরিণত হয়, ঐ তাপমাত্রাই হলো ঐ পদার্থের গলনাঙ্ক। গলনাংক ও হিমাঙ্ক পরিমাণগতভাবে একই।
- যে তাপমাত্রায় কোনো তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হয়, ঐ তাপমাত্রাকে ঐ পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক বলে।

অনুশীলনী

১. বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দের মিল কর।

বাম	ডান
প্রতিটি পদার্থেরই	কোন পদার্থ নয়
শব্দ	তাপ পরিবহন করে না
কঠিন পদার্থের	নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন আছে
ধাতব পদার্থসমূহ আঘাতে	ভর আছে
	ভেঙে যায় না

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পদার্থের বৈশিষ্ট্য কী কী? উদাহরণ দিয়ে বুঝাও।

২. আলো এক ধরনের পদার্থ এটা কি সত্য না মিথ্যা? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও। কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের মধ্যে মূল পার্থক্য কী কী?

৩. বৈদ্যুতিক তারে তামা ব্যবহার করা হয় কেন?

৪. গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক উদাহরণ দিয়ে বুঝাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন পদার্থের দৃঢ়তা কম?

ক. ইট খ. লোহা

গ. কলা ঘ. বরফ

২. কোন পদার্থটি বোতলে রেখে দিলে সম্পূর্ণ বোতল জুড়ে থাকবে?

ক. পানি খ. বাতাস

গ. দুধ ঘ. পাউডার

নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

মাহিনের মা	মাটির পাতিলে রান্না করেন
মাহিনের বাবা	তামার তারের যন্ত্র ব্যবহার করেন
মাহিনের দাদি	বাঁশের ঝুড়ি ব্যবহার করেন
মাহিন	কাচের গ্লাসে পানি পান করেন

২০২৫

৩. ছকের কোন ব্যক্তির ব্যবহারের জিনিসটি বিদ্যুৎ ও তাপ পরিবাহী?

ক. মাথিনের মার খ. মাথিনের বাবার

গ. মাথিনের দাদির ঘ. মাথিনের

৪. তাপ পরিবাহিতার ক্ষেত্রে-

i. মাথিনের মার চেয়ে বাবা বেশি সুবিধা পায় ii. মাথিনের বাবার চেয়ে মাথিন বেশি সুবিধা পায়

iii. মাথিনের বাবার চেয়ে দাদি কম সুবিধা পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ফজলুল হক সাহেবের মা মাটির চুলায় মাটির পাতিলে রান্না করেন। অপরদিকে তার স্ত্রী গ্যাসের চুলায় অ্যালুমিনিয়ামের পাতিলে রান্না করেন।

ক. পদার্থ কী?

খ. অধাতু বলতে কী বুঝায়?

গ. ফজলুল হক সাহেবের স্ত্রীর ব্যবহৃত পাত্রটির উপাদানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রান্নার ক্ষেত্রে ফজলুল হক সাহেবের মা ও স্ত্রীর মধ্যে কে বেশি সুবিধা পান বিশ্লেষণ কর।

২.

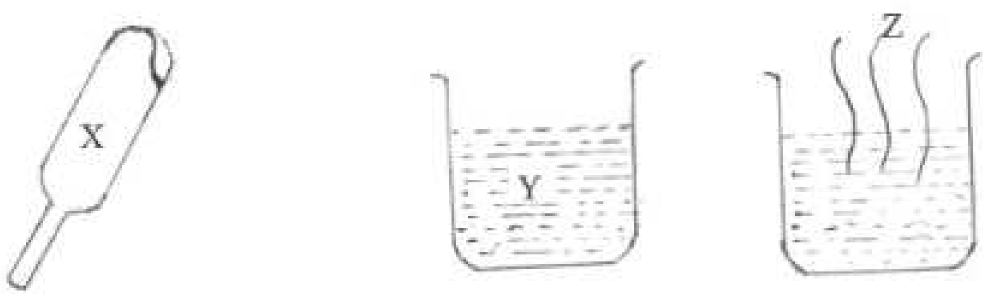

ক. স্ফুটনাঙ্ক কী?

খ. তাপ পরিবাহিতা বলতে কী বুঝায়?

গ. চিত্রে X কীভাবে Z এ পরিণত হয়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তিনটি চিত্রের পদার্থই একই উপাদানে গঠিত: বিশ্লেষণ কর।

অষ্টম অধ্যায়

মিশ্রণ

দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানা রকমের জিনিস ব্যবহার করে থাকি। এদের কোনোটি বিশুদ্ধ আর কোনোটি মিশ্রণ। মিশ্রণের মধ্যে আবার কোনোটি দ্রবণ, কোনোটি সাসপেনসন আর কোনোটি কলয়েড।

এই অধ্যায় শেষে আমরা

- মিশ্রণ এবং দ্রবণের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার দ্রবণের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- পানি এবং কঠিন পদার্থ নিয়ে বিভিন্ন প্রকার দ্রবণ প্রস্তুত করতে পারব।
- দ্রবণে তাপমাত্রার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সর্বজনীন দ্রাবক হিসেবে পানির ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারব।
- সমসত্ত্ব এবং অসমসত্ত্ব মিশ্রণ প্রস্তুত এবং উপাদানসমূহ পৃথক করতে পারব।
- লবণাক্ত পানি হতে লবণের স্ফটিক এবং বিশুদ্ধ পানি প্রস্তুত করতে পারব।
- দ্রবণ, কলয়েড এবং সাসপেনসনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- দৈনন্দিন জীবনে দ্রবণ, কলয়েড এবং সাসপেনসনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আমাদের জীবনে দ্রবণ ও সাসপেনসনের প্রয়োগ উপলব্ধি করব।
- পরীক্ষণ কাজের যন্ত্রপাতি এবং উপকরণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারব।

পাঠ ১-২ : মিশ্রণ এবং দ্রবণ

আমরা সকলেই চিনির শরবত ও ঝালমুড়ির সাথে কম বেশি পরিচিত। গ্লাসে বা জগে পানি নিয়ে তাতে কিছু চিনি ঢেলে চামচ দিয়ে নাড়া দিলেই কিন্তু চিনির শরবত হয়ে যায়। আবার ঝালমুড়ি বানাতে হলে কিছু মুড়ি নিয়ে তাতে চানাচুর, কিছু পেঁয়াজ কুচি, মরিচের কুচি, টোমেটো ইত্যাদি ভালোভাবে মিশাতে হয়। চিনির শরবত ও ঝালমুড়ি উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু একের অধিক উপাদান আছে। এরকম একের অধিক বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে যা পাওয়া যায় তাকেই আমরা মিশ্রণ বলি। এই উপাদানগুলো মিশ্রিত থাকলেও, ক্ষুদ্র স্কেইলে তাদের কাজগুলো পৃথক ভাবেই অবস্থান করে।

কাজ : দ্রবণ বা সমসত্ত্ব মিশ্রণকে জানা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি কাচের গ্লাস, চামচ, চিনি ও পানি।

পদ্ধতি : কাচের গ্লাসটি ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নাও। গ্লাসের তিন-চতুর্থাংশে পরিমাণ খাওয়ার পানি নাও ও ১ চামচ চিনি যোগ করে নাড়া দাও। এবার চিনির শরবতটিকে কয়েক ভাগে ভাগ কর। প্রতিটি ভাগ থেকে এক চামচ করে খেয়ে দেখ।

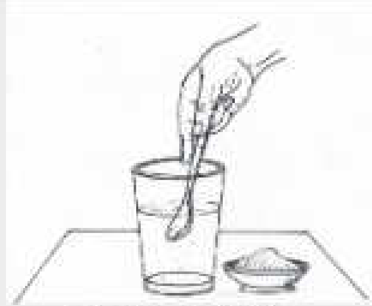

চিত্র ৮.১ : দ্রবণ তৈরি

চিনিকে আলাদা করে দেখতে পাচ্ছ কি? না, পাচ্ছ না। কারণ, চিনি পানিতে দ্রবীভূত হয়ে গেছে। প্রতিটি ভাগ কি একই রকম মিষ্টি? হ্যাঁ, প্রতিটি ভাগ একই রকম মিষ্টি। কারণ হলো চিনির শরবতে চিনির কণাগুলো পানির সবখানে সুষমভাবে বা সমানভাবে বিন্যস্ত আছে।

চিনির শরবতের মতো যে সমস্ত মিশ্রণে উপাদানগুলো সুষমভাবে বণ্টিত থাকে এবং একটি উপাদান থেকে আরেকটিকে সহজে আলাদা করা যায় না তাদেরকেই দ্রবণ বা সমসত্ত্ব মিশ্রণ বলা হয় অর্থাৎ দ্রবণসমূহ এক বিশেষ ধরনের মিশ্রণ। এখন তোমরা পানিতে লবণ, গ্লুকোজ, ফলের রস যোগ করে দেখ প্রাপ্ত মিশ্রণগুলো সমসত্ত্ব মিশ্রণ বা দ্রবণ কি না।

কাজ : অসমসত্ত্ব মিশ্রণকে জানা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি বাটি, মুড়ি, চানাচুর, পেঁয়াজ কুচি, মরিচ কুচি ও টমেটো কুচি।

পদ্ধতি : তোমরা উপরের উপকরণগুলো মিশিয়ে ঝালমুড়ি বানাও। এবার ঝালমুড়িকে কয়েক ভাগে ভাগ কর।

তোমরা কি এই মিশ্রণের উপাদানগুলোকে সহজে আলাদা করতে পারছ? হ্যাঁ, খুব সহজেই একটি উপাদান থেকে অন্যটি আলাদা করা যাচ্ছে। সব ভাগে কি সকল উপকরণ সমানভাবে আছে? না, নেই। কোনো ভাগে মুড়ি হয়তো একটু বেশি, কোনোটাতে বা পেঁয়াজ একটু বেশি আবার কোনোটাতে হয়তো চানাচুর একটু কম বা বেশি। অর্থাৎ উপাদানগুলো সুষমভাবে বণ্টিত নেই। ঝালমুড়ির মতো যে সকল মিশ্রণে উপাদানসমূহ সুষমভাবে বণ্টিত থাকে না এবং একটি থেকে অন্যটি সহজেই আলাদা করা যায়। তাদেরকে অসমসত্ত্ব মিশ্রণ বলা হয়।

এখন তোমরা পানিতে গুঁড়োদুধ, মাটি, আটা, চকের গুঁড়া, ট্যালকম পাউডার যোগ করে দেখ প্রাপ্ত মিশ্রণগুলো অসমসত্ত্ব মিশ্রণ কিনা।

৩৬০১

পাঠ ৩-৪ : দ্রব ও দ্রাবক

তোমরা বলতো চিনির শরবতে চিনি ও পানির মধ্যে কোনটি বেশি এবং কোনটি কম থাকে? নিঃসন্দেহে পানির পরিমাণ বেশি আর চিনির পরিমাণ কম থাকে। এখানে পানি চিনিকে দ্রবীভূত করেছে আর চিনি পানিতে দ্রবীভূত হয়েছে। দ্রবণে সাধারণত যেটি বেশি পরিমাণে থাকে অর্থাৎ দ্রবীভূত করে, তাকে বলে দ্রাবক আর যেটি কম পরিমাণে থাকে অর্থাৎ দ্রবীভূত হয় তাকে বলে দ্রব। তাহলে বলা যায় যে,

দ্রবণ = দ্রব + দ্রাবক

চিনির শরবতে দ্রাবক হলো পানি আর দ্রব হলো চিনি।

জলীয় দ্রবণ

উপরে দেওয়া চিনির শরবতের মতো জলীয় দ্রবণে পানি দ্রাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সকল দ্রবণের ক্ষেত্রেই দ্রাবক যে পানি হবে তা কিন্তু নয়। পানি ছাড়াও বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক বস্তু যেমন এসিটোন, স্পিরিট, ইথারও দ্রাবক হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

দ্রবণের ঘনমাত্রা : পাতলা ও ঘন দ্রবণ

দ্রবণে দ্রব ও দ্রাবকের পরিমাণ কম-বেশি করে ভিন্ন ভিন্ন ঘনমাত্রার দ্রবণ তৈরি করা যায়। ঘনমাত্রার উপর নির্ভর করে দ্রবণকে পাতলা বা ঘন বলা হয়। এবার তাহলে ভিন্ন ভিন্ন ঘনমাত্রার দ্রবণ তৈরি করা যাক।

কাজ : ঘন ও পাতলা দ্রবণ তৈরি ও পার্থক্যকরণ।
প্রয়োজনীয় উপকরণ : দুটি কাচের গ্লাস, মাপচোঙ, চামচ, চিনি ও পানি।
পদ্ধতি : কাচের গ্লাস দুটি ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নাও। প্রতিটি গ্লাসে মাপচোঙ দিয়ে মেপে ১০০ মিলিলিটার করে খাওয়ার পানি নাও। একটি গ্লাসে ১ চামচ ও অপরটিতে ৩ চামচ চিনি নিয়ে ভালো করে নাড়া দাও। এবার উভয় গ্লাস থেকে ১ চামচ করে দ্রবণ বা শরবত নিয়ে খেয়ে এদের মিষ্টতা পরীক্ষা কর।
(বি.দ্র: বেশিরভাগ রাসায়নিক পদার্থই মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর। তাই কোন দ্রবণ বা রাসায়নিক পদার্থ সম্পর্কে পুরোপুরি জানা না থাকলে এটি খেয়ে স্বাদ পরীক্ষা করা কোনো মতেই উচিত নয়)।

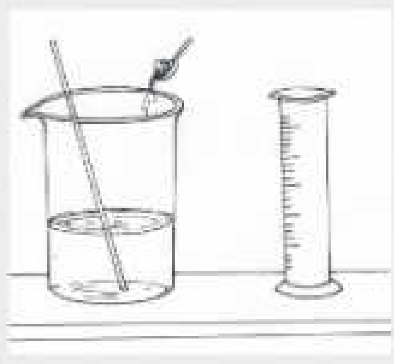
চিত্র ৮.২ : পাতলা ও ঘন দ্রবণ তৈরি

যে গ্লাসে ৩ চামচ চিনি দেওয়া হয়েছে, সেটি বেশি মিষ্টি লাগছে। চিনির শরবতের মতো সমান আয়তনের দ্রবণের ক্ষেত্রে যেটিতে দ্রবের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে, সেটি ঘন দ্রবণ আর যেটিতে তুলনামূলকভাবে দ্রবের পরিমাণ কম থাকে, সেটি হলো পাতলা দ্রবণ।

আবার যদি এমন হয় যে, দুটি শরবতে চিনির পরিমাণ একই রেখে (যেমন: ১ চামচ) ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ পানি নেওয়া হয় তবে যেটিতে পানির পরিমাণ কম থাকবে সেটি বেশি মিষ্টি হবে অর্থাৎ এটিকে আমরা ঘন দ্রবণ বলতে পারি। আর যেটিতে পানির পরিমাণ বেশি থাকবে, সেটি কম মিষ্টি হবে অর্থাৎ সেটিকে আমরা পাতলা দ্রবণ বলতে পারি।

বর্ণহীন জলীয় দ্রবণ দেখে এটি পাতলা না ঘন তা বুঝার উপায় নেই। তবে রঙিন দ্রবণের ক্ষেত্রে ভিন্ন ঘনমাত্রার দ্রবণসমূহ কোনটি পাতলা, কোনটি ঘন তা বোঝা যায়, ঠিক যেমন করে আমরা পাতলা ডাল ও ঘন ডালের পার্থক্য করতে পারি (উল্লেখ্য, ডাল কিন্তু দ্রবণ নয়, একটি অসমসত্ত্ব মিশ্রণ)। এখন আমরা দেখব কীভাবে ঘন ও পাতলা রঙিন দ্রবণের পার্থক্য করা যায়।

কাজ : ভিন্ন ভিন্ন ঘনমাত্রার রঙিন জলীয় দ্রবণ তৈরি করে তা থেকে ঘন ও পাতলা দ্রবণের পার্থক্যকরণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : তিনটি টেস্ট টিউব, টেস্টটিউব ধারক, মাপচোঙ, চামচ, তুঁতে ও পানি।

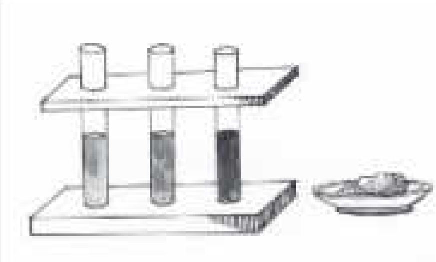

চিত্র ৮.৩ : রঙিন দ্রবণ তৈরি

পদ্ধতি : তিনটি পরিষ্কার টেস্টটিউব নাও। এবার টেস্টটিউবগুলোকে টেস্টটিউব-ধারকে পরপর সাজিয়ে রাখ। প্রতিটি টেস্টটিউবে মাপচোঙ দিয়ে মেপে ৫ মিলিলিটার করে পানি নাও। প্রথম টেস্টটিউবে ১ চামচ, দ্বিতীয় টেস্টটিউবে ২ চামচ ও অপরটিতে ৩ চামচ তুঁতে যোগ করে তুঁতের দানাগুলো পুরোপুরি পানিতে দ্রবীভূত না হওয়া পর্যন্ত ভালো করে ঝাঁকাও। টেস্টটিউবগুলোকে টেস্টটিউবধারকে যার যার জায়গায় আগের মতো সাজিয়ে রাখ।

তোমরা সবগুলো দ্রবণ কি সমান নীল দেখতে পাচ্ছ? না, তা নয়। যেটিতে সবচেয়ে কম পরিমাণ তুঁতে যোগ করেছ, সেটি সবচেয়ে কম নীল দেখাচ্ছে। অর্থাৎ সেটি সবচেয়ে পাতলা দ্রবণ। এভাবে তুঁতের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে দ্রবণের রং আস্তে আস্তে গাঢ় হয়েছে অর্থাৎ দ্রবণের ঘনমাত্রা পাতলা থেকে ঘন হয়েছে। একই ভাবে তোমরা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ও পটাসিয়াম ডাইক্রোমেটের দ্রবণ তৈরি করে পাতলা ও ঘন দ্রবণের পার্থক্য করতে পার।

পাঠ ৫-৭ : সম্পৃক্ত দ্রবণ ও অসম্পৃক্ত দ্রবণ

কাজ : সম্পৃক্ত দ্রবণ ও অসম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি বিকার, মাপচোঙ, নাড়ানি, লবণ ও পানি।

পদ্ধতি : বিকারটি ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নাও। বিকারে মাপচোঙ দিয়ে মেপে ১০০ মিলিলিটার পানি নাও। এবার বিকারের পানিতে অল্প অল্প করে লবণ যোগ করে নাড়তে থাক। এভাবে লবণ যোগ করতেই থাক আর নাড়তেই থাক যতক্ষণ পর্যন্ত যোগ করা লবণ অনেক নাড়লেও আর দ্রবীভূত না হয়।

ক্রমাগত লবণ যোগ করতে থাকলে একপর্যায়ে লবণ যোগ করে অনেক বেশি নাড়লেও লবণ আর দ্রবীভূত হয় না কেন? এর কারণ হলো লবণ যোগ করতে করতে দ্রবণটি সম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত হয়েছে, যখন দ্রাবক (পানি) আর দ্রবকে (লবণকে) দ্রবীভূত করতে পারছে না। তাহলে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের দ্রাবক সর্বোচ্চ যে পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত করতে পারে, সেই পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকলে প্রাপ্ত দ্রবণকে সম্পৃক্ত দ্রবণ বলে। পক্ষান্তরে কোনো দ্রবণে যদি ঐ সর্বোচ্চ পরিমাণের চেয়ে কম পরিমাণের দ্রব দ্রবীভূত থাকে, তবে ঐ দ্রবণ অসম্পৃক্ত দ্রবণ হবে।

উপরের কাজে যোগকৃত লবণ অদ্রবীভূত হওয়ার আগের সকল অবস্থাকেই আমরা অসম্পৃক্ত দ্রবণ বলতে পারি। সম্পৃক্ত দ্রবণে সামান্য পরিমাণ দ্রব যোগ করে অনেক নাড়লেও দ্রব আর দ্রবীভূত হয় না, পক্ষান্তরে অসম্পৃক্ত দ্রবণে দ্রব যোগ করে নাড়া দিলে দ্রবণটি সম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত দ্রব দ্রবীভূত হতেই থাকে।

দ্রবণীয়তা

তোমরা উপরের অনুচ্ছেদে সম্পৃক্ত দ্রবণ কী তা জানলে। কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ১০০ গ্রাম দ্রাবক নিয়ে কোনো দ্রবের সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে যত গ্রাম দ্রবের প্রয়োজন হয়, তাকেই ঐ তাপমাত্রায় ঐ দ্রাবকে ঐ দ্রবের দ্রবণীয়তা বলে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ২৫^{0}সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১০০ গ্রাম পানি সর্বোচ্চ ৩৬ গ্রাম লবণকে দ্রবীভূত করতে পারে। অর্থাৎ ২৫^{0} সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানিতে লবণের দ্রবণীয়তা হলো ৩৬। আবার ২৫^{0} সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানিতে চিনির দ্রবণীয়তা হলো ২১১.৪। অর্থাৎ ২৫^{0} সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১০০ গ্রাম পানি সর্বোচ্চ ২১১.৪ গ্রাম চিনি দ্রবীভূত করতে পারে।

তরল-তরল দ্রবণ

যেসব দ্রবণে দ্রাবক হিসেবে তরল পদার্থ আর দ্রব হিসেবে কঠিন পদার্থ ব্যবহৃত হয়, সেগুলো হলো তরল-কঠিন দ্রবণ। যদি এমন হয় যে, দ্রব ও দ্রাবক উভয়ই তরল পদার্থ তাহলে ঐ দ্রবণকে তরল-তরল দ্রবণ বলা হয়। আমরা এক গ্লাস পানি নিয়ে তাতে যদি এক চামচ লেবুর রস যোগ করে ভালোভাবে নাড়া দিই, তাহলেই একটি তরল-তরল দ্রবণ পাওয়া যাবে। একইভাবে ভিনেগার বা এসিটিক অ্যাসিড ও পানি দিয়েও তরল-তরল দ্রবণ তৈরি করা যায়।

তরল-গ্যাস দ্রবণ

এবার আমরা কিছু দ্রবণ দেখি, যেখানে দ্রাবক হলো তরল পদার্থ আর দ্রব হলো গ্যাসীয় পদার্থ। কোমল পানীয় যেমন: কোকা কোলা, সেভেন আপ আমরা সবাই চিনি। এ সমস্ত কোমল পানীয়ের বোতল খোলার সাথে সাথে হিস্ শব্দ করে বুদবুদ আকারে গ্যাসীয় পদার্থ বের হয়। এ গ্যাসীয় পদার্থটি হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড যা পানীয়ের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় ছিল। অর্থাৎ কোমল পানীয়গুলোকে আমরা তরল-গ্যাস দ্রবণ বলতে পারি।

তোমরা কি জান পানিতে বসবাসকারী প্রাণীসমূহ (যেমন: মাছ) তাদের নিঃশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন কোথা থেকে পায়? তারা তো আমাদের মতো সরাসরি বাতাস থেকে অক্সিজেন নিতে পারে না। পানিতে বসবাসকারী প্রাণীসমূহ অক্সিজেন নেয় পানিতে থাকা দ্রবীভূত অক্সিজেন থেকে। তাহলে নদ-নদী, খাল বিল বা প্রাকৃতিক জলাশয়ের পানি কিন্তু এক ধরনের তরল-গ্যাস দ্রবণ। এই সমস্ত প্রাকৃতিক পানিতে অক্সিজেন ছাড়াও অন্যান্য অনেক কিছুই দ্রবীভূত থাকে।

আবার ইদানীং বহুল সমালোচিত ফরমালিনও (যা আইনবহির্ভূতভাবে বিভিন্ন ফল ও মাছের সংরক্ষণে ব্যবহার করা হচ্ছে) পানিতে ফরমালডিহাইড নামক গ্যাসের দ্রবণ।

দ্রবণে তাপের প্রভাব

কাজ : দ্রবণে তাপের প্রভাব পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি বিকার, নাড়ানি, ত্রিপদি স্ট্যান্ড, তারজালি, একটি নিক্তি, লবণ, পানি ও স্পিরিট ল্যাম্প।

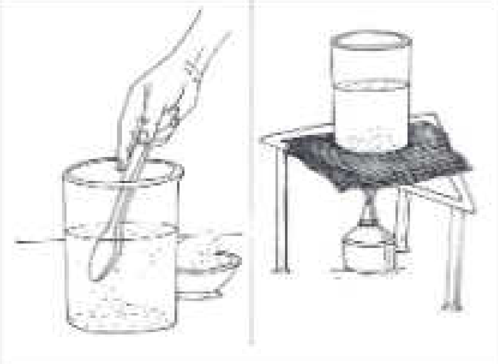

চিত্র ৮.৪ : দ্রবণে তাপের প্রভাব পর্যবেক্ষণ

পদ্ধতি : একটি পরিষ্কার বিকারে ১০০ গ্রাম পানি নিক্তি দিয়ে মেপে নাও। ধীরে ধীরে লবণ যোগ করে নাড়তে থাক। যোগকৃত লবণ যদি আর দ্রবীভূত না হয়, তাহলে লবণ যোগ করা বন্ধ কর। এবার ত্রিপদি স্ট্যান্ডের উপর তারজালি রেখে তার উপর বিকারটিকে বসাও এবং স্পিরিট ল্যাম্প দিয়ে বিকারের তলায় তাপ দিতে থাক ও নাড়তে থাক।

তাপ দেওয়ার পর দ্রবণটিতে কি কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আস্তে আস্তে অদ্রবীভূত লবণের পরিমাণ কমতে শুরু করেছে। এভাবে আরও কিছুক্ষণ তাপ দিতে থাকলে সম্পূর্ণ লবণই দ্রবীভূত হয়ে যাবে। তাহলে এটি বলা যায় যে, তাপমাত্রা বাড়ার কারণে পানিতে লবণের দ্রবণীয়তা বেড়েছে আর সে কারণেই অদ্রবীভূত লবণ তাপ দেয়ার পরে দ্রবীভূত হয়েছে। তবে কিছু কিছু দ্রবণের ক্ষেত্রে (যেমন : পানিতে সিরিয়াম সালফেট ও ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড) তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রবণীয়তা কমে যায়।

পাঠ ৮-৯ : সর্বজনীন দ্রাবক

দ্রবণে দ্রাবক সম্পর্কে তোমরা আগেই জেনেছ। সর্বজনীন দ্রাবক বলতে কী বুঝায়? এটি হবে এমন দ্রাবক, যা সব রকমের পদার্থকে দ্রবীভূত করতে পারবে। এরকম কোন দ্রাবক কি বাস্তবে পাওয়া সম্ভব? সম্ভবত নয়। তবে অনেক রকমের পদার্থকে দ্রবীভূত করতে পারে এমন একমাত্র দ্রাবক হচ্ছে আমাদের অতি পরিচিত পানি। অর্থাৎ পানিই হচ্ছে এখন পর্যন্ত পাওয়া একমাত্র সর্বজনীন দ্রাবক। পানি একদিকে যেমন অসংখ্য অজৈব পদার্থকে (ক্যালসিয়াম কার্বনেট, সিলিকা ইত্যাদি ছাড়া) দ্রবীভূত করতে পারে, তেমনি অন্যদিকে অনেক জৈব যৌগ (যেমন স্পিরিট, এসিটোন, এসিটিক অ্যাসিড) ও গ্যাসীয় পদার্থকেও দ্রবীভূত করতে পারে।

হাতের কাছে পাওয়া যায় এমন নানারকম জৈব ও অজৈব পদার্থ নিয়ে তোমরা পানিতে এদের দ্রবণীয়তা পরীক্ষা করে দেখ।

সমসত্ব মিশ্রণ প্রস্তুত ও পৃথকীকরণ

এই অধ্যায়ের শুরুতে আমরা সমসত্ব মিশ্রণের কিছু উদাহরণ দেখেছি। এখন দেখব কীভাবে এ সকল মিশ্রণ প্রস্তুত ও তাদের উপাদানসমূহকে পৃথক করা যায়।

কাজ : সমসত্ব মিশ্রণ প্রস্তুতকরণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি বিকার, চামচ, নাড়ানি, গ্লুকোজ ও পানি, চারটি ওয়াচ গ্লাস বা কাচের ছোটো পাত্র।

পদ্ধতি : বিকারটি ভালো করে পরিষ্কার করে তাতে ২০০ মিলিলিটার (ভিন্ন পরিমাণও নেওয়া যেতে পারে) পানি মাপচোঙ দিয়ে মেপে নাও। এবার ৪-৫ চামচ গ্লুকোজ বিকারের পানিতে যোগ করে ভালোভাবে নাড়া দাও। গ্লুকোজ ও পানির মিশ্রণটি সমসত্ব হয়েছে কি না সেটি পরীক্ষা করে দেখা যাক। পুরো মিশ্রণটিকে সমান চার ভাগে ভাগ কর ও চারটি ওয়াচ গ্লাসে রাখ। প্রতিটি ওয়াচ গ্লাসের আলাদা আলাদা ভর মেপে নাও ও লিখে রাখ। এবার প্রতিটি ওয়াচ গ্লাস ত্রিপদি স্ট্যান্ডের উপর রাখা তারজালির উপর বসিয়ে স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে তাপ দিয়ে পানি পুরোপুরি শুকিয়ে ফেল। ওয়াচ গ্লাসগুলোকে ঠান্ডা করে প্রতিটির ভর মেপে নাও।প্রতিটি ওয়াচ গ্লাসের পরের ভর ও আগের ভরের পার্থক্য থেকে প্রাপ্ত গ্লুকোজের ভর হিসেব কর।

দ্রবণে গ্লুকোজের কণাগুলোকে আর দেখতে পাচ্ছ কি? না, মোটেও না। কারণ গ্লুকোজের দানাগুলো সম্পূর্ণরূপে পানিতে দ্রবীভূত হয়ে গেছে। এবার পানি শুকানোর পর তোমরা প্রতিটি পাত্রে সমান পরিমাণ গ্লুকোজ পেয়েছ কি? হ্যাঁ, প্রতিটি পাত্রে পাওয়া গ্লুকোজের পরিমাণ সমান। অতএব বলা যায় যে পানি ও গ্লুকোজের মিশ্রণটি সমসত্ব ছিল। তা না হলে কোনো ভাগে গ্লুকোজ বেশি আবার কোনোটাতে কম পাওয়া যেত।

যে প্রক্রিয়ায় তাপ দিয়ে পানি শুকিয়ে ফেললে তার নাম জান কি? এটি হলো বাষ্পীভবন। অর্থাৎ তাপ দিয়ে তরল পদার্থকে বাষ্পে পরিণত করার প্রক্রিয়াকেই বাষ্পীভবন বলে। তোমাদের কি মনে হয় বাষ্পীভবন ছাড়া আর কোনো সহজ পদ্ধতিতে গ্লুকোজকে পানি থেকে আলাদা করা যাবে? না, এটিই একমাত্র উপায়, যা বেশ কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ।

অসমসত্ব মিশ্রণ প্রস্তুত ও পৃথকীকরণ

কাজ : অপরিষ্কার লবণ ও পানির অসমসত্ব মিশ্রণ প্রস্তুতকরণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি বিকার বা কাচের গ্লাস, চামচ, নাড়ানি, অপরিষ্কার লবণ ও পানি।

পদ্ধতি : বিকার বা কাচের গ্লাসটি ভালো করে পরিষ্কার করে তাতে ২০০ মিলিলিটার (ভিন্ন পরিমাণও নেওয়া যেতে পারে) পানি নাও। এবার ১-২ চামচ অপরিষ্কার লবণ বিকারের পানিতে যোগ করে ভালোভাবে নাড়া দাও। মিশ্রণটিকে কিছুক্ষণ রেখে দাও।

কী দেখতে পাচ্ছ? লবণের কণাগুলো পানিতে দ্রবীভূত হয়ে গেছে আর ময়লার ভারি কণাগুলো বিকারের তলায় জমতে শুরু করেছে। অন্যদিকে ময়লার হালকা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাগুলো পানিতে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। ময়লার কণাগুলো পানিতে সুষমভাবে বিন্যস্ত হচ্ছে না অর্থাৎ এটি নিশ্চিত যে মিশ্রণটি লবণ-পানি- ময়লার একটি অসমসত্ব মিশ্রণ।

ময়লার কণাগুলো যে সুষমভাবে বিন্যস্ত নয় সেটি কীভাবে পরীক্ষা করে প্রমাণ করা যায়? আগের কাজের মতো সমান কয়েক ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগ থেকে পানি পুরোপুরি বাষ্পায়িত করে প্রতি ভাগে অবশিষ্ট বস্তুর ভর পরিমাপ করলেই দেখা যাবে একেক ভাগে একেক পরিমাণ বস্তু রয়েছে।

বলতো এই মিশ্রণ থেকে আমরা কি কোনোভাবে অদ্রবণীয় ময়লার কণা দূর করতে পারি? ছাঁকুনি দিয়ে চা পাতা যেভাবে লিকার থেকে আলাদা করা হয়, ঠিক একইভাবে আমরা অদ্রবণীয় বস্তুর কণাগুলোকেও মিশ্রণ থেকে আলাদা করতে পারি। এবার দেখে নিই কীভাবে ফিল্টার কাগজ দিয়ে ময়লার কণাগুলো লবণ পানি থেকে আলাদা করে পরিষ্কার লবণ পাওয়া যায়।

কাজ : অপরিষ্কার লবণ হতে পরিষ্কার লবণ প্রস্তুতকরণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : অপরিষ্কার লবণের অসমসত্ত্ব মিশ্রণ, নাড়ানি, ত্রিপদি স্ট্যান্ড, তারজালি, ফানেল, ফিল্টার কাগজ, রিংযুক্ত স্ট্যান্ড ও পানি।

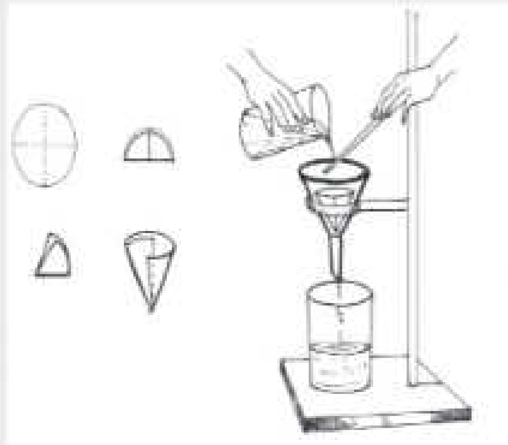

চিত্র ৮.৫ : পরিস্রাবণ

পদ্ধতি : একটি ফিল্টার কাগজ নিয়ে প্রথমে সমান চার ভাঁজ কর। এরপর চিত্রের মতো করে একদিকে তিন ভাঁজ ও অন্যদিকে এক ভাঁজ রেখে ফানেলের ভিতরে বসিয়ে দাও। ফিল্টার কাগজটিকে পরিষ্কার পানি দিয়ে অল্প করে ভিজিয়ে নাও যাতে এটি সরে না যায়। ফানেলটি চিত্র অনুযায়ী স্ট্যান্ডের সাথে যুক্ত রিংয়ের উপর বসাও। ফানেলের নিচে একটি বিকার রাখ। অতঃপর আগের কাজের অপরিষ্কার লবণের অসমসত্ত্ব মিশ্রণটি ফিল্টার পেপারের উপর আস্তে আস্তে ঢেলে দাও। যতক্ষণ পর্যন্ত ফানেল থেকে পরিষ্কার পানি পড়া শেষ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা কর। এবার পরিষ্কার লবণ-পানির বিকারটিকে ত্রিপদি স্ট্যান্ডের উপর রাখা তারজালির উপর বসিয়ে স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে তাপ দিয়ে সম্পূর্ণ পানি শুকিয়ে ফেল।

মিশ্রণটি ফানেলে ঢালার পর কী ঘটল? মাটির কণামুক্ত পরিষ্কার লবণ-পানি ধীরে ধীরে ফিল্টার কাগজের মধ্য দিয়ে নিচে রাখা বিকারে জমা হলো আর মাটির কণাগুলো ফিল্টার কাগজের উপরে আটকে রইল। মাটির কণাগুলোকে ফিল্টার কাগজ দিয়ে মাটি ও পানির মিশ্রণ থেকে আলাদা করার এই প্রক্রিয়ার নাম হলো পরিস্রাবণ অর্থাৎ পরিস্রাবণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তরল ও কঠিন পদার্থের মিশ্রণ থেকে কঠিন পদার্থকে আলাদা করা যায়।

বিকারের পানি পুরোপুরি শুকিয়ে যাওয়ার পর তোমরা কী পেলে? সাদা ধবধবে ও পরিষ্কার লবণের স্তর পেয়েছ। কারণ শুরুতে নেওয়া ময়লাযুক্ত লবণ থেকে সকল ময়লা ফিল্টার কাগজ দিয়ে পরিস্রাবণের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে দূর করা হয়েছে। মনে রেখো ময়লার মধ্যে যদি পানিতে দ্রবণীয় কোন অংশ থাকে তাহলে উপরোক্ত পদ্ধতিতে সেই অংশকে লবণ থেকে আলাদা করা যাবে না।

পাঠ ১০-১২ : লবণাক্ত পানি হতে লবণের স্ফটিক প্রস্তুতকরণ

আমরা পূর্বের অনুচ্ছেদে পরিস্রাবণ ও বাষ্পীভবনের মাধ্যমে পরিষ্কার লবণ প্রস্তুত প্রণালি দেখেছি। ঐ প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত লবণ কিন্তু দানাদার ছিল না, ছিল লবণের স্তর যা মূলত অদানাদার লবণ। এখন আমরা লবণাক্ত পানি হতে দানাদার লবণ অর্থাৎ লবণের স্ফটিক প্রস্তুতকরণের কৌশল দেখব।

কাজ : লবণাক্ত পানি হতে লবণের স্ফটিক প্রস্তুতকরণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি বিকার, চামচ, নাড়ানি, ত্রিপদি স্ট্যান্ড, তারজালি, ফানেল, ফিল্টার কাগজ, রিং যুক্ত স্ট্যান্ড, কিছু অপরিষ্কার লবণ ও পানি।

পদ্ধতি : একটি বিকারে ২০০ মিলিলিটার পানি ও ৫০ গ্রাম অপরিষ্কার লবণের একটি মিশ্রণ তৈরি করে পরিস্রাবণের মাধ্যমে পরিষ্কার লবণ-পানির দ্রবণ অর্থাৎ লবণাক্ত পানি বানাও। এবার লবণাক্ত পানি একটি বিকারে নিয়ে বিকারকে ত্রিপদি স্ট্যান্ডের উপর রাখা তারজালির উপর বসিয়ে তাপ দিতে থাক। তাপ দিতে দিতে বিকারে লবণাক্ত পানির আয়তন প্রায় অর্ধেকে পরিণত হলে তাপ দেওয়া বন্ধ কর। অতঃপর বিকারে একটি ঢাকনা দিয়ে ঠান্ডা করার জন্য রেখে দাও।

বিকারটি ঠান্ডা হওয়ার পরে তোমরা কি কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ? বিকারের তলায় বা গায়ে লবণের দানা জমা হতে শুরু করেছে। এই দানাযুক্ত লবণই হলো লবণের স্ফটিক। লবণের স্ফটিক তৈরির এই পদ্ধতিকে বলা হয় স্ফটিকীকরণ। অনেক সময় লবণাক্ত পানি হতে স্ফটিক পাওয়ার জন্য এতে দুই একটি লবণের দানা বাইরে থেকে যোগ করতে হয়। এতে যোগকৃত লবণ দানাকে ঘিরে খুব দ্রুত দানাদার লবণ জমা হতে থাকে।

লবণাক্ত পানি হতে বিশুদ্ধ পানি প্রস্তুতকরণ

লবণাক্ত পানি অথবা যেকোনো মিশ্রণ হতে বিশুদ্ধ পানি প্রস্তুত করার একটি সহজ উপায় হচ্ছে পাতন পদ্ধতি, যার জন্য প্রয়োজন একটি পাতন যন্ত্র। চিত্র-৮.৬ এ একটি পাতন যন্ত্র দেখানো হলো :

পাতন যন্ত্রটির বাম পাশে রয়েছে পরীক্ষাধীন লবণাক্ত পানি নেওয়ার জন্য একটি গোলতলী ফ্লাস্ক (১)। এর সাথে সংযুক্ত আছে একটি শীতক (condenser) (২) যার ভিতরে একটি সরু কাচের নল (৩) বসানো আছে এবং ঐ নলের চারপাশে ঠান্ডা পানির প্রবাহের জন্য একটি প্রবেশ নল (৪) ও একটি নির্গমন নল

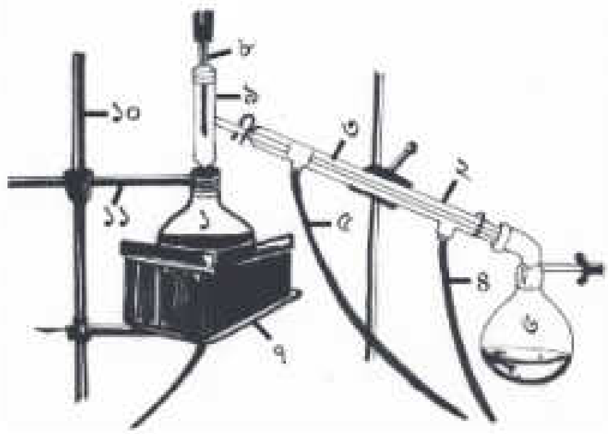

চিত্র ৮.৬ : পাতন যন্ত্র

(৫) আছে। আর ডান পাশে বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করার জন্য আছে আরেকটি গ্রাহক ফ্লাস্ক (৬)। এছাড়া পানিতে তাপ দেওয়ার জন্য একটি বৈদ্যুতিক হিটার (৭) আর তাপমাত্রা মাপার জন্য বাম পাশের ফ্লাস্কের উপরে থার্মোমিটার (৮) বসানোর জন্য ও শীতকের সাথে যুক্ত করার জন্য একটি কাচের এডাপ্টার (৯) রয়েছে। এছাড়া ফ্লাস্ক দুটি ও শীতককে সঠিকভাবে ধরে রাখার জন্য স্ট্যান্ড (১০) ও ক্ল্যাম্প (১১) রয়েছে। এবার দেখা যাক পাতন যন্ত্রটি কীভাবে কাজ করে।

কাজ : লবণাক্ত পানি হতে বিশুদ্ধ পানি প্রস্তুতকরণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি পাতন যন্ত্র, ৫০০ মিলিলিটার লবণাক্ত পানি।

পদ্ধতি : চিত্র ৮.৬ এর মতো করে পাতন যন্ত্রটি সাজিয়ে গোলতলী ফ্লাস্ক (১) এ লবণাক্ত পানি নাও। পাতন যন্ত্রটির পানি প্রবেশের নলটি (৪) একটি পানির ট্যাপের সাথে সংযুক্ত করে পানির প্রবাহ চালু কর। পানি নির্গমণের নলের সাথে একটি প্লাস্টিকের পাইপ যুক্ত করে বেসিনে রাখ। এবার বৈদ্যুতিক হিটার দিয়ে ফ্লাস্কে তাপ দিতে থাক। বৈদ্যুতিক হিটারের ব্যবস্থা না থাকলে স্পিরিট ল্যাম্প বা অন্য যেকোনো উপায়ে তাপ দেওয়া যেতে পারে। পাতন যন্ত্রের থার্মোমিটারে তাপমাত্রা খেয়াল কর। বাষ্পীভূত পানি শীতকের সরু নলের মধ্য দিয়ে গ্রাহক ফ্লাস্কে (৬) জমা হতে শুরু করলে অপেক্ষা করতে থাক। গোলতলী ফ্লাস্ক (১) এ পানির পরিমাণ তিন-চতুর্থাংশে কমে গেলে তাপ দেয়া বন্ধ কর।

তাপ দেয়ার পর কী ঘটে? থার্মোমিটারের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পানি ফুটতে শুরু করে ও বাষ্পে পরিণত হয়। উক্ত বাষ্প শীতকে প্রবেশ করলে ঠাণ্ডা হয়ে তা তরলে পরিণত হয়। বাষ্প তরলে পরিণত হওয়ার এ প্রক্রিয়াকে ঘনীভবন বলে। ঘনীভূত পানি ফোঁটায় ফোঁটায় গ্রাহক ফ্লাস্কে জমা হতে থাকে। এই জমা হওয়া পানিই বিশুদ্ধ পানি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পানির কোনো মিশ্রণ থেকে বিশুদ্ধ পানি তৈরি করতে আমাদের দুটি প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে হয়। এদের একটি হলো বাষ্পীভবন আর অন্যটি ঘনীভবন। তোমরা কি এখন সমুদ্রের পানি থেকে বিশুদ্ধ পানি তৈরি করতে পারবে?

সাসপেনসন ও কলয়েড

কাজ : সাসপেনসন তৈরি।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১টি কাচের গ্লাস, চামচ, কাদামাটি ও পানি।

পদ্ধতি : কাচের গ্লাসের তিন-চতুর্থাংশে ভরে পানি নাও। ১ চামচ পরিমাণ কাদামাটি গ্লাসে যোগ করে খুব ভালোভাবে নাড়া দাও। মিশ্রণটিকে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দাও।

কী দেখতে পাচ্ছ? প্রথমে পুরো মিশ্রণটি ঘোলা দেখাচ্ছে। রেখে দেওয়ার পর তুলনামূলকভাবে ভারি মাটির কণাগুলো গ্লাসের তলায় জমা হচ্ছে, তবে কিছু কিছু মাটির কণা যেগুলো খুব হাল্কা ও ছোটো ছোটো তারা পানিতে ভাসমান অবস্থায়ই থাকছে আর মিশ্রণটি অল্প ঘোলাটে দেখাচ্ছে। আরও কিছু সময় মিশ্রণটি কোনো নাড়াচড়া না করলে, মিশ্রণটিতে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ কি? হ্যাঁ, মাটির আরও কিছু ক্ষুদ্র কণা তলায় জমা পড়ছে তবে পানি পুরোপুরি স্বচ্ছ ও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, কারণ কিছু কিছু ক্ষুদ্র কণা তখনও পানিতে ভাসমান অবস্থায় থেকেই যাচ্ছে। মাটি ও পানির এ জাতীয় মিশ্রণ যা রেখে দিলে উপাদানসমূহ আংশিক আলাদা হয়ে যায় তাকেই সাসপেনসন বলে। একইভাবে, চক মিহি করে গুঁড়া করে বা আটা পানিতে যোগ করে ভালোভাবে নাড়া দিলে যে মিশ্রণ পাওয়া যায় সেগুলোও সাসপেনসন। আমরা বাড়িতে যে সকল এন্টিবায়োটিক বা এন্টাসিডের সাসপেনসন ব্যবহার করি, সেগুলোও রেখে দিলে আংশিক আলাদা হয়ে যায় ও ঔষধের বোতলের নিচে তলানি পড়ে যায়। তাই ঔষধ সেবনের পূর্বে বোতল ভালো করে ঝাঁকিয়ে নিতে হয়।

এবার তোমরা দ্রবণ, সাসপেনসন ও অসমসত্ত্ব মিশ্রণের মধ্যে পার্থক্য করতে পারছ কি? অসমসত্ত্ব মিশ্রণে উপকরণগুলো খুব সহজেই চিহ্নিত করা যায় ও আলাদা করা যায়। সাসপেনসনের ক্ষেত্রে উপকরণগুলো চিহ্নিত করা গেলেও সহজে আলাদা করা যায় না আর দ্রবণের ক্ষেত্রে উপকরণগুলো চিহ্নিতও করা যায় না, সহজে আলাদাও করা যায় না।

এবার আসা যাক কলয়েডের কথায়। সাসপেনসনের বেলায় আমরা দেখলাম, একটি উপকরণের ছোটো ছোটো কণাগুলো ভাসমান অবস্থায় থাকে কিন্তু অনেকক্ষণ রেখে দিলে তা তলানি হিসেবে জমা পড়ে। কিন্তু এমন কি হতে পারে না যে, কণাগুলো এতই ক্ষুদ্র ও হাল্কা যে তারা কখনই পাত্রের তলায় জমা হতে পারবে না, সব সময়ই ভাসমান বা সাসপেন্ডেড অবস্থায়ই থাকবে? হ্যাঁ অবশ্যই পারে, আর সে ধরনের মিশ্রণ যেখানে অতি ক্ষুদ্র কোনো বস্তুকণা অপর বস্তুকণার মাঝে সাসপেন্ডেড বা ভাসমান অবস্থায় থাকে এবং রেখে দিলে কখনই কোনো তলানি পড়ে না তাকে বলা হয় কলয়েড।

কলয়েডে বিদ্যমান উপাদানগুলো একটি আরেকটিতে দ্রবীভূত হয় না, কিন্তু ছড়িয়ে থাকে। কলয়েডে যেটি প্রধান উপদান বা পরিমাণে বেশি থাকে, তাকে বলে অবিচ্ছিন্ন ফেজ বা দশা আর যেটি কম পরিমাণে থাকে বা ছড়িয়ে থাকে, তাকে বলে ডিসপারসড ফেজ বা দশা। যেমন: দুধ হচ্ছে একটি কলয়েড, যা পানি ও চর্বি দিয়ে তৈরি। চর্বির ক্ষুদ্র কণাগুলো পানিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, যা খালি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ঠিকই দেখা যায়। চিত্র-৮.৭ এ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পাওয়া দুধের একটি ছবি দেখানো হলো।

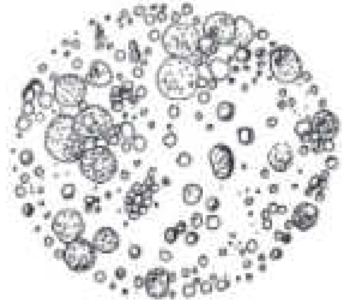

চিত্র ৮.৭: কলয়েড

দুধের মতো কুয়াশা হচ্ছে আরেকটি কলয়েড, যেখানে পানির ছোটো ছোটো কণাগুলো বাতাসে ছড়িয়ে থাকে। আবার আমাদের অতি পরিচিত অ্যারোসলও কিন্তু এক ধরনের কলয়েড, যেখানে তরল কীটনাশকের কণাগুলো বাতাসে ভেসে থাকে। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে কলয়েড তৈরির জন্য ভাসমান ক্ষুদ্র কণাগুলোর আকার কত ছোট হতে হবে? সাধারণত কলয়েডে বিদ্যমান ভাসমান কণাগুলোর আকার ১-১০০০ ন্যানোমিটার হয়ে থাকে। আর যদি কণাগুলোর আকার ১ মাইক্রোমিটার বা তার বেশি হয়, তখন এটি আর কলয়েড না হয়ে সাসপেনসনে পরিণত হয়।

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- একের অধিক বিশুদ্ধ পদার্থ মিশালে মিশ্রণ তৈরি হয়।
- দ্রবণসমূহ এক বিশেষ ধরনের মিশ্রণ, যেখানে দ্রব দ্রাবকে সুষমভাবে বিন্যস্ত থাকে ও একটিকে অপরটি থেকে খুব সহজে আলাদা করা যায় না।
- অসমসত্ত্ব মিশ্রণে উপাদানগুলি মিশ্রণের সর্বত্র সুষমভাবে বিন্যস্ত থাকে না এবং একটিকে অপরটি থেকে খুব সহজে আলাদা করা যায়।
- দ্রবণে যে উপাদানটি বেশি পরিমাণে থাকে ও দ্রবীভূত করে সেটি হলো দ্রাবক আর যে উপাদানটি কম পরিমাণে থাকে ও দ্রবীভূত হয় সেটি হলো দ্রব।
- সমপরিমাণ দুটি দ্রবণের মধ্যে যেটিতে দ্রবের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে তার ঘনমাত্রা বেশি হয়। সম্পৃক্ত দ্রবণে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের দ্রাবক সর্বোচ্চ যে পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত করতে পারে, সেই পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকে।
- ১০০ গ্রাম দ্রাবকে কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি দ্রবের সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে যতটুকু দ্রবের প্রয়োজন হয়, তাকেই ঐ তাপমাত্রায় ঐ দ্রাবকে ঐ দ্রবের দ্রবণীয়তা বলে।

- তাপ দিলে কোনো কোনো দ্রবের দ্রবণীয়তা বাড়ে আবার কোনো কোনো দ্রবের দ্রবণীয়তা কমে।
- পরিস্রাবণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে তরল ও কঠিন পদার্থের অসমসত্ত্ব মিশ্রণ থেকে উপাদানসমূহকে আলাদা করা যায়।
- তাপের প্রভাবে তরল পদার্থকে বাষ্পে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে বাষ্পীভবন বলা হয়।
- ঘনীভবন হলো বাষ্পকে শীতল করে তরলে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া।
- সাসপেনসন হলো এমন একটি মিশ্রণ, যা রেখে দিলে উপাদানসমূহ আংশিকভাবে আলাদা হয়ে যায়।
- কলয়েড এক ধরনের মিশ্রণ, যেখানে একটি উপাদানের ক্ষুদ্র কণা অন্য উপাদানে ছড়িয়ে থাকে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর।

১. পানি ও স্পিরিটের দ্রবণ একটি ....দ্রবণ।

২. ....একটি সার্বজনীন দ্রাবক।

৩. দ্রবণে দ্রবের পরিমাণ .... থাকে আর দ্রাবকের পরিমাণ .... থাকে।

৪. দুধ ও কুয়াশা হলো................

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি তরল–গ্যাস দ্রবণ?

ক. লেবুর শরবত | খ. কোমল পানীয়
গ. ভিনেগার | ঘ. স্যালাইন

২. কোনটি কলয়েড?

ক. চক ও পানি | খ. আটা ও পানি
গ. চর্বি ও পানি | ঘ. মাটি ও পানি

উদ্দীপকের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

কক্ষ তাপমাত্রায় সোডিয়াম কার্বনেটের দ্রবণীয়তা ২১.৬।

৩. **কক্ষ তাপমাত্রায়** ২০০ গ্রাম পানি নিয়ে সোডিয়াম কার্বনেটের সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করতে কতটুকু সোডিয়াম কার্বনেট লাগবে?

ক. ২.১৬ গ্রাম | খ. ৪.৩২ গ্রাম
গ. ২১.৬ গ্রাম | ঘ. ৪৩.২ গ্রাম

৪. সোডিয়াম কার্বনেটের পরিমাণ যদি ১০ গ্রাম কম হয় তবে দ্রবণটি-

ক. সম্পৃক্ত দ্রবণ | খ. অসম্পৃক্ত দ্রবণ
গ. সাসপেনসন | ঘ. কলয়েড

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. দ্রবণ কাকে বলে? দ্রবণ ও মিশ্রণের মূল পার্থক্য কী?

২. দ্রবণীয়তা বলতে কী বুঝায়?

৩. তরল-গ্যাস দ্রবণ বলতে কী বুঝ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

৪. সাসপেনসন কাকে বলে?

৫. কলয়েড ও সাসপেনসন কী একই? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. কক্সবাজারে সমুদ্রের পানিতে নেমে প্রিয়ন্তি ও রূপন্তি খুব আনন্দ করছিল। হঠাৎ সমুদ্রের পানি রূপন্তির মুখে যাওয়ায় সে লক্ষ্য করল সমুদ্রের পানি নোনতা। এর কারণ প্রিয়ন্তিকে জিজ্ঞেস করায় সে রূপন্তিকে বলল, এটি পানি ও লবণের দ্রবণ। এ থেকেই লবণ তৈরি করা হয়। রূপন্তি অবাক হয়ে ব্যাপারটা জানতে চাইল। বাড়িতে এসে প্রিয়ন্তি রূপন্তিকে লবণ তৈরি করে দেখাল।

ক. মিশ্রণ কী?

খ. পানিকে সার্বজনীন দ্রাবক বলা হয় কেন?

গ. রূপন্তিকে দেখানো প্রিয়ন্তির উপাদানটির প্রস্তুত প্রণালি রেখা চিত্রের মাধ্যমে দেখাও।

ঘ. দ্রবণটি থেকে দুটি উপাদানই আবার ফিরে পাওয়া সম্ভব বিশ্লেষণ কর।

২. ঔষধ খাওয়ানোর সময় আদিল প্রতিবারই লক্ষ্য করে মা ঔষধের বোতল ঝাঁকিয়ে নেন। কিন্তু দুধ খাওয়ানোর সময় ঝাঁকান না।

ক. অসমসত্ত্ব মিশ্রণ কী?

খ. দ্রবণীয়তা বলতে কী বুঝায়?

গ. ঔষধের বোতল আদিলের মা কেন ঝাঁকিয়ে নেন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মিশ্রণ দুটি কি একই? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

নবম অধ্যায়

আলোর ঘটনা

আলো ছাড়া আমরা দেখতে পাই না। আলো না থাকলে গাছপালা জন্মাত না। প্রাণীরা খাবার পেত না। আমাদের খাদ্য ও বস্ত্র যেসব জীব থেকে আসে তা জন্মাত না। আলো ছাড়া তাই জীবন কল্পনা করা কঠিন। আলো এক প্রকার শক্তি। আলোর কাজ করার সামর্থ্য আছে, অর্থাৎ আলোর আছে শক্তি। কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলা হয়। আলো অত্যন্ত দ্রুত চলে, সেকেন্ডে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার। এই দ্রুতিতে তুমি চলতে পারলে এক সেকেন্ডে তুমি পৃথিবীর চারদিকে সাত বারেরও বেশি ঘুরে আসতে পারতে। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, কোনো কিছুই আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলতে পারে না। আমরা যেখান থেকেই আলো পাই না কেন, সকল আলোর উৎস হলো সূর্য।

এই অধ্যায় শেষে আমরা

- আলোর সঞ্চালন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বস্তু দৃষ্টিগোচর হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আলোর প্রতিফলন ও শোষণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মসৃণ ও অমসৃণ তলে আলোর প্রতিফলন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দর্পণে প্রতিবিম্ব সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আমাদের চারপাশে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনায় আলোর প্রতিফলনের ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১-২ : আলো কীভাবে চলে

আমরা জানি যে, আলো অত্যন্ত দ্রুত চলে, সেকেন্ডে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার। কিন্তু এ আলো কীভাবে চলে? সোজা পথে, না বাঁকা পথে? এসো আমরা কিছু কাজ করি। এগুলো থেকে বুঝতে পারব আলো কীভাবে চলে?

কাজ : তোমার নোটবুকের তিনটি সমান কভার নাও। এদের একটার উপর আরেকটা রাখ, যাতে এদের সকল প্রান্ত একসাথে মিলে থাকে। এখন একটি পেরেক বা মোটা সুঁই দিয়ে তিনটিকে একসাথে ছিদ্র কর। এবার বোর্ড তিনটি টেবিলের উপর এমনভাবে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে দাও যেন তিনটি বোর্ডের ছিদ্র একই সরলরেখায় থাকে। এখন একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে বোর্ডগুলোর পেছনে এমনভাবে টেবিলের উপর বসাও যাতে মোমবাতির পুরো শিখাটির উচ্চতা বোর্ডের ছিদ্রগুলোর উচ্চতার সমান হয় (চিত্র ৯.১)। বোর্ডগুলোকে এমনভাবে সাজাও যেন বোর্ডের ছিদ্র ও মোমবাতির শিখা একই সরলরেখায় থাকে। এবার বোর্ডের বিপরীত দিক থেকে মোমবাতির দিকে তাকাও, মোমবাতির শিখাটি দেখতে পাবে। একটি বোর্ডকে এক পাশে সামান্য সরিয়ে নাও, যাতে তিনটি ছিদ্র একই রেখায় না থাকে। মোমবাতির শিখাটি দেখতে পাচ্ছ কি? না, এখন আর শিখাটি দেখা যাচ্ছে না। আলো বাঁকা পথে তোমার চোখে প্রবেশ করতে পারেনি। এ থেকে তুমি কী সিদ্ধান্ত নেবে? আলো বাঁকা পথে চলে না, সরলরেখায় চলে। আলোর এই সরলরৈখিক পথকে আলোকরশ্মি বলে।

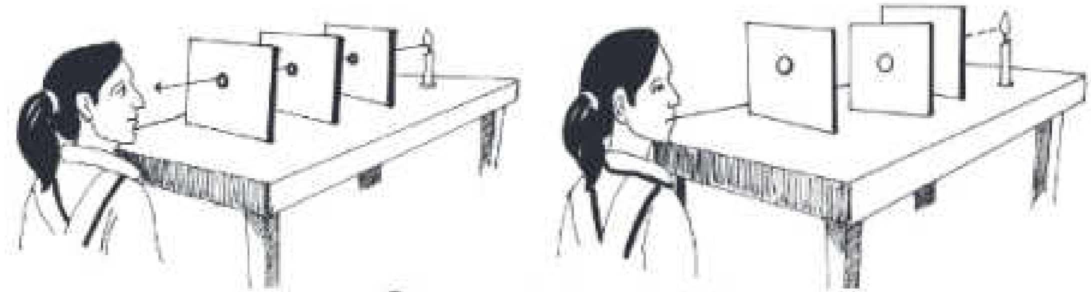

চিত্র ৯.১ : আলো সরলরেখায় চলে

পাঠ-৩ : আমরা কীভাবে দেখি

রাতের বেলা অন্ধকার ঘরে আমরা কোনো কিছু দেখতে পাই না কেন?

কোনো বস্তুকে আমরা কীভাবে দেখি? আমরা তখনই কোনো বস্তুকে দেখি, যখন ঐ বস্তু থেকে আলো এসে আমাদের চোখে পড়ে। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর (চিত্র ৯.২)। এখানে রয়েছে একটি জ্বলন্ত বাল্ব ও একটি ক্রিকেট বল। বাল্ব থেকে আলো এসে আমাদের চোখে পড়ছে বলে আমরা বাল্বটি দেখতে পাচ্ছি। বাল্ব থেকে আলো গিয়ে ক্রিকেট বলে পড়ছে, এবং বল থেকে সেই আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়ছে, তাই বলটি আমরা দেখছি। আলোর কোন উৎস থেকে সরাসরি আগত অথবা কোনো বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মিসমূহ যে দিক বরাবর আমাদের চোখে প্রবেশ করে, আমাদের চোখ সে দিকেই ঐ আলোর উৎস বা বস্তুকে দেখতে পায়। সেই আলোকরশ্মি যদি চলার সময়ে বেঁকে যায় বা দিক পরিবর্তন করে, এবং তারপর চোখে প্রবেশ করে, তাহলেও এ কথা সত্যি। অর্থাৎ, এ ক্ষেত্রে আলোর ঐ উৎস বা ঐ বস্তু যেখানে অবস্থিত সেখানে তাকে না দেখে চোখ তাকে দেখবে অন্য এক স্থানে, অন্য এক দিকে। আরও কিছুটা পর আমরা কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা ব্যাখ্যা করব। কোনো কোনো বস্তুর নিজের আলো আছে, যেমন, সূর্য, তারা, জোনাকি পোকা, মোমবাতি, বৈদ্যুতিক বাল্ব ইত্যাদি। এদের বলা হয় উজ্জ্বল বস্তু। কোনো কোনো বস্তুর নিজের কোনো আলো নেই, অন্য বস্তুর আলো প্রতিফলিত করে, এদের বলা হয় অনুজ্জ্বল বস্তু। কোনো কোনো বস্তুতে আলো পড়লে তা প্রতিফলিত হয় না, বস্তুটি সমস্ত

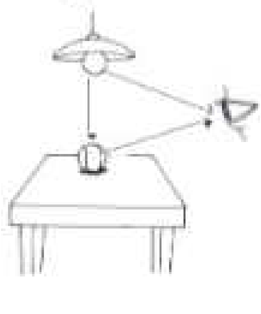

চিত্র ৯.২ : আমরা যেভাবে দেখি

আলো শোষণ করে নেয়। এসব বস্তু তাই দেখতে কালো দেখায়। এটা জানো কি? চোখ থেকে আলো গিয়ে বস্তুতে পড়ে না, বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়ে বলেই আমরা বস্তুটি দেখতে পাই।

কাজ : আলো দিয়ে কীভাবে দেখি তা জানা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি কাঠের বাক্স বা জুতার বাক্স, একটি নুড়ি পাথর ও কিছু কালো কাগজ।

পদ্ধতি : ঢাকনাসহ একটি জুতার বাক্স নাও। কালো কাগজ দিয়ে বাক্সের ভিতরটা মুড়ে দাও। ঢাকনার উপর একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র কর এবং একপাশের দেয়ালে একটি বড়ো ছিদ্র কর। নুড়ি পাথরটি ঢাকনার ছিদ্রটির ঠিক নিচে রাখ। ঢাকনাটি বন্ধ করে দাও। বাক্সের পাশের দেয়ালের বড় ছিদ্রটি একটি মোটা কালো কাগজ বা টেপ দিয়ে ঢেকে দাও। ঢাকনার ছিদ্র দিয়ে নুড়িটি দেখার চেষ্টা কর। নুড়িটি দেখতে পাচ্ছ কি? না, দেখা যাচ্ছে না। বাক্সের পাশের দেয়ালের বড় ছিদ্রটির কালো কাগজ বা টেপ সরিয়ে নাও। এই ছিদ্র দিয়ে বাক্সে আলো প্রবেশ করবে। ঢাকনার ছিদ্র দিয়ে আবার নুড়িটি দেখার চেষ্টা কর। নুড়িটি দেখা যাচ্ছে কি? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে।

চিত্র ৯.৩ : আলো দিয়ে কীভাবে দেখি

এ থেকে আমরা কী সিদ্ধান্তে আসতে পারি? আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, আলো ছাড়া কোনো কিছু দেখা যায় না। কোনো বস্তুতে আলো পড়ে তা আমাদের চোখে প্রবেশ করলেই আমরা বস্তুটি দেখতে পাই। অন্ধ লোকেরা দেখতে পান না কেন? কোনো বস্তু থেকে আলো এসে যখন স্বাভাবিক চোখে পড়ে, তখনই বস্তুটি দেখা যায়। অন্ধদের চোখ স্বাভাবিক নয়, তাই বস্তু থেকে আসা আলো গ্রহণ করতে পারে না। ফলে তাঁরা দেখতে পান না।

এই পৃষ্ঠায় ছাপা লেখাগুলো আমরা কী করে দেখতে পাই? কালো লেখা বা কোনো কালো বস্তু কোনো উৎস থেকে আসা আলো বেশি শোষণ করে এবং কম প্রতিফলিত করে। কিন্তু সাদা পৃষ্ঠা থেকে আলো প্রতিফলিত হয় বেশি। সেই আলো আমাদের চোখ গ্রহণ করে। ফলে কাগজে ছাপা কালো অক্ষরগুলো আমরা দেখতে পাই। অনুজ্জ্বল রং উজ্জ্বল রঙের চেয়ে বেশি আলো শোষণ করে। যে বস্তু সকল আলো শোষণ করে তা কালো দেখায়।

পাঠ ৪-৫ : আলোর প্রতিফলন ও শোষণ

কোনো বস্তুতে আলো পড়ে যদি তা বাধা পেয়ে ফিরে আসে, তা হলে সেই ঘটনাকে প্রতিফলন বলে। কোনো বস্তুতে আলো পড়ে তা যদি ফিরে না আসে তা হলে বলি যে আলোর শোষণ হয়েছে।

পরবর্তী ছবি দুটি লক্ষ্য কর, প্রথম ছবিটিতে মসৃণ তলে (আয়না বা স্টিলের থালা), দ্বিতীয় ছবিটিতে অমসৃণ তলে আলো পড়েছে (অনেক দিন ব্যবহার করা স্টিলের থালা বা কাগজের পাতা)। দুটি ছবি কী?

প্রথম ছবিটিতে দেখা যায় আয়না বা দর্পণ থেকে নিয়মিত প্রতিফলন। এখানে আলো এসে যে কোণে পড়ছে, ঠিক সে কোণেই ফিরে যাচ্ছে। কোনো পৃষ্ঠে আলোর এই পড়া বা পতনকে বলা হয় আপতন এবং পৃষ্ঠ থেকে বাধা পেয়ে ফিরে যাওয়াকে বলা হয় প্রতিফলন। আপতিত আলোকরশ্মিগুলো পরস্পর সমান্তরাল এবং প্রতিফলিত আলোকরশ্মিগুলোও পরস্পর সমান্তরাল। দ্বিতীয় ছবিটিতে আপতিত আলোকরশ্মিগুলো পরস্পর সমান্তরাল কিন্তু প্রতিফলিত আলোকরশ্মিগুলো পরস্পর সমান্তরাল নয়। এই ধরনের প্রতিফলনকে বলা

হয় অনিয়মিত বা বিক্ষিপ্ত বা ব্যাপ্ত প্রতিফলন।

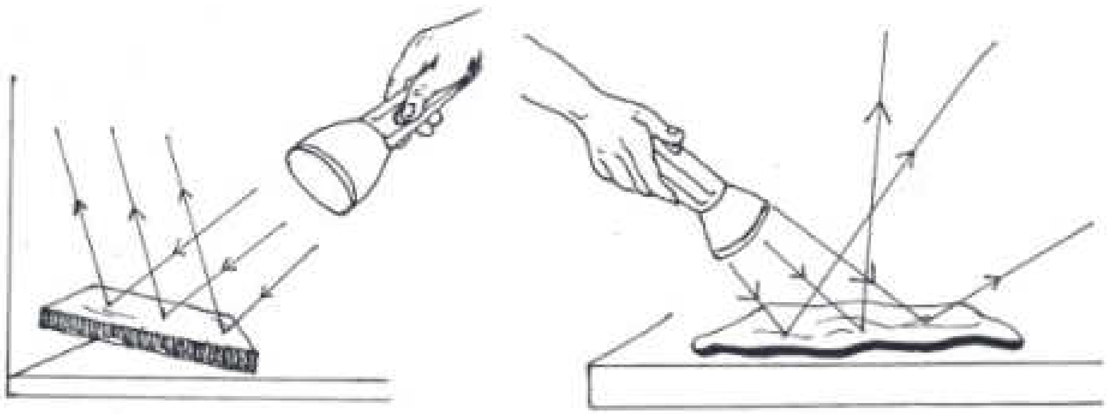

চিত্র ৯.৪ : আলোর প্রতিফলন

কাজ : বিভিন্ন পদার্থে বা পৃষ্ঠে আলোর প্রতিফলনের ভিন্নতা।
প্রয়োজনীয় উপকরণ: একটি আয়না বা দর্পণ, এক খণ্ড কাঠ, এক পাতা কাগজ, একটি স্টিলের ও একটি প্লাস্টিকের থালা।
পদ্ধতি : একটি সাদা দেয়ালের উল্টা দিকে প্রথমে দর্পণটি খাড়া করে ধর। এখন টর্চলাইট থেকে আয়নার উপর আলো ফেলো। দর্পণে প্রতিফলিত আলো দেয়ালে পড়বে। দেয়ালে পড়া এই আলো উজ্জ্বল না অনুজ্জ্বল তা খেয়াল কর। এবার কাগজের পাতা, কাঠখণ্ড, স্টিলের ও প্লাস্টিকের থালার উপর একইভাবে টর্চের আলো ফেলো এবং প্রতিবার দেয়ালে আলোর প্রতিফলন দেখ। কী দেখলে? কোনটিতে প্রতিফলিত আলো বেশি উজ্জ্বল। দেখতে পাবে যে, দর্পণ ও স্টিলের থালা থেকে আলোর প্রতিফলন সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল। কাঠের টুকরা, কাগজ ও প্লাস্টিকের থালা থেকে আলোর প্রতিফলন অনেক কম এবং প্রতিফলিত আলো কম উজ্জ্বল।

সুতরাং, যে পৃষ্ঠ যত মসৃণ বা চকচকে তা তত বেশি আলো প্রতিফলিত করে। আর যে পৃষ্ঠ যত অমসৃণ বা কম চকচকে তা তত কম আলো প্রতিফলিত করে। অমসৃণ বা কম চকচকে পৃষ্ঠে আলোর প্রতিফলনের সাথে অন্য ঘটনাও ঘটে যা তোমরা উপরের শ্রেণিতে শিখবে।

পাঠ ৬-৭ : দর্পণে আলোর প্রতিফলনের নিয়ম

কোনো দেয়ালে বল ছুঁড়ে মারলে তা দেয়াল থেকে যেভাবে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে দর্পণে আলোর প্রতিফলনের ঘটনা অনেকটা তার মতো। কোনো বলকে তুমি যদি সোজাভাবে দেয়ালে ছুঁড়ে দাও, তাহলে তা দেয়ালে লেগে সোজাভাবেই ফিরে আসবে। দর্পণে আলো পড়ার বেলায়ও একই ঘটনা ঘটবে। এবার পরের পৃষ্ঠার কাজটি করো।

লম্ব

কাজ : দেয়ালে ছোঁড়া বলের দিক পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি টেনিস বল।

পদ্ধতি : একটি টেনিস বল নাও। এটাকে লম্বভাবে দেয়ালে ছুঁড়ে মারো। দেয়ালে আঘাত করে বলটি কীভাবে ফিরে আসছে? লম্বভাবে না অন্য কোন পথে? এবার বলটি দেয়ালের সাথে কোণ করে ছুড়ে দাও। বলটি এবার কীভাবে ফিরে আসছে? লম্বভাবে না কোণ করে? বলটিকে দেয়ালের সাথে বিভিন্ন কোণ করে ছুঁড়ে দেখ, বলটি কীভাবে ফিরে আসছে।

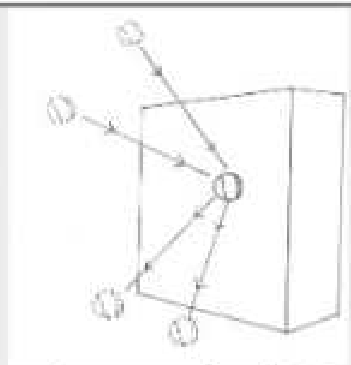

চিত্র ৯.৫ : বলের দিক পরিবর্তন

এ কাজ থেকে আমরা যা পাই তা হলো–

১. বলটি সোজা ছুঁড়লে এটা সোজা ফিরে আসে। ছুড়লে

২. বলটি দেয়ালের সাথে কোণ করে ছুঁড়লে এটা কোণ করে ফিরে যায়।

৩. বলটিকে যে কোণে ছুঁড়ে হয় এটা সে কোণেই ফিরে যায়।

একই রকম ঘটনা ঘটে আলো যখন কোনো দর্পণে আপতিত ও প্রতিফলিত হয়। নিচের কাজটি করলে এটা বুঝতে সহজ হবে।

কাজ : দর্পণে আলোর প্রতিফলন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি দর্পণ ও একটি টর্চ।

পদ্ধতি : দর্পণটি ঘরের মেঝেতে এমনভাবে রাখ যাতে এর মুখ বা মসৃণ দিকটি উপরের দিকে থাকে। দর্পণে টর্চের আলো সোজা করে ফেলো। টর্চের আলো দর্পণ থেকে প্রতিফলিত হয়ে সোজা গিয়ে ছাদে পড়বে। টর্চটি একদিকে সরাও যাতে টর্চের আলো কোণ করে দর্পণে পড়ে। দেখবে কোণ পরিবর্তনের সাথে সাথে ছাদে পড়া আলো স্থান পরিবর্তন করছে।

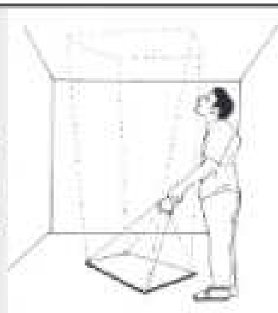

চিত্র ৯.৬ : আলোর প্রতিফলন

অভিলম্বের সাথে যে কোণে দর্পণে আলো পড়ে তাকে বলা হয় আপতন কোণ। আর অভিলম্বের সাথে যে কোণে দর্পণ থেকে আলো প্রতিফলিত হয় তাকে বলে প্রতিফলন কোণ। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সমান। অর্থাৎ,

আপতন কোণ = প্রতিফলন কোণ

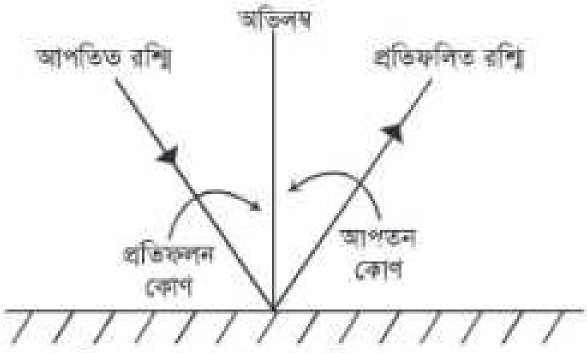

চিত্র ৯.৭ : আপতন ও প্রতিফলন কোণ

পাঠ- ৮ : দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্ব

আমরা জানি যে, কোনো বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়লে আমরা বস্তুটি দেখতে পাই। কিন্তু কোনো বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে কোনো মসৃণ বা চকচকে পৃষ্ঠে পড়লে ঐ পৃষ্ঠে বস্তুটির প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। কোনো দর্পণ বা আয়না ও স্থির পানি এর পরিচিত উদাহরণ। আমরা যদি কোনো দর্পণের সামনে দাঁড়াই তাহলে আমাদের প্রতিবিম্ব দেখতে পাই।

একটি বড়ো দর্পণের (ড্রেসিংটেবিলের আয়না হতে পারে) সামনে দাঁড়াও। দর্পণে তোমার প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে। এবার বল-

দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্বটি কি তোমার সমান না তোমার চেয়ে বড়ো, না তোমার চেয়ে ছোটো?

দর্পণের পেছনে সৃষ্ট প্রতিবিম্বের দূরত্ব কি তুমি দর্পণ থেকে যে দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছ তার সমান? না বেশি বা কম?

- দর্পণের দিকে এক পা এগিয়ে যাও। প্রতিবিম্বটি সমপরিমাণ দূরত্বে সামনে এগিয়ে এসেছে, না পিছিয়ে গেছে? নাকি একই জায়গায় স্থির আছে?
- এবার তোমার ডান হাত নাড়াও। প্রতিবিম্বটি কি হাত নাড়াচ্ছে? নাড়ালে কোন হাত নাড়াচ্ছে, ডান হাত না বাঁ হাত?
- এসব প্রশ্নের উত্তর তোমাকে দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম সম্পর্কে জানতে সাহায্য করবে।

কাজ : সমতল দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্বের দূরত্ব।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : একটি বড়ো স্বচ্ছ কাচ ও দুটি মোমবাতি।

পদ্ধতি : কাচটিকে টেবিলের উপর এমনভাবে সোজা করে দাঁড়া করাও যাতে নড়াচড়া না করে। একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে কাচের সামনে টেবিলের উপর রাখ। কাচে জ্বলন্ত মোমবাতির প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে। দ্বিতীয় মোমবাতিটি কাচের পেছনে এমনভাবে দাঁড়া করাও যাতে জ্বলন্ত মোমবাতির শিখাটি দ্বিতীয় মোমবাতির শিখার মতো মনে হয়। দেখলে মনে হবে যেন দ্বিতীয় মোমবাতিটি জ্বলছে। এবার কাচটি থেকে জ্বলন্ত মোমবাতির দূরত্ব ও দ্বিতীয় মোমবাতির দূরত্ব মাপো। দেখ দুটি দূরত্ব সমান কি না? মজার ব্যাপার হলো, দ্বিতীয় মোমবাতির জায়গায় তুমি যদি তোমার হাতের আঙুলটি ধরো তাহলে মনে হবে তোমার আঙুলটি জ্বলছে।

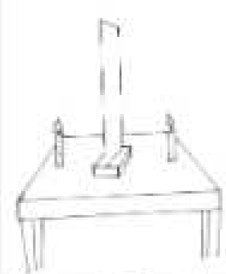

চিত্র ৯.৮ : প্রতিবিম্ব গঠন

এপাঠে যেসব প্রশ্ন উঠে এসেছে তার উত্তর হলো-

ক. দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্ব তোমার সমান আকৃতির। সকল বস্তুর বেলায় এটা সত্য।

খ. দর্পণ থেকে তোমার দূরত্ব ও প্রতিবিম্বের দূরত্ব সমান।

গ. প্রতিবিম্ব পার্শ্ব পরিবর্তন করে অর্থাৎ ডান ও বাঁ দিক তাদের অবস্থান বিনিময় করে। তুমি ডান হাত নাড়ালে প্রতিবিম্ব বাঁ হাত নাড়াচ্ছে বলে মনে হবে।

পাঠ ৯-১০ : কিছু আলোকীয় ঘটনা

দর্পনে প্রতিফলন: বস্তুর একটি বিন্দু O থেকে একটি সমতল দর্পণ MM′ এর সামনে থাকে তখন আমাদের স্বাভাবিক চোখে তার দুটি প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। একটি প্রতিবিম্ব বিন্দুটির প্রকৃত অবস্থানে তৈরি হয়, অন্যটি হয় দর্পণের পেছনে I অবস্থানে। দেখা যাক এই দ্বিতীয় প্রতিবিম্বটি কীভাবে তৈরি হয়। চিত্র

O থেকে প্রতিফলিত অনেক রশ্মির মধ্যে দুটি রশ্মি OA এবং OB ছবিতে দেখানো হয়েছে। দর্পণে প্রতিফলনের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিফলনের পর এরা AC এবং BD পথে অগ্রসর হয়ে চোখে প্রবেশ করে। অর্থাৎ চোখ দেখতে পায় দুটি রশ্মি AC এবং BD, যারা I বিন্দু থেকে আগত বলে প্রতীয়মান হয়। তাই চোখ I বিন্দুতে O- এর একটি বিম্ব দেখতে পায়।

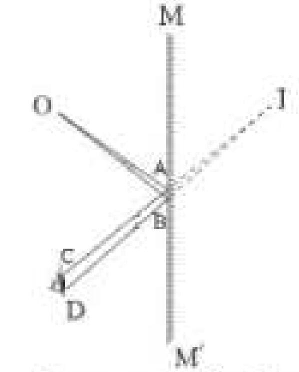

চিত্র ৯.৯ : আলোকীয় ঘটনা

পেরিস্কোপে প্রতিফলন: পেরিস্কোপ তৈরি হয় একটি লম্বা টিউব এবং দুটি ক্ষুদ্র সমতল দর্পণ দিয়ে। টিউবের দুই প্রান্তে দর্পণ দুটিকে টিউবের দেয়ালের সাথে ৪৫° কোণে স্থাপন করা হয়, ছবিতে যেমন দেখানো আছে। দর্পণগুলো পরস্পর সমান্তরাল থাকে।

ছবিতে দেখানো একটি বস্তুর একটি বিন্দু O থেকে আলোকরশ্মি এসে পেরিস্কোপের A প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করে প্রথম দর্পণ M-এ আপতিত হয়, এবং সেখানে প্রতিফলনের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিফলিত হয়ে দ্বিতীয় দর্পণ N-এ আপতিত হয়। দ্বিতীয় দর্পণে পুনরায় প্রতিফলিত হয়ে সেই রশ্মি পেরিস্কোপের B প্রান্ত দিয়ে নির্গত হয়। সেখানে আমাদের চোখে যদি এই রশ্মি আপতিত হয় তাহলে চোখ দেখে যে NB বরাবর আলো আসছে, সুতরাং O বিন্দুর একটি বিম্ব চোখ দেখতে পায় এই রেখা বরাবর I বিন্দুতে।

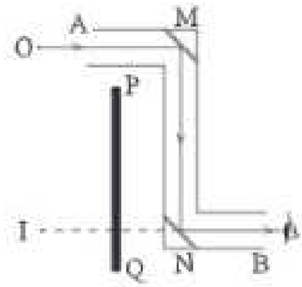

চিত্র ৯.১০ : পেরিস্কোপ

চোখের সামনে যদি কোনো বাধা থাকে (ছবিতে PQ), তাহলে বাধার অন্য পাশের বস্তু বা ঘটনা দেখার জন্য অনেক সময় পেরিস্কোপ ব্যবহার করা হয়। স্টেডিয়ামে ভীড়ের মধ্যে খেলা দেখার জন্য পেরিস্কোপ ব্যবহার করা যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠে কী আছে তা ডুবোজাহাজ থেকে দেখার জন্যও এর ব্যবহার বেশ প্রচলিত।

নতুন শব্দ : দর্পণ, সমতল দর্পণ, প্রতিফলন, শোষণ, নিয়মিত প্রতিফলন, বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন, প্রতিবিম্ব, আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ।

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- আলো ছাড়া কোনো কিছু দেখা যায় না। কোনো বস্তুতে আলো পড়ে তা আমাদের চোখে ফিরে আসলেই আমরা বস্তুটি দেখতে পাই।
- আলো সরলরেখায় চলে।
- কোনো বস্তুতে আলো পড়ে তা যদি বাধা পেয়ে ফিরে আসে, তাহলে তাকে প্রতিফলন বলে।
- কোনো বস্তুতে আলো পড়ে তা যদি ফিরে না আসে, তাহলে তাকে শোষণ বলে।
- আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সমান।
- সকল পৃষ্ঠ থেকেই আলো প্রতিফলিত হয়।
- মসৃণ ও পালিশ করা পৃষ্ঠ থেকে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে।
- দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্ব বস্তুর সমান আকৃতির হয়।
- সমতল দর্পণে সৃষ্ট প্রতিবিম্বের পার্শ্ব পরিবর্তন ঘটে।
- দর্পণ থেকে বস্তুর দূরত্ব ও প্রতিবিম্বের দূরত্ব সমান।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর।

১. সমতল দর্পণে আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ ------- ।

২. কোনো ব্যক্তি দর্পণ থেকে ১ মিটার দূরত্বে দাঁড়ালে তার প্রতিবিম্ব থেকে তার দূরত্ব -----মিটার হবে।

৩. দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে তোমার ডান কান ছুঁলে প্রতিবিম্ব ---------- ছুঁবে।

৪. পেরিস্কোপ তৈরি হয় প্রতিফলনের ----------ঘটার জন্য।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বস্তুতে আলো পড়ে যদি তা ফিরে না আসে তাহলে তাকে কী বলে?

ক. শোষণ খ. প্রতিফলন

গ. প্রতিসরণ ঘ. বিশ্লেষণ

২. কোনো বস্তু আমরা দেখতে পাই যখন-

ক. বস্তুটি আলো শোষণ করে খ. বস্তুটি আলো প্রতিফলিত করে

গ. বস্তুটি আলো প্রতিসরিত করে ঘ. চোখ থেকে আলো বস্তুতে পড়ে

নিচের চিত্র থেকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

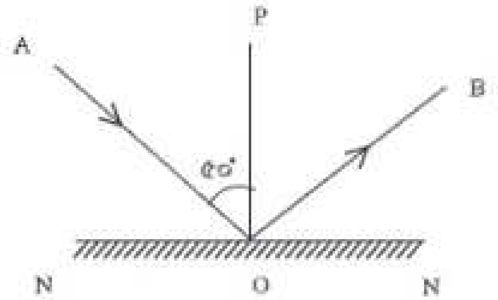

৩. চিত্রে ∠BON এর মান কত?

ক. ১০° খ. ৪০°

গ. ৫০° ঘ. ৯০°

৪. রশ্মিটি PO বরাবর আপতিত হলে প্রতিফলন কোণের মান কত হবে?

ক. ০° খ. ৪০°

গ. ৫০° ঘ. ৯০°

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মনে কর তুমি একটি অন্ধকার ঘরে আছ। তুমি কি ঘরের ভিতরের জিনিস দেখতে পাবে? তুমি কি ঘরের বাইরের জিনিস দেখতে পাবে? ব্যাখ্যা কর।

২. নিয়মিত ও বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের পার্থক্য কী?

৩. একটি পেরিস্কোপের গঠন বর্ণনা কর।

৪. নিচের কোনটি থেকে নিয়মিত ও কোনটি থেকে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন ঘটে?

ক. মার্বেলের মেঝে	খ. ছড়ানো আটা
গ. জুতার বাক্স	ঘ. সমতল দর্পণ
ঙ. পালিশ করা দরজা	চ. নতুন স্টিলের থালা

৫. নিচের চিত্রটি দেখ এবং কোণগুলোর মান বের কর।

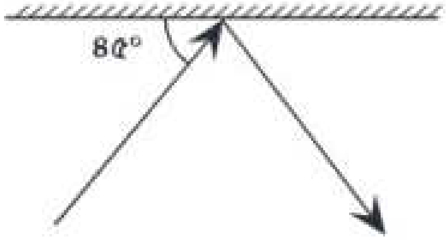

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সামিন স্কুলের ব্যবহারিক ক্লাসে পেরিস্কোপ নিয়ে এর মধ্যে তাকাতেই ক্লাসের বাইরে অবস্থিত বাগানের ফুল লক্ষ করল। ক্লাসের শেষে হাত ধোয়ার জন্য বেসিনের আয়নার সামনে যেতেই লক্ষ করল সে যত সামনে আসছে আয়নার মধ্যে তার প্রতিচ্ছবিও তত সামনে এগিয়ে আসছে, আবার দূরে যাওয়ার সময় আয়নার মধ্যে তার প্রতিচ্ছবিও দূরে সরে যাচ্ছে। এরপর বাসায় ফিরে সে প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে ৩০° কোণে দর্পণ স্থাপন করে একটি পেরিস্কোপ তৈরি করল।

ক. আলোর প্রতিফলন কাকে বলে?
খ. প্রতিবিম্ব বলতে কী বুঝায়?
গ. আয়নায় সামিনের প্রতিচ্ছবি পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সামিনের বাসায় প্রস্তুতকৃত পেরিস্কোপ দিয়ে স্কুলের অনুরূপ বাইরের দৃশ্য দেখা সম্ভব হবে কি? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২। দুটি সমতল দর্পণ সমকোণে মিলিত হয়েছে। একটি আলোক রশ্মি ২০° কোণে প্রথম দর্পণে পড়েছে।

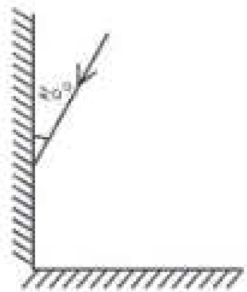

ক. প্রতিফলন কাকে বলে?
খ. প্রতিফলনের নিয়মগুলো লিখ।
গ. দ্বিতীয় দর্পণ থেকে প্রতিফলিত রশ্মিটি আঁকো।
ঘ. দর্পণ দুটিকে পরস্পরের সমান্তরাল করা হলে কোন ধরনের প্রতিফলন ঘটবে এবং কেন ঘটবে ব্যাখ্যা কর।

নিজেরা কর

১. প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে একটি পেরিস্কোপ তৈরি কর।

২. নিজের আয়না বা দর্পণ নিজে তৈরি কর। এক ফালি কাচ নাও। একে ভালো করে পরিষ্কার কর। একে এক পাতা সাদা কাগজের উপর রাখ এবং কাচে নিজেকে দেখ। কতটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে? এরপর কাচটিকে এক পাতা কালো কাগজের উপর রাখ এবং কাচে নিজেকে দেখ। এখন কি তুমি নিজকে আরও ভালো ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ এবং কেন?

দশম অধ্যায়

গতি

স্থিতি ও গতি আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার বিষয়। এ বিশ্বে কোনো বস্তু স্থির আবার কোনো বস্তু গতিশীল। প্রতিদিন আমাদের আশেপাশে নানা রকম স্থিতি ও গতি দেখতে পাই। বাড়িঘর, দালান-কোঠা, রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট, রাস্তার পাশে গাছ সব সময়ই দাঁড়িয়ে আছে–এরা স্থিতিতে আছে বা স্থির। চলমান বাস, চলন্ত গাড়ি, চলন্ত রিক্সা, চলন্ত ট্রেন এমনকি আমাদেরও হাঁটা-চলা হলো গতির উদাহরণ। এ অধ্যায়ে আমরা স্থিতি ও গতি নিয়ে আলোচনা করব।

এই অধ্যায় শেষে আমরা

- স্থিতি ও গতির পার্থক্য করতে পারব।
- সকল গতিই আপেক্ষিক তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার গতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- গতি সম্পর্কিত রাশিসমূহের গাণিতিক হিসাব করতে পারব।
- গতি সম্পর্কিত রাশি পরিমাপ করতে পারব।
- দূরত্ব ও দ্রুতি নির্ণয় করতে পারব।
- দ্রুতি পরিমাপে স্টপ-ওয়াচ (থামা-ঘড়ি) সুনিপুণভাবে ব্যবহার করতে পারব।
- অতিরিক্ত গতি কীভাবে জীবনের জন্য ঝুঁকি বয়ে আনে তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ভ্রমণকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ভ্রমণকালে সঠিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণে নিজে সচেতন হব এবং অন্যাদেরকে সচেতন করব।

পাঠ-১ : স্থিতি ও গতি

আমাদের চারপাশে নানা রকম বস্তু রয়েছে। এদের অনেকে স্থির রয়েছে, অর্থাৎ স্থিতিতে রয়েছে, যেমন: ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, গাছ, রাস্তার পাশের ল্যাম্প-পোস্ট ইত্যাদি। এরা এক জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

চিত্র ১০.১ : স্থির অবস্থা

আবার অনেক বস্তু আছে যা চলমান বা এদের গতি আছে। যেমন : চলমান ট্রেন, চলন্ত বাস ও গাড়ি, চলমান সাইকেল ও রিকশা, হেঁটে চলা লোক ইত্যাদি।

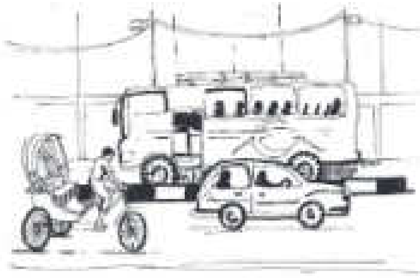

চিত্র ১০.২ : গতিশীল অবস্থা

এবার আসা যাক আমরা স্থিতি ও গতি বলতে কী বুঝি? মনে কর, আনুশেহ্ রাস্তার এক পাশে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে। আনুশেহ্ বলছে, রাস্তার পাশের গাছপালা, ঘরবাড়ি, রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট ও বাসস্টপ সবই স্থির রয়েছে। সে কেন এ কথা বলছে? বলতে পারবে?

আনুশেহ্ এ কথা বলছে কারণ এসব বস্তু তার সাপেক্ষে সময়ের সাথে অবস্থান পরিবর্তন করছে না। তাই কোনো বস্তু যদি সময়ের সাথে পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন না করে তা হলে তা স্থির এবং বস্তুর ঐ অবস্থাকে বলা হয় স্থিতি।

কাজ : হাত দিয়ে একটি কলম ধরে রাখ। তোমার আশেপাশের বস্তুগুলোর সাপেক্ষে কলমের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কিনা তুলনা কর।

তোমার হাতে ধরে থাকা কলমের আশেপাশের প্রত্যেক বস্তু যেমন : তোমার চেয়ার, টেবিল, তোমার বই, খাতা ও ঘরের সবকিছু থেকে এই কলমের একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব ও দিক আছে। কলমের আশেপাশের সকল বস্তুর তুলনায় কলমটির অবস্থান নির্দিষ্ট। সময়ের সাথে কলমটির অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। আমরা বলি, পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে কলমটি স্থির। কলমটির স্থির থাকার এই ঘটনাই হচ্ছে স্থিতি।

সুতরাং, সময়ের সাথে পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে কোনো বস্তুর অবস্থান পরিবর্তন না করা হলো স্থিতি।

এবার আরেকটি ঘটনা ধরা যাক। আরিয়ান একটি রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে। তার সামনে দিয়ে একটা ট্রেন স্টেশন অতিক্রম করে চলে গেল। তা দেখে সে বলল যে, ট্রেনটি গতিশীল। কারণ তার সাপেক্ষে ট্রেনটির অবস্থান প্রতিক্ষণেই পরিবর্তিত হচ্ছে। অর্থাৎ আরিয়ানের সাপেক্ষে ট্রেনটি প্রতিক্ষণেই অবস্থান পরিবর্তন করছে।

কাজ : তোমার হাতে ধরা কলমটিকে এদিক-সেদিক নাড়তে থাকো। আশপাশের সকল বস্তুর সাপেক্ষে কলমের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন ঘটছে কিনা তুলনা কর।

কলমের আশেপাশের প্রত্যেকটি বস্তু থেকে কলমের দূরত্ব ও দিক ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। সময়ের সাথে কলমটির অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা বলি পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে কলমটি গতিশীল। সুতরাং, কোনো বস্তু যদি পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন করে, তখন বস্তুটিকে গতিশীল বলা হয় এবং বস্তুর এ অবস্থাকে বলা হয় গতি। আমাদের চারপাশে এমন অনেক গতির উদাহরণ হলো, চলমান বাস, কোনো ব্যক্তির দৌড়ে চলা, পাখি উড়ে যাওয়া, ফুটবল গড়িয়ে যাওয়া, গাছ থেকে ফল পড়া ইত্যাদি। তোমরাও এরকম গতির অনেক উদাহরণ দিতে পারবে। বল তো এরকম আর কী কী বস্তুর গতি আছে?

পাঠ-২ : স্থিতি ও গতি আপেক্ষিক

কোনো বস্তু এক পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে স্থির থাকলেও একই সঙ্গে অন্য পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে গতিশীল হতে পারে। একটি ঘটনা বিবেচনা করা যাক, আরিয়ান বাসস্টপে দাঁড়িয়ে ছিল। বাসে বসে থাকা একজন যাত্রী বাসের গতিতে তাকে অতিক্রম করে গেল। আরিয়ানের তুলনায় বা সাপেক্ষে বাস ও বাসের যাত্রী গতিশীল। কিন্তু বাসস্টপের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাছটি তার সাপেক্ষে স্থির। কিন্তু বাসের যাত্রীর নিকট মনে হচ্ছে যে গাছটি তার সাপেক্ষে পিছন দিকে সরে যাচ্ছে।

অর্থাৎ বাসস্টপের গাছটি বাসের যাত্রীর সাপেক্ষে গতিশীল। আরিয়ান যদি ঐ বাসের যাত্রী হতো তাহলে সে দেখতে পেত যে তার সাপেক্ষে ঐ যাত্রীটি স্থির, কিন্তু বাসস্টপের গাছটি তার সাপেক্ষে পিছনের দিকে গতিশীল। একই গাছ আরিয়ানের সাপেক্ষে স্থির কিন্তু বাসের যাত্রীর সাপেক্ষে গতিশীল। এ থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, এই মহাবিশ্বের কোনো বস্তুই পরম স্থিতি বা পরম গতিতে থাকতে পারে না। স্থিতি বা গতি কথা দুটি সম্পূর্ণ আপেক্ষিক এবং নির্ভর করে কে পর্যবেক্ষক তার উপর। কোনো বস্তু কোনো পর্যবেক্ষকের তুলনায় গতিশীল হলেও অন্য পর্যবেক্ষকের তুলনায় স্থির থাকতে পারে। সুতরাং স্থিতি বা গতি পরিমাপের আগে ঠিক করে নিতে হবে কার সাপেক্ষে স্থিতি বা গতি পরিমাপ করা হবে।

> কাজ : একটি সাইকেল নিয়ে তিন বন্ধু মাঠে যাও। এক বন্ধুকে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াতে বল। তুমি সাইকেলের পেছনের সিটে বস এবং অপর বন্ধুকে সাইকেলটি সোজা চালাতে বলো। তোমরা সাইকেলে চড়া দুই বন্ধু স্থির বন্ধুর সাপেক্ষে প্রতিক্ষণেই অবস্থান পরিবর্তন করছ।

স্থির বন্ধুর সাপেক্ষে তোমরা কি গতিশীল? হ্যাঁ। কিন্তু তোমার পাশে বসে সাইকেল চালানো বন্ধুটি কি তোমার সাপেক্ষে গতিশীল? অবশ্যই নয়। সুতরাং সকল গতিই আপেক্ষিক।

প্রসঙ্গ-কাঠামো

যে পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে গতি বা স্থিতি পরিমাপ করা হয়, তাকে বলা হয় প্রসঙ্গ-কাঠামো। সুতরাং, প্রসঙ্গ-কাঠামো হলো এমন কোনো সুনির্দিষ্ট বস্তু বা বিন্দু, যার সাপেক্ষে বস্তুর স্থিতি বা গতি নির্ণয় করা হয়। প্রসঙ্গ-কাঠামো হতে পারে যে কোনো ব্যক্তি, যে কোনো বস্তু, যে কোনো স্থান। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই এদের সুনির্দিষ্ট হতে হবে। তুমি যদি তোমার বাড়ির সাপেক্ষে একটা রিক্সার গতিবেগ মাপতে চাও, এক্ষেত্রে তোমার বাড়ি হবে প্রসঙ্গ-কাঠামো। পৃথিবীর সাপেক্ষে চাঁদের বেগ জানতে চাইলে পৃথিবী হবে প্রসঙ্গ-কাঠামো।

আমরা জানি, সমগ্র বিশ্বজগৎ গতিশীল। মনে কর, তুমি তোমার বিছানায় শুয়ে আছ। তুমি অবশ্যই বলবে যে, তুমি ভূমির সাপেক্ষে স্থির আছ বা স্থিতিতে আছ। কিন্তু পৃথিবী নিজেই তার অক্ষের চারদিকে ঘুরছে। সুতরাং পৃথিবীর সাথে তুমি গতিতে আছ বা গতিশীল।

পাঠ ৩-৪ : নানা প্রকার গতি

গতিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিকরণ করা যেতে পারে। যেমন :

(ক) চলন গতি (খ) ঘূর্ণন গতি (গ) জটিল গতি (ঘ) পর্যাবৃত্ত গতি (ঙ) স্পন্দন গতি বা দোলন গতি

চলন গতি

মনে কর, একটা বাক্স AC-কে কাঠের মেঝের উপর দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বাক্সের A বিন্দু B বিন্দুতে সরে গেছে এবং C বিন্দু চলে গেছে D বিন্দুর উপর।

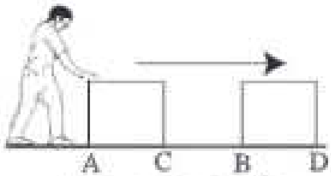

চিত্র ১০.৩ : চলন গতি

এর সকল বিন্দু একই মাপ বরাবর একই দূরত্ব CD পরিমাণ সরে গেছে। এটি হলো চলন গতির উদাহরণ।

সুতরাং, চলন গতি হলো সে গতি, যেখানে কোনো বস্তু এমনভাবে চলে যে এর সকল কণা বা বিন্দু একই সময়ে একই দিকে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে।

> **কাজ :** একটি ইট সংগ্রহ কর। তোমাদের শ্রেণিকক্ষের টেবিলের উপর ইটটি একটি নির্দিষ্ট বিন্দু A তে রাখ। চক দিয়ে দাগ দিয়ে ইটের সামনের ও পিছনের প্রান্ত টেবিলের উপর চিহ্নিত কর। এখন বস্তুটিকে সামনের দিকে ঠেলে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত নিয়ে যাও। এবার টেবিলে চিহ্নিত ইটের সামনের প্রান্ত থেকে ইটের নতুন অবস্থানের সামনের প্রান্ত এবং শেষ প্রান্ত থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত মেপে দেখ।

দেখা যাবে যে, দুটি দূরত্ব সমান। এরকম মধ্যবিন্দু থেকে মধ্যবিন্দু মাপলে দূরত্ব একই পাবে।

টেবিলের ড্রয়ারের গতি, ঢালু তল দিয়ে কোনো বাক্স পিছলে পড়ার গতি, লেখার সময় হাতের গতি–এগুলো সবই চলন গতি। চলন গতিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় (১) সরল গতি ও (২) বক্র গতি। যখন আমরা লিখি, তখন আমাদের হাত কখনো সোজা বা সরলরেখায় অগ্রসর হয় আবার কখনো বক্ররেখায় অগ্রসর হয়।

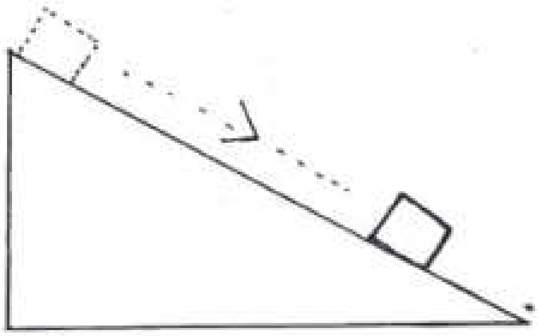

চিত্র ১০.৪ : সরলগতি

যখন কোনো বস্তু সরলরেখা বরাবর চলে, তখন একে সরল রৈখিকগতি বলে। আবার কোনো বস্তু যখন বক্রপথে চলে তখন এর গতি হয় বক্রগতি।

চিত্র ১০.৫ : বক্রগতি

> **কাজ :** কোনো বন্ধুকে শ্রেণিকক্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সোজা হেঁটে যেতে বল। এটা হলো সরল রৈখিক গতি। আরেক বন্ধুকে আঁকাবাঁকা পথে শ্রেণিকক্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে বল। এটা হলো বক্রগতি।

পাঠ-৫ : ঘূর্ণনগতি

তোমার শ্রেণিকক্ষের সিলিং ফ্যানের গতি লক্ষ কর। চিত্রটি দেখ, এখানে ঘূর্ণায়মান বৈদ্যুতিক পাখার ব্লেডের ঘূর্ণনের ফলে ক বিন্দু ক' বিন্দুতে, খ বিন্দু খ' বিন্দুতে এবং গ বিন্দু গ' বিন্দুতে স্থানান্তরিত হয়েছে। পাখার প্রতিটি বিন্দু পাখার কেন্দ্রের চারদিকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে চলেছে। পাখার এই গতিই হলো ঘূর্ণন গতির উদাহরণ। বৈদ্যুতিক পাখা চালিয়ে ঘূর্ণনগতি পর্যবেক্ষণ কর।

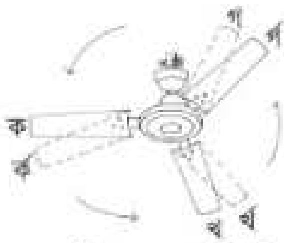

চিত্র ১০.৬ : ঘূর্ণনগতি

> **কাজ :** স্কুলের মাঠে যাও। বাঁশের খুঁটিটি শক্ত করে মাটিতে পোঁত। এক হাত দিয়ে বাঁশটি শক্ত করে ধরে বাঁশের চারদিকে ঘুরতে থাকো। এই গতি হলো ঘূর্ণন গতির উদাহরণ।

চিত্র ১০.৭ : ঘূর্ণনগতি

পাঠ-৬ : ঘূর্ণন চলন গতি বা জটিলগতি

তোমরা সাইকেলের চাকার গতি লক্ষ করেছ নিশ্চয়ই। সাইকেলের চাকা ঘুরতে ঘুরতে অগ্রসর হয় বা পথ চলে। এই গতির যেমন ঘূর্ণন আছে তেমন চলন আছে। এই গতিকে ঘূর্ণন চলন গতি বা জটিলগতি বলে। গড়িয়ে যাওয়া বলের গতি, ড্রিল মেশিনের গতি হল ঘূর্ণন চলন গতির উদাহরণ।

কাজ : স্কুলের মাঠে কোনো বন্ধুকে সাইকেল চালাতে বল। সাইকেল চলার সময় এর চাকার গতি লক্ষ্য কর।

চাকা দুটি কী করছে? ঘুরছে। চাকা কিসের চারদিকে ঘুরছে? চাকা কোনো দূরত্ব অতিক্রম করছে কি? চাকা দুটি এদের কেন্দ্রবিন্দুর চারদিকে ঘুরতে থাকে এবং প্রতিবারই কিছুটা দূরত্ব অতিক্রম করে। এখানে ঘূর্ণন গতি ও চলন গতি একসাথে কাজ করে। এই গতি ঘূর্ণন চলন গতির উদাহরণ।

পাঠ-৭ : পর্যাবৃত্ত গতি

ঘড়ির কাঁটার গতি লক্ষ্য কর। সেকেন্ডের কাঁটাটি প্রতি এক মিনিটে একবার এর কেন্দ্র বিন্দুর চারদিকে ঘুরে আসে। কাঁটাটি বারবার একটি পথে একই বেগে ঘুরছে অর্থাৎ এর গতির পুনরাবৃত্তি ঘটছে। এ ধরনের গতি হলো পর্যাবৃত্ত গতি।

তোমার স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চারপাক দৌড়ের কথা মনে কর। মনে কর, তুমি মাঠের এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছ। চারপাক দৌড়ের একজন প্রতিযোগী তোমাকে একই দিক থেকে চারবার অতিক্রম করে যাবে। এটাও পর্যাবৃত্ত গতি। ঘড়ির কাঁটার গতি, পাকদৌড়ের গতি, বৈদ্যুতিক পাখার গতি হলো পর্যাবৃত্ত গতি। সুতরাং,

কোনো গতিশীল বস্তু যদি নির্দিষ্ট সময় পর পর একই পথ বারবার অতিক্রম করে তাহলে সে গতিকে পর্যাবৃত্ত গতি বলে।

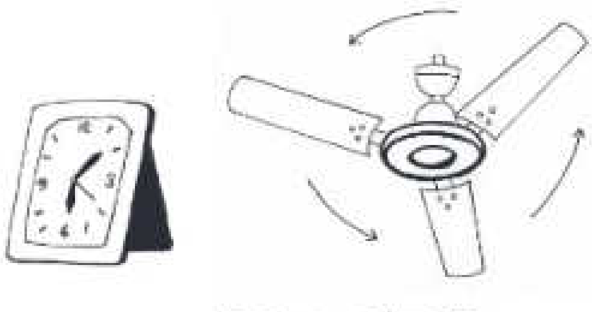

চিত্র ১০.৮ : পর্যাবৃত্ত গতি

২০২৫

কাজ: ভালো করে ফোলানো একটা ফুটবলকে প্রথমে উল্লম্ব বরাবর মেঝের দিকে ছুঁড়ে দাও সোজা নিচের দিকে। বলটি যখন মেঝেতে ধাক্কা খেয়ে ওপরের দিকে ফিরে আসবে তখন আবারো তাকে নিচে ঠেলে দাও বারবার এটা করতে থাকো। এ ক্ষেত্রে বলের গতি হলো পর্যাবৃত্ত গতি কারণ এর গতির একটা অংশের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে । তুমি যখন বলটাকে বারবার হাত দিয়ে নীচে ঠেলে দিচ্ছো তখন তোমার হাতের গতিও পর্যাবৃত্ত।

এবার তোমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে এরকম পর্যাবৃত্ত গতির উদাহরণ দাও ।

পাঠ-৮ : দোলন বা স্পন্দন গতি

কাজ : একটি প্লাস্টিকের রুলার নিয়ে একে টেবিলের এক প্রান্তে এমনভাবে রাখ, যাতে এর বেশ কিছুটা অংশ (প্রায় অর্ধেক) টেবিলের বাইরে থাকে । এবার এক হাত দিয়ে টেবিলের উপরের রুলারের অংশটি দৃঢ়ভাবে চেপে ধর । যাতে এটি নড়ে চড়ে না যায় এবং নির্দিষ্ট স্থানে স্থির থাকে । অপর হাত দিয়ে রুলারটির টেবিলের বাইরের অংশটি নিচের দিকে টেনে সামান্য নামিয়ে ছেড়ে দাও ।

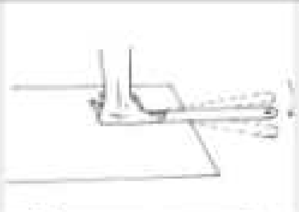
চিত্র ১০.৯ : দোলন গতি

তুমি কী দেখছ? টেবিলের বাইরের রুলারের অংশটি উপরে নিচে উঠানামা করছে (চিত্র ১০.৯) এই ধরনের গতিকে দোলন গতি বা স্পন্দন গতি বলে ।

কাজ : সুতার এক প্রান্তে ছোটো নুড়ি পাথরটিকে বেঁধে ছবির মতো করে টেবিলের এক প্রান্তে ঝুলিয়ে দাও । নুড়ি পাথরটিকে এক পাশে টেনে সামান্য দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দাও । পাথরটি প্রথমে যে স্থির অবস্থান থেকে টেনে নেয়া হয়েছিল, সে অবস্থানে ফিরে আসবে । এরপর পাথরটি আবার স্থির অবস্থানের বিপরীত দিকে চলে যাবে । কিছু দূরে যাবার পর আবার স্থির অবস্থানে ফিরে এসে যে দিকে টানা হয়েছিল সেদিকে যাবে । এভাবে পাথরটি এর স্থির অবস্থানের দুই দিকে দুলতে থাকবে । এই দোলন হলো পাথরের স্থির অবস্থানের দুই পাশে অগ্রপশ্চাৎ গতি (চিত্র ১০.১০) । পাথরের এই গতিকে দোলন গতি বা স্পন্দন গতি বলে ।

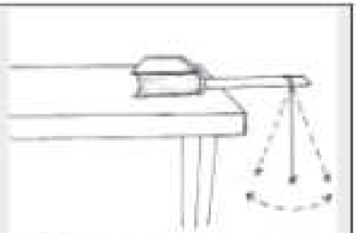
চিত্র ১০.১০ : স্পন্দন গতি

সুতরাং, দোলন গতি বা স্পন্দন গতি হলো সেই পর্যাবৃত্ত গতি, যেখানে কোনো বস্তু একটি অবস্থানের দুই পাশে সমান ভাবে চলে বা গতিশীল । দেয়ালঘড়ির দোলকের গতি দোলন গতি ।

পাঠ-৯ : দূরত্ব ও সরণ

মনে কর, আনিলা কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে ১০ মিটার দক্ষিণে গেল । তারপর সে উল্টা দিকে ঘুরে উত্তর দিকে ৪ মিটার গেল । এখানে আনিলা দূরত্ব অতিক্রম করল (১০+৪) মিটার বা ১৪ মিটার । কিন্তু আনিলার সরণ ঘটল মাত্র (১০-৪) মিটার = ৬ মিটার ।

চিত্র ১০.১১ : সরণ ও দূরত্ব

কেন? কারণ,

দূরত্ব হলো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অতিক্রম করা মোট দৈর্ঘ্য। এখানে তা ১৪ মিটার। আর সরণ হলো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট দিকে অতিক্রম করা সোজাসুজি দূরত্ব। যা হলো (১০-৪) মিটার = ৬ মিটার।

সুতরাং, দূরত্ব হলো যে কোনো দিকে অতিক্রান্ত দৈর্ঘ্য এবং সরণ হলো কোনো নির্দিষ্ট দিকে সোজাসোজি বা সরলরেখায় অতিক্রান্ত দূরত্ব। সরণ হলো বস্তুটির প্রথম অবস্থান থেকে বস্তুটির শেষ অবস্থান পর্যন্ত সরল রৈখিক দূরত্ব।

উদাহরণ : মিসেস রাশিদা সামনের দিকে ৭ কিলোমিটার হাঁটলেন। এরপর বাঁক নিয়ে পেছনের দিকে ৫ কিলোমিটার হাঁটলেন। তিনি কত কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করলেন এবং তার সরণ কত কিলোমিটার হলো?

মিসেস রাশিদার অতিক্রান্ত দূরত্ব = মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব
= ৭ কিলোমিটার + ৫ কিলোমিটার
= ১২ কিলোমিটার

মিসেস রাশিদার সরণ = সোজাপথে প্রথম থেকে শেষ বিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব
= ৭ কিলোমিটার − ৫ কিলোমিটার = ২ কিলোমিটার

চিত্র ১০.১২ : সরণ ও দূরত্ব

সমাধান কর

রাশেদ সাহেব সকাল বেলা উত্তর দিকে ৪ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে গেলেন। অতঃপর বাঁক নিয়ে দক্ষিণ দিকে ৭ কিলোমিটার এলেন। তিনি কত কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করলেন এবং তার সরণ কত কিলোমিটার হলো?

পাঠ-১০ : দ্রুতি ও বেগ

মনে কর, স্কুল ছুটির পর আনিলা ও নওশীন নভোথিয়েটারে গেল। দুজনেই বিকাল ৫টায় রওনা করল। আনিলা নভোথিয়েটারে পৌছাল ৫ টা ৩০ মিনিটে আর নওশীন পৌছাল ৫ টা ১০ মিনিটে। কে বেশি দ্রুত গেল? অবশ্যই নওশীন। কারণ নওশীন সমপরিমাণ দূরত্ব আনিলার চেয়ে ২০ মিনিট কম সময়ে অতিক্রম করেছে।

রবিন ও শাহীন তাদের বাড়ি থেকে স্কুলে রওনা করল। রবিন স্কুলে পৌছাল ২০ মিনিটে, শাহীন পৌছাল ৪০ মিনিটে। রবিনের বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব ১৬০০ মিটার এবং শাহীনের বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব ২০০০ মিটার। কে বেশি দ্রুত গেল? এখানে রবিন কম দূরত্ব অতিক্রম করেছে এবং শাহীন বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে।

কে বেশি দ্রুত গেল তা বের করতে আমাদের বের করতে হবে যে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে তারা কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে। মনে করা যাক, এই নির্দিষ্ট সময় ব্যবধান হলো ১ মিনিট।

১ মিনিটে রবিনের অতিক্রান্ত দূরত্ব = ১৬০০/২০ = ৮০ মিটার।
১ মিনিটে শাহীনের অতিক্রান্ত দূরত্ব = ২০০০/৪০ = ৫০ মিটার।

সুতরাং, রবিন বেশি দ্রুত স্কুলে গেল। কারণ, সে ১ মিনিটে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে। সুতরাং কোনো গতিশীল বস্তুর দ্রুতি হলো একক সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব। এটাকে এভাবেও বলা যায়,

দ্রুতি = দূরত্ব/ দূরত্ব অতিক্রম করতে প্রয়োজনীয় সময়

দূরত্ব মাপা হয় মিটারে, একে সংক্ষেপে 'মি' দিয়ে বুঝানো হয়, সময় মাপা হয় সেকেন্ডে, একে সংক্ষেপে বুঝানো হয় সে. দিয়ে।

উদাহরণ : একটি গাড়ি ৩ সেকেন্ডে ৬০ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করল। এর দ্রুতি কত?

দ্রুতি = দূরত্ব/ দূরত্ব অতিক্রম করতে প্রয়োজনীয় সময়
= ৬০ মি./৩সে.
= ২০ মি./সে.

সমাধান কর: নাহিয়ান কলেজের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চারপাক দৌড়ে ৫০০০ মিটার ২৫ মিনিটে গেল। তার দ্রুতি কত?

বেগ

কোনো নির্দিষ্ট দিকে দ্রুতিকে বলা হয় বেগ।

মনে কর লুবাবা উত্তর দিকে ১০ সেকেন্ডে ১৫ মিটার গেল। তার বেগ কত হবে?

বেগ = ১৫ মিটার/১০ সেকেন্ড
= ১.৫ মি/সে উত্তর দিকে

বেগের মান বলার সাথে দিকও উল্লেখ করতে হবে। কারণ, বেগের মান ও দিক উভয়ই আছে। কিন্তু দ্রুতির শুধু মান আছে। স্কুলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পাকদৌড়ে প্রতি সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব হলো দ্রুতির উদাহরণ। এর কোনো নির্দিষ্ট দিক নেই, শুধু মান আছে। নির্দিষ্ট কোনো দিকে ১০০ মিটার দৌড়ে প্রতি সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব হলো বেগের উদাহরণ।

মনে রেখ

- কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে কোনো বস্তুর সরণ হলো ঐ বিন্দু থেকে নির্দিষ্ট দিকে দূরত্বের সমান।
- সময়ের সাথে কোনো বস্তুর সরণের পরিবর্তনের হারকে বেগ বলে।

পাঠ- ১১ : ত্বরণ

মনে কর, একটি মোটর সাইকেল ২০ মিটার/সেকেন্ড বেগে চলছিল। চালক অ্যাকসিলারেটর চাপলেন ফলে মোটরসাইকেলটি আরও বেশি বেগে যেতে লাগল। মনে করা যাক, প্রতি সেকেন্ডে মোটরসাইকেলের বেগ ৫ মিটার/সেকেন্ড বাড়ছে।

মোটরসাইকেলটির আদি বা প্রাথমিক বেগ ছিল ২০ মিটার/সেকেন্ড

১ সেকেন্ড পরে এর বেগ বেড়ে হলো ২৫ মিটার/সেকেন্ড
২ সেকেন্ড পরে এর বেগ বেড়ে হলো ৩০ মিটার/সেকেন্ড
৩ সেকেন্ড পরে এর বেগ বেড়ে হলো ৩৫ মিটার/সেকেন্ড
৪ সেকেন্ড পরে এর বেগ বেড়ে হলো ৪০ মিটার/সেকেন্ড
৫ সেকেন্ড পরে এর বেগ বেড়ে হলো ৪৫ মিটার/সেকেন্ড

প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ বেগ বাড়ছে তা হলো ত্বরণ। এখানে প্রতি সেকেন্ডে ৫ মিটার/সেকেন্ড বেগ বাড়ছে। সুতরাং ত্বরণ হলো প্রতি সেকেন্ডে ৫ মিটার/সেকেন্ড। একে ৫ মিটার/সেকেন্ড^{২} লেখা হয়। মোট সময় এবং ঐ সময়ে বেগের মোট বৃদ্ধি জানা থাকলে সহজেই ত্বরণ বের করা যায়।

এখানে আদি বেগ ছিল ২০ মিটার/সেকেন্ড। শেষ বেগ ছিল ৪৫ মিটার/সেকেন্ড

সুতরাং বেগের মোট বৃদ্ধি (৪৫− ২০) মিটার/সেকেন্ড = ২৫ মিটার/সেকেন্ড

মোট সময় লেগেছে ৫ সেকেন্ড

সুতরাং, ত্বরণ = (বেগের মোট বৃদ্ধি)/(মোট সময়)

= (২৫মি/সে)/৫সে = ৫ মি/সে^{২}

সুতরাং, ত্বরণ হলো সময়ের সাথে বেগের বৃদ্ধির হার বা প্রতি একক সময়ে বেগের বৃদ্ধি ।

মন্দন

উপরের উদাহরণে মোটরসাইকেলটির বেগ প্রতি সেকেন্ডে ৫ মি/সে বাড়ছিল । চালক যদি অ্যাকসিলারেটর না চেপে ব্রেক চাপতেন তাহলে মোটরসাইকেলটি ধীরগতি হয়ে যেত । এর বেগ হয়ত প্রতি সেকেন্ডে ৫ মি/সে কমতে থাকত । মোটরসাইকেলটির বেগ প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ কমত তাকে বলা হয় ঋণাত্মক ত্বরণ বা মন্দন ।

পাঠ -১২ : অতিরিক্ত গতি ও জীবনের ঝুঁকি

কাজ : ৫/৬ জন বন্ধু মিলে এক একটি দল তৈরি কর । প্রতিটি দল নিজেদের মধ্যে যানবাহনের দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে আলোচনা কর । আলোচনা শেষে কারণগুলো খাতায় লিখ । প্রতিটি দল থেকে একজন তা উপস্থাপন কর । সকল দলের উপস্থাপনের পর নিজেরা সারসংক্ষেপ তৈরি কর ।

আমাদের দেশে প্রতিদিনই কোনো না কোনো সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে । এ দুর্ঘটনার একটি কারণ অতিদ্রুত গাড়ি চালানো । অতিরিক্ত বেগে যানবাহন চালালে যানবাহনের উপর চালকের নিয়ন্ত্রণ থাকে না । সুতরাং, যেসব বাসচালক, ট্রাকচালক বা গাড়িচালক অতিদ্রুত গাড়ি চালান, তারাই বেশি দুর্ঘটনায় পড়েন । ফলে অনেক লোক মারা যায় । অনেক লোক আহত হয় । অনেক লোক চিরজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যায় । তাই অতিরিক্ত বেগে বাস, ট্রাক, লরি ও গাড়ি চালাতে নেই । কেউ চালালেও তাকে নিষেধ করতে হবে । সরু রাস্তা, রাস্তার বাঁক ও সেতুতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেশি । এসব জায়গায় অতিরিক্ত বেগে যানবাহন চালালে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটে । অনেক রাস্তায় যানবাহনের গতিসীমা নির্দিষ্ট করা থাকে । এ নির্দিষ্ট গতিসীমা মেনে যানবাহন চালাতে হবে । বড় হয়ে নিজেরা কখনো অতিরিক্ত বেগে যানবাহন চালাবে না এবং অন্যকেও চালাতে নিষেধ করবে ।

নতুন শব্দ : স্থিতি, গতি, চলন গতি, ঘূর্ণন গতি, চলন ঘূর্ণন গতি, পর্যাবৃত্ত গতি, স্পন্দন গতি, সরণ, বেগ ও ত্বরণ ।

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- কোন বস্তু যদি পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন করে, তখন বস্তুটিকে গতিশীল বলা হয় এবং বস্তুর এ অবস্থাকে বলা হয় গতি ।
- কোনো বস্তু যদি পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে অবস্থান পরিবর্তন না করে, তখন বস্তুটিকে স্থিতিশীল বলা হয় এবং বস্তুর এ অবস্থাকে বলা হয় স্থিতি ।
- সকল গতিই আপেক্ষিক ।
- গতিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিকরণ করা যেতে পারে । যেমন (ক) চলন গতি (খ) ঘূর্ণন গতি (গ) জটিল গতি (ঘ) পর্যাবৃত্ত গতি (ঙ) স্পন্দন গতি বা দোলন গতি
- কোনো গতিশীল বস্তুর সকল কণা বা বিন্দু একই সময়ে একই দিকে সমান দূরত্ব অতিক্রম করলে তাকে চলন গতি বলে ।
- কোনো বস্তুর সকল বিন্দু একই পথে না চলে এর প্রতিটি বিন্দু যদি এর কেন্দ্রের চারদিকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে চলে তাহলে এর গতিকে ঘূর্ণন গতি বলে ।

- যে গতির ঘূর্ণন ও চলন উভয়ই আছে সেই গতিকে ঘূর্ণন চলন গতি বলে।
- কোনো গতিশীল বস্তু যদি একই পথ বারবার অতিক্রম করে তাহলে সে গতিকে পর্যাবৃত্ত গতি বলে।
- দোলন গতি বা স্পন্দন গতি হলো সে গতি, যেখানে কোনো বস্তু একটি অবস্থানের অগ্রপশ্চাৎ চলে বা গতিশীল।
- দূরত্ব হলো যে কোনো দিকে অতিক্রান্ত দৈর্ঘ্য এবং সরণ হলো কোনো বস্তুর প্রাথমিক অবস্থা হতে শেষ অবস্থান পর্যন্ত সরল রৈখিক দূরত্ব।
- কোনো বস্তু একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে দ্রুতি বলে।
- কোনো নির্দিষ্ট দিকে দ্রুতিকে বলা হয় বেগ।
- ত্বরণ হলো সময়ের সাথে বেগ বৃদ্ধির হার বা প্রতি সেকেন্ডে বেগের বৃদ্ধি।
- মন্দন হলো ঋণাত্মক ত্বরণ।
- যানবাহনের অতিরিক্ত গতি দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর।

১. ঢালু জায়গা দিয়ে কোনো বস্তু পিছলে পড়ার গতিকে ----------বলে।
২. গড়িয়ে যাওয়া মার্বেলের গতি হলো ---------------।
৩. সময়ের সাথে--------হারকে ত্বরণ বলে।
৪. --------- মান ও দিক উভয়ই আছে।

নিচের কোনটি কোন ধরনের গতি লিখ।

১. চলমান বাসের চাকার গতি।
২. দোলনার গতি।
৩. সাইকেলের প্যাডেলের গতি।
৪. নিজ অক্ষের চারদিকে পৃথিবীর গতি।
৫. স্কিপিং করার সময় তোমার হাতের গতি।
৬. আঁকাবাঁকা রাস্তায় গাড়ির গতি।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (একাধিক সঠিক উত্তর থাকতে পারে)

১. সময়ের সাথে সরণের পরিবর্তনের হারকে কী বলে?

ক. দ্রুতি খ. বেগ
গ. দূরত্ব ঘ. ত্বরণ

২. ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটার গতি কোন ধরনের গতি?

ক. চলন গতি খ. ঘূর্ণন গতি
গ. দোলন গতি ঘ. পর্যাবৃত্ত গতি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রিমি একটি স্থান থেকে নির্দিষ্ট দিকে সোজাপথে ৮ মিটার গেল। সেখান থেকে একই পথে একই দিকে ৬ মিটার ফিরে এলো।

৩. রিমি কত দূরত্ব অতিক্রম করল?

ক. ২ মিটার খ. ১০ মিটার

গ. ১৪ মিটার ঘ. ৪৮ মিটার

৪. রিমির সরণ কত?

ক. ২ মিটার খ. ৬ মিটার

গ. ৮ মিটার ঘ. ১৪ মিটার

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পর্যাবৃত্ত গতি কাকে বলে? দুটি উদাহরণ দাও। ২. ঘূর্ণন গতি ও ঘূর্ণন চলন গতির মধ্যে পার্থক্য কী?
৩. চিত্রসহ সরণ ব্যাখ্যা কর। ৪. দ্রুতি ও বেগের মধ্যে পার্থক্য কী? ৫. মন্দন ও ত্বরণের মধ্যে পার্থক্য কী?

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. খুশবু, হৃদিতা ও সদিচ্ছা বাড়ি থেকে স্কুলে রওনা হলো। স্কুলে পৌঁছাতে খুশবুর ১৫ মিনিট, হৃদিতার ২০ মিনিট এবং সদিচ্ছার ৩০ মিনিট সময় লাগল। খুশবুর বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব ১৫০০ মিটার, হৃদিতার ১৮০০ মিটার এবং সদিচ্ছার ২১০০ মিটার।

ক. পর্যাবৃত্ত গতি কাকে বলে? খ. দেয়াল ঘড়ির দোলকের গতি কী ধরনের গতি? ব্যাখ্যা কর।

গ. খুশবুর দ্রুতি নির্ণয় কর। ঘ. হৃদিতা ও সদিচ্ছার কার দ্রুতি বেশি? গাণিতিক বিশ্লেষণ করে মতামত দাও।

২.

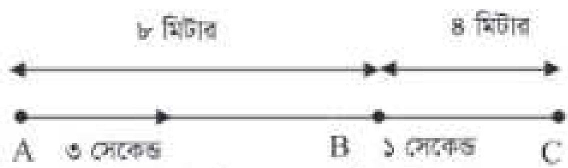

চিত্রে একটি কণা A বিন্দু থেকে C বিন্দুর দিকে যাচ্ছে।

ক. স্থিতি কাকে বলে? খ. প্রসঙ্গ কাঠামো বলতে কী বুঝায়?

গ. A বিন্দু থেকে C বিন্দু পর্যন্ত যেতে কণাটির গড় বেগ কত? নির্ণয় কর।

ঘ. সমত্বরণে চলে কণাটি যদি A বিন্দু থেকে C বিন্দুতে পৌঁছে তাহলে কি সময় বেশি লাগবে না কম লাগবে? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

নিজেরা কর

১. চার পাঁচজন বন্ধু মাঠে যাও। একটি থামাঘড়ি সাথে নাও। একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত সবাইকে দৌড়াতে বল। ঐ দূরত্ব যেতে কার কত সময় লাগে তা থামাঘড়ির সাহায্যে বের কর (থামাঘড়ি না থাকলে হাতঘড়ি ব্যবহার করতে পার)। সময় ও দূরত্ব থেকে দ্রুতি বের কর।

২. তোমার এলাকার সড়কপথে দুর্ঘটনা ঘটার কারণ অনুসন্ধান কর।

একাদশ অধ্যায়

বল ও সরল যন্ত্র

কোন বস্তুর গতি অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে যে প্রভাব প্রয়োগ করতে হয় তাকে বলা হয় বল। বল প্রয়োগে স্থিতিশীল বস্তু গতিশীল হয়, গতিশীল বস্তুর বেগ পরিবর্তিত হয়, কিংবা গতিশীল বস্তু স্থিতিশীল হয়। বলের আছে বিভিন্ন রূপ। বল প্রয়োগেরও আছে বিভিন্ন কৌশল। এইসব কৌশলে বল প্রয়োগ করে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব, এবং কাজকে সহজ করাও সম্ভব। বলের প্রয়োগ দ্বারা সম্পন্ন কাজকে সহজ করে যেসব কল তাদের বলা হয় যন্ত্র। এই অধ্যায়ে তোমরা বল সম্বন্ধে জানবে। সেই সাথে সরল কিছু যন্ত্র সম্বন্ধেও জানবে।

এই অধ্যায় শেষে আমরা

- বল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বস্তুর ওপর বিভিন্ন প্রকার বলের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বিভিন্ন ধরনের সরল যন্ত্রের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার সরল যন্ত্রের সুবিধা তুলনা করতে পারব।
- মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সাথে সরল যন্ত্রের কাজের তুলনা করতে পারব।
- আমাদের জীবনে বলের প্রভাব এবং সরল যন্ত্রের অবদান উপলব্ধি করব।
- ব্যবহারিক জীবনে সরল যন্ত্রের ব্যবহার করতে পারব।

পাঠ ১-২ : বল কী?

তোমরা কি জান যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে জানা বা অজানা বিভিন্নভাবে আমরা বল প্রয়োগ করে থাকি। তোমরা ভাবছ এই বলটা আবার কী? সকাল থেকেই শুরু হয় আমাদের নানাভাবে বিভিন্ন বস্তুর ওপর বলের প্রয়োগ। ঘুম থেকে উঠে মুখ ধোয়ার জন্য পানির কল ছাড়তে বা টিউবওয়েলে চাপ দিতে আমাদের বল প্রয়োগ করতে হয়। এমনকি পড়তে বসার সময় চেয়ারকে টেনে বসতেও বল প্রয়োগ করতে হয়। আবার ধর, তোমার পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে তোমার জ্যামিতি বক্সটি আছে। এটিকে বের করতে এবং বের করার পর পুনরায় ড্রয়ারটিকে বন্ধ করতে ড্রয়ারটিকে যথাক্রমে টান বা ধাক্কা দিতে হয়। তুমি নিশ্চয়ই তোমার ঘরের বাতিটি জ্বালানোর জন্য সুইচটি অন করেছ। এটিতেও কিন্তু বলের প্রয়োগ হয়েছে। কাউকে কি কোকের ক্যান খুলতে দেখেছ। এটিও কিন্তু বল প্রয়োগ। ফুটবলে লাথি দেওয়া বা ক্রিকেট বলে ব্যাট দিয়ে আঘাত ও বল। উপরোক্ত ঘটনাগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রত্যেকটি ঘটনার সাথে দুটি জিনিস জড়িত- ধাক্কা বা টান। এই ধাক্কা বা টানই হলো বল।

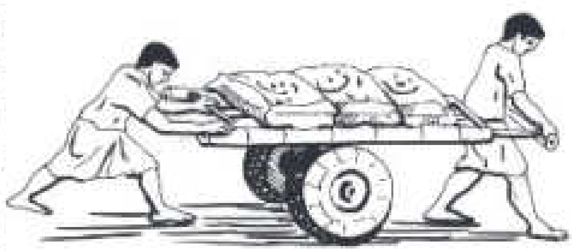

চিত্র ১১.১ : বল হচ্ছে ধাক্কা বা টান

বস্তুর ওপর বলের বিভিন্ন প্রভাব

তোমার তো নিশ্চয়ই একটি রাবার আছে। তুমি কি কখনও দেখেছ একে বাঁকালে, মোড়ালে, চেপে ধরলে বা টানলে এর আকৃতির কিরূপ পরিবর্তন হয়। এই বাঁকানো, মোচড়ানো, চাপা, লম্বা করার চেষ্টাও হলো একই বস্তুর ওপর বল প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি। এগুলোর কি চিত্র অঙ্কন করতে পারবে?

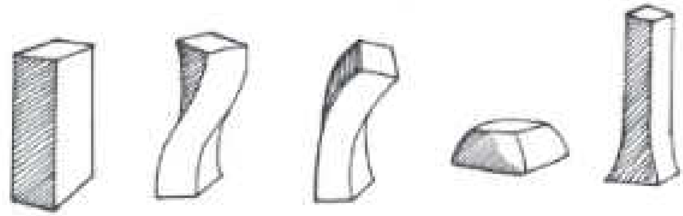

চিত্র ১১.২ : বস্তুর উপর বলের প্রভাব

আরেকটি মজার ঘটনা লক্ষ্য কর। মার্বেল দিয়ে কি কখনো খেলেছ? প্রথমে মার্বেলগুলো সামনে ছড়িয়ে রাখতে হয়। পরে একটু দূর থেকে অন্য একটি মার্বেল দ্বারা ছড়ানো মার্বেলগুলোর মধ্যে কোনো একটিকে আঘাত করার জন্য লক্ষ্য স্থির করতে হয়। যখন তুমি তোমার হাতের মার্বেলটি ছুড়বে তখন এটি তোমার লক্ষ্যের মার্বেলটিকে আঘাত করলে তুমি কী দেখতে পাবে? দেখবে মার্বেলটি আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পর স্থির অবস্থা থেকে গতিশীল হয়েছে। হয়ত দেখবে এটি আবার অন্য কোনো স্থির মার্বেলকে আঘাত করেছে। অথবা মোট একই গতিতে চলমান রয়েছে। গতিপ্রাপ্ত মার্বেলটির ওপর কোনো বল প্রয়োগ না হওয়া পর্যন্ত এই গতি চলতে থাকবে। অন্য কোনো বল না থাকলেও মাটির ঘর্ষণ বলই এক সময় মার্বেলটিকে থামিয়ে দেয়।

আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। কোনো একটা মাইক্রোবাস হয়ত রাস্তায় বিকল হয়ে পড়ল। তখন হয়তো একে পুনরায় চালু করার জন্য ধাক্কা দেওয়া প্রয়োজন। তখন একজন হয়তো একে ধাক্কা দিলে এটি নাও নড়তে পারে। কিন্তু ৪/৫ জন একসাথে ধাক্কা দিলে এটি নড়তে পারে এমনকি চলতেও পারে। এখানে বল প্রয়োগের ফলে স্থির বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে বা ঘটতে চায়।

এখন বলতে পারবে এখানে কী কী ঘটনা ঘটেছে। বলের প্রভাবে মার্বেলের গতির বিভিন্ন পরিবর্তন হলো। একইভাবে সাধারণত বল প্রয়োগে স্থির বস্তুকে গতিশীল করা যায়, গতিশীল বস্তুর গতি বাড়ানো বা কমানো যায় এবং গতিশীল বস্তুকে থামানো যায়। উপরের উদাহরণগুলো থেকে আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারি। বল প্রয়োগের ফলে-

- কোনো স্থির বস্তু গতিশীল এবং গতিশীল বস্তু স্থির হয় বা হতে চায়।
- চলন্ত বস্তুর গতি বাড়তে বা কমতে পারে।
- চলন্ত বস্তুর গতির দিক পরিবর্তন হয়।
- কোনো বস্তুর আকার বা আকৃতি পরিবর্তন হয়।

অনুরূপভাবে বলা যায়, যা কোনো স্থির বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে তাকে গতিশীল করে বা করতে চায় অথবা যা কোনো গতিশীল বস্তুর ওপর ক্রিয়া করে তার গতি, আকার ও আকৃতি পরিবর্তন করে বা করতে চায় তাই বল।

বৈদ্যুতিক সুইচ 'অফ' বা 'অন' করা, কোকের ক্যানের মুখ খোলা, মসলা পেষা, বোঝা তোলা, ঢিল ছুঁড়ে মারা, নৌকা বাওয়া, চলাফেরা করা, কম্পিউটারের মাউসে ক্লিক করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বলের ব্যবহার দেখা যায়। এমনকি মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি, উড়োজাহাজ থেকে শুরু করে ঠেলাগাড়ি, রিকশা প্যাডেল সবকিছুতেই বলের প্রয়োগ দেখা যায়।

পাঠ-৩ : সরল যন্ত্র

এক খণ্ড পাথর বা ইটের উপর ঠেস দিয়ে লম্বা লোহা অথবা কাঠের দণ্ডের এক প্রান্তে বল প্রয়োগ করে অন্য প্রান্ত দিয়ে ভারি কোনো বস্তুকে উপরে তুলতে বা সরাতে দেখেছ নিশ্চয়? হ্যাঁ লোহা বা কাঠের

দণ্ডটিকে বিশেষ এই ব্যবস্থায় ব্যবহার করার ফলে ভারি কোনো বস্তুকে সরানোর কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে যেতে পারে। তোমার শ্রেণিকক্ষে এই ধরনের কাজ সহজেই করে দেখতে পার। এ ক্ষেত্রে লোহা বা কাঠের দণ্ডের এভাবে ঠেস দিয়ে কাজ করার মাধ্যমে এটি একটি সরল যন্ত্র হিসাবে কাজ করেছে। এর মাধ্যমে একটি বিশেষ কৌশলে প্রয়োগকৃত বল দ্বারা সহজেই কাজটা করা সম্ভব হয়েছে। মূলকথা, কম বল প্রয়োগেও অধিক কাজ করা সম্ভব হয়েছে।

চিত্র ১১.৩ : সরলযন্ত্র

কাজকে এভাবেই সহজ করার জন্য দৈনন্দিন জীবনে আমরা নানাবিধ সরলযন্ত্র ব্যবহার করে থাকি। যেমনঃ কাঁচি, সাঁড়াশি, হাতুড়ি, শাবল, কপিকল, লিভার ইত্যাদি। এই যন্ত্রগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো এগুলোর মধ্যে বিশেষ কোনো কৌশল প্রয়োগ করে কাজকে সহজ করা যায়। উপরে উল্লিখিত সরল যন্ত্র নিম্নোক্ত এক বা একাধিকভাবে কাজকে সহজ করে।

- প্রযুক্ত বলকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে।
- কম বল প্রয়োগে কোনো কাজ সম্পন্ন করে।
- বলকে কোনো একটি সুবিধাজনক দিকে প্রয়োগ করে।
- কাজকে নির্দিষ্ট একটি উপায়ে সম্পন্ন করে যা অন্য কোনো উপায়ে করা কঠিন।
- গতি ও দূরত্ব বৃদ্ধি করে।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন, সকল যন্ত্রেই কাজ করতে বাইরে থেকে শক্তির প্রয়োজন হয়। এখন তোমরা আরও কিছু সরল যন্ত্রের সাথে পৃথক পৃথকভাবে পরিচিত হবে এবং এদের থেকে কীভাবে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করা শিখবে।

পাঠ-৪ : লিভার

লিভার হলো একটি সরল যন্ত্র, যাতে একটি শক্ত দণ্ড কোনো অবলম্বনের কোনো কিছুর উপর ভর করে মুক্তভাবে ওঠানামা করে বা ঘোরে, পাঠ ৩ এ বর্ণিত ঘটনার দণ্ড এবং পাথর বা ইটের ব্যবস্থায় যেমন হয়। লিভারের ব্যবহারের আরেকটি সাধারণ উদাহরণ হলো শাবলকে ইট বা পাথরের উপরে ভর করে কোনো ভারি বস্তুকে উঠাতে সাহায্য করা। এখানে ভারি বস্তুটি হলো ভার এবং এই ভারকে উঠাতে যে বল প্রয়োগ করা হয় তা হলো প্রযুক্ত বল। শক্ত দণ্ডটি কোনো অবলম্বনের যে বিন্দুতে ঠেকানো অবস্থায় মুক্তভাবে ওঠানামা করে বা ঘোরে তা হলো ফালক্রাম। লিভার কোনো ভারি বস্তুকে কম বল প্রয়োগ করে উঠাতে বা সরাতে সাহায্য করে।

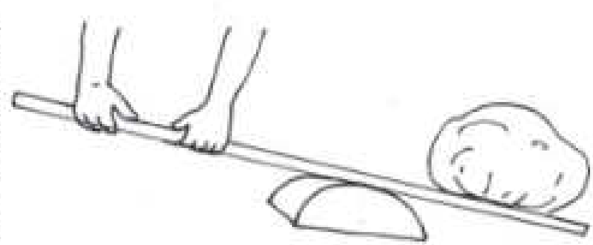

চিত্র ১১.৪ : লিভার

এখানে যান্ত্রিক সুবিধা হলো–

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{ভার}}{\text{প্রযুক্ত বল}}$$

এখন তোমাকে বুঝতে হবে কীভাবে লিভার ব্যবহার করে যান্ত্রিক সুবিধা আদায় করা যায়। লিভারের নীতিমালা হলো নিম্নরূপ :

বল × বলবাহুর দৈর্ঘ্য = ভার × ভারবাহুর দৈর্ঘ্য

এখানে বল যে বিন্দুতে প্রযুক্ত হয় তা থেকে ফালক্রাম পর্যন্ত দূরত্ব হলো বলবাহুর দৈর্ঘ্য। অনুরূপভাবে ভার থেকে ফালক্রাম পর্যন্ত দূরত্ব হলো ভারবাহু। তাহলে উপরের নীতিমালা থেকে নিম্নোক্তভাবেও বোঝা যায়।

$$\frac{\text{ভার}}{\text{বল}} = \frac{\text{বলবাহুর দৈর্ঘ্য}}{\text{ভারবাহুর দৈর্ঘ্য}}$$

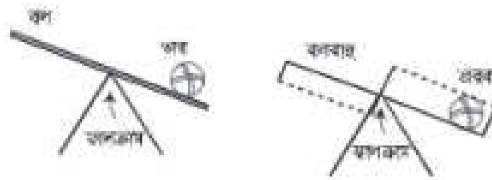

চিত্র ১১.৫ : লিভার

এখানে নির্দিষ্ট বল দ্বারা কীভাবে নির্দিষ্ট ভরের বস্তুকে উঠানো বা সরানোর ক্ষেত্রে যান্ত্রিক সুবিধা আদায় করব তা একটি কাজের মাধ্যমে দেখব।

> **কাজ :** একটি পেনসিলকে রুলারের সাথে রাবার ব্যান্ড দিয়ে বেঁধে একটি লিভার তৈরি কর। এখানে পেনসিলটি ফালক্রাম হিসেবে কাজ করবে। এবার প্রথমেই রুলারটিকে সামনে-পিছনে সরিয়ে ভূমির সমান্তরাল কর। এবার দুই পাশে পাঁচটি করে ৫ টাকার মুদ্রা এমনভাবে রাখ যেন পুনরায় রুলারটি ভূমির সমান্তরাল হয়। এবার ডান দিকে পুনরায় আরও ৫টি মুদ্রা রাখ। কী হবে! নিশ্চয়ই ডান দিকটি ঝুঁকে পড়েছে? এবার পুনরায় রুলারটি সামনে পিছনে করে বাম প্রান্তে ৫টি এবং ডান প্রান্তে ১০টি মুদ্রা রেখে ভূমির সমান্তরাল কর। এতে কী হলো? ভারবাহুর দৈর্ঘ্য কমে গেল এবং বলবাহুর দৈর্ঘ্য বেড়ে গেল। একে আমরা বলতে পারি যান্ত্রিক সুবিধা আদায় হলো। অর্থাৎ কম বল প্রয়োগ করে বেশি ভার তোলা হয়েছে। পুনরায় আরও ৫টি পয়সা দিয়ে দেখ কী হয়।

পাঠ ৫-৬ : লিভারের শ্রেণিবিভাগ

প্রযুক্ত বল, ভার ও ফালক্রামের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে লিভারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:-

প্রথম শ্রেণির লিভার: এই ক্ষেত্রে ফালক্রামের অবস্থান প্রযুক্ত বল ও ভারের মাঝখানে থাকে। যেমন: কাঁচি, সাঁড়াশি, নিক্তি, নলকূপের হাতল, পানি সেচের দোন, ঢেঁকি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় শ্রেণির লিভার: এই ক্ষেত্রে ভার থাকে মাঝখানে এবং প্রযুক্ত বল ও ফালক্রাম দুই প্রান্তে অবস্থান করে। যেমন: যাঁতি, এক চাকার ঠেলা গাড়ি, বোতল খোলার যন্ত্র ইত্যাদি।

তৃতীয় শ্রেণির লিভার: এই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বলটি মাঝখানে কার্যকর হয়। ভার ও ফালক্রাম থাকে দুই প্রান্তে। যেমন: চিমটা।

এখন এই কাঁচি, যাঁতি বা চিমটা ব্যবহার করে কীভাবে কাজকে সহজে করা যায় তা দেখব।

প্রথমত : কাঁচি দিয়ে কিছু কাটার সময় উক্ত বস্তু (যেমন কাপড়) যত বেশি ফালক্রামের কাছে রেখে কাটা যাবে ততই কাটা সহজ হবে। মূলত এক্ষেত্রে ভার বাহুর দৈর্ঘ্যকে কমানোর চেষ্টা করে যান্ত্রিক সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়।

চিত্র ১১.৬ : কাঁচি

দ্বিতীয়ত : যাঁতির ক্ষেত্রে ভর (যেমন সুপারি) কে যত বেশি ফালক্রামের কাছে রাখা যাবে, সুপারি কাটিতে তত কম বল প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রেও ভারবাহুর দৈর্ঘ্য কমিয়ে বা বলবাহুর দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়।

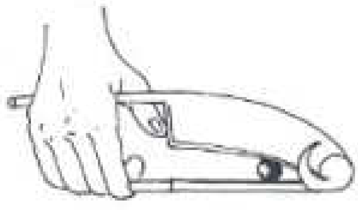

চিত্র ১১.৭ : যাঁতি

তৃতীয়ত: একটি চিমটা দিয়ে কিছু আটকানোর ক্ষেত্রে আঙ্গুলের চাপটি যত বেশি বস্তুর কাছাকাছি হবে বস্তুটিকে আটকে রাখা তত বেশি সহজ হবে। এখানেও মূলত বলবাহুর দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে বা ভারবাহুর দৈর্ঘ্য কমিয়ে কাজ সহজ করা হয়।

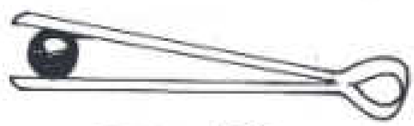

চিত্র ১১.৮ : চিমটা

পাঠ-৭ : হাতুড়ি

একটি হাতুড়ির সাধারণত দুই প্রান্ত থাকে। এক প্রান্ত দিয়ে কাঠে লোহা ঢুকানো হয় এবং অন্য প্রান্ত দিয়ে কাঠ থেকে লোহা বের করা হয়। হাতুড়ি দিয়ে যখন লোহা বের করা হয় তখন হাত দিয়ে হাতুড়িটির হাতল ধরে বল প্রয়োগ করা হয়। আবার যেখানে লোহাটি থাকে তার পাশে ঠেস দিয়ে এটি উঠানো হয় যেটি ফালক্রাম হিসেবে কাজ করে। এক্ষেত্রে লোহা বের করার বাধা ভার হিসেবে কাজ করে। এখানে ফালক্রামটি মাঝখানে কাজ করে বিধায় এটি প্রথম শ্রেণির লিভারের মতো কাজ করে।

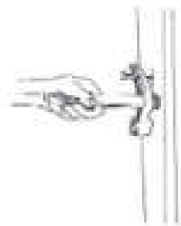

চিত্র ১১.৯ : হাতুড়ি

সাঁড়াশি

এটিও লিভার হিসেবে কাজ করে। সাঁড়াশির যেখানে হাত দিয়ে ধরা হয় সে প্রান্তটিতে বল এবং যে প্রান্তটিতে কোনো বস্তুকে ধরে রাখা যায় সে প্রান্তটিতে ভার কাজ করে। এখানে ফালক্রামটি মধ্যে থাকে বলে এটি প্রথম শ্রেণির লিভারের অন্তর্ভুক্ত। এটিতে ভারবাহুর দৈর্ঘ্য অপরিবর্তনীয়, তাই কেবলমাত্র বলবাহুর দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করে এর যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়।

চিত্র ১১.১০ : সাঁড়াশি

পাঠ ৮-৯ : হেলানো তল ও কপিকল

হেলানো তল

হেলানো তল হলো একটি সরল যন্ত্র। এর সাহায্যে একটি ভারি বস্তুকে খাড়াভাবে তোলার চেয়ে এটাকে গড়িয়ে ওপরে তোলা যায়। হেলানো তলের ব্যবহারে কাজ অনেক সহজ হয় বলেই উঁচু পুলে ওঠার রাস্তা, দালানের ছাদে উঠার সিঁড়ি ইত্যাদি খাড়াভাবে তৈরি না করে হেলানোভাবে তৈরি করা হয়। হেলানো তলের উপর দিয়ে বস্তুকে গড়িয়ে তুলতে দূরত্ব বেশি অতিক্রম করতে হয় কিন্তু বল প্রয়োগ করতে হয় কম। এটা বোঝার জন্য এর যান্ত্রিক সুবিধা বুঝতে হবে। হেলানো তলের যান্ত্রিক সুবিধা হলো:

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{ভার}}{\text{বল}} = \frac{\text{হেলানো তলের দৈর্ঘ্য}}{\text{হেলানো তলের উচ্চতা}}$$

এখান থেকে বুঝা যায় একই উচ্চতায় উঠানোর জন্য হেলানো তলের দৈর্ঘ্য যত বেশি হবে যান্ত্রিক সুবিধাও তত বেশি হবে।

তোমরা কি কেউ দেখেছ কীভাবে একটি গাড়ির চাকা পরিবর্তন করা হয়? একটি সরলযন্ত্রের বা জ্যাক স্ক্রু এর সাহায্যে প্রথমে গাড়িটির একপ্রান্ত উঁচু করা হয় যাতে সহজেই চাকা খুলে আবার লাগানো যায়। জ্যাক স্ক্রু একসাথে লিভার ও হেলানো তলের নীতি মেনে কাজ করে। স্ক্রুর পেঁচানো অংশের উচ্চতা হলো হেলানো তলের উচ্চতা এবং পেঁচানো পথ দিয়ে ঘুরে যেতে যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে তা হলো হেলানো তলের দৈর্ঘ্য। এই যন্ত্রে হেলানো তলের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়। অপর দিকে হাতলে যেদিকে বল প্রয়োগ করা হয় ভার কাজ করে তার লম্ব বরাবর। ফলে জ্যাক স্ক্রু একই সাথে বল বৃদ্ধি ও বলের দিক পরিবর্তন করে কাজকে সহজ করে।

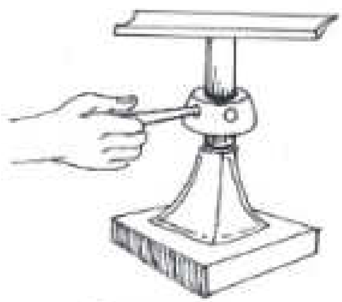

চিত্র ১১.১১ : জ্যাক স্ক্রু

কপিকল

কপিকল হলো এক ধরনের সরল যন্ত্র। এতে একটি খাঁজ কাটা চাকতি থাকে যাতে একটি রশি দুই দিকে ঝুলিয়ে দেয়া ও যায়। কপিকলটি একটি অক্ষদণ্ডকে কেন্দ্র করে ঘোরে যা একটি স্থির ব্লকের সাথে সংযুক্ত থাকে। কপিকল সাধারণত কোনো ভারি বস্তু উপরে উঠাতে বা কুয়া থেকে পানি উঠাতে ব্যবহৃত হয়। কপিকল অনড় বা নড়নক্ষম হতে পারে। অনড় কপিকলে ব্লকটি স্থির থাকে, কেবলমাত্র চাকাটি ঘোরে। অন্যদিকে নড়নক্ষম কপিকলে ব্লকটি স্থির নয় বরং কপিকলের সাথে এটিও ঘুরতে থাকে।

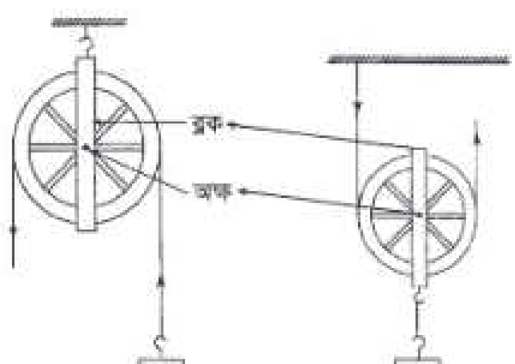

চিত্র ১১.১২ : কপিকল

২০২৫

আমরা পতাকা উপরে উঠানোর জন্য অনড় কপিকল ব্যবহার করে থাকি। এক্ষেত্রে রশি টানার সাথে শুধু মাত্র চাকাটি ঘোরে। এখানে পতাকাকে যত উপরে উঠাবার প্রয়োজন হয় রশিকে তত নিচের দিকে টানতে হয়। ফলে এর মাধ্যমে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায় না। তবে বলের দিক পরিবর্তন করা হয়।

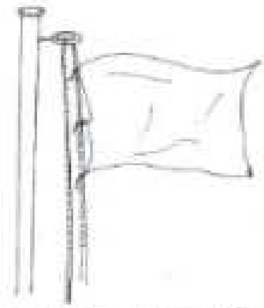

চিত্র ১১.১৩ : পতাকা কপিকল

পাঠ ১০-১১ : চাকা- অক্ষদণ্ড

চাকা- অক্ষদণ্ড এক ধরনের সরলযন্ত্র। এটা মূলত লিভারেরই ভিন্নরূপ। এখানে ভারকে একটি রশির মাথায় বাঁধা হয় এবং চাকাটিকে ঘুরিয়ে সে রশিটি অক্ষদণ্ডে জড়ানো হয়। চাকা ও অক্ষদণ্ডের ব্যাসার্ধের অনুপাতের ওপর এর যান্ত্রিক সুবিধা নির্ভর করে। অর্থাৎ যদি চাকার ব্যাসার্ধ অক্ষদণ্ডের ব্যাসার্ধের ৬ গুণ হয় তবে ১ কিলোগ্রাম বল প্রয়োগ করে ৬ কিলোগ্রাম ভরের বস্তুকে উপরে উঠানো যাবে। তাহলে একটি ব্যাপার স্পষ্ট যে, চাকা অক্ষদণ্ডের যান্ত্রিক সুবিধা বৃদ্ধির জন্য এর চাকার ব্যাসার্ধ বেশি হওয়া প্রয়োজন। মোটরগাড়ির হুইল, স্ক্রু-ড্রাইভার ইত্যাদি চাকা-অক্ষদণ্ডের মতো কাজ করে।

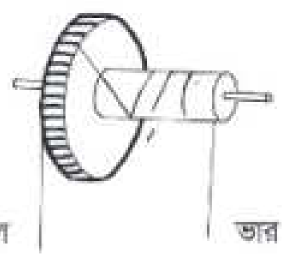

চিত্র ১১.১৪ : চাকা-অক্ষদণ্ড

কাজ : স্ক্রু ড্রাইভারের যান্ত্রিক সুবিধা নির্ণয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: ২টি ভিন্ন আকৃতির স্ক্রু ড্রাইভার, দুটি সমান লম্বা স্ক্রু ও নরম কাঠ।

পদ্ধতি : প্রথম অপেক্ষাকৃত সরু-হাতলের স্ক্রু ড্রাইভারটি দিয়ে একজন শিক্ষার্থী স্ক্রুকে ঢুকাও। এক্ষেত্রে হাতলকে পাঁচবার সম্পূর্ণভাবে ঘুরাবে। অনুরূপভাবে অপেক্ষকৃত মোটা হাতলের স্ক্রু ড্রাইভার দ্বারা ৫ বার ঘুরিয়ে দেখ। কোনো পার্থক্য দেখা যাচ্ছে? এই পার্থক্যই তোমাকে বলে দিবে স্ক্রু ড্রাইভারের যান্ত্রিক সুবিধা পেতে কী ধরনের স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করবে।

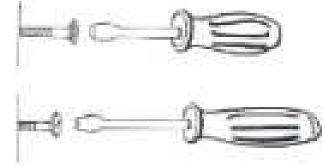

চিত্র ১১.১৫ : স্ক্রু ড্রাইভার

পাঠ ১২ : মানবদেহ ও সরলযন্ত্র

মানবদেহ একটি জটিল যন্ত্র। এর কোনো কোনো অঙ্গ সরলযন্ত্রের মতো কাজ করে থাকে। মূলত আমাদের শরীরের বেশ কিছু অঙ্গ লিভারের নীতি অনুসরণ করে কাজ করে থাকে। নিচে এমন তিনটি অঙ্গের সাথে পরিচিত হবে।

নিচের চিত্রগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কীভাবে মানুষের মুখের চোয়াল, পায়ের নিচের অংশ ও হাত সরল যন্ত্র হিসাবে কাজ করে। এবার চিন্তা কর কীভাবে এই অঙ্গগুলো ব্যবহার করে কাজ করলে কোনো কাজকে সহজে করা যাবে। তুমি কি এখন বলতে পারবে আমরা খাবার চিবানোর সময় সামনের দাঁত দিয়ে না চিবিয়ে কেন মাড়ির দাঁত দিয়ে চিবাই?

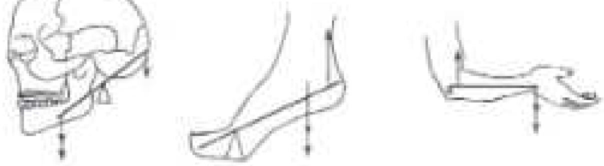

চিত্র ১১.১৫ : মানবদেহ ও সরল যন্ত্র

> কাজ : একটি পাথর (১ কেজির মতো) তোমার আঙুলের ডগা থেকে কুনই পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় রেখে অনুভব কর কেমন লাগছে। এর থেকে বুঝা যাবে হাতকে কীভাবে ব্যবহার করলে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যাবে।

নতুন শব্দ : স্থির বস্তু, গতিশীল বস্তু, যান্ত্রিক সুবিধা, ফালক্রাম, চাকা, অক্ষদণ্ড ও কপিকল।

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- বল প্রয়োগের ফলে বস্তুর অবস্থান, আকার, আকৃতি বা গতির পরিবর্তন হয় বা হতে পারে।
- সব সরল যন্ত্রেই কোনো একটি বিশেষ উপায়ে একটি কৌশল প্রয়োগ করা যায় যার দ্বারা ঐ যন্ত্র থেকে যান্ত্রিক সুবিধা আদায় করা যায়।
- লিভারের ক্ষেত্রে বলবাহু বা ভারবাহুর দৈর্ঘ্য কমিয়ে বা বাড়িয়ে যান্ত্রিক সুবিধা আদায় করা যায়।
- কোনো বস্তুকে হেলানো তল বরাবর একই উচ্চতায় উঠানোর জন্য যে কোনো তলের দৈর্ঘ্য যত বেশি হবে যান্ত্রিক সুবিধাও তত বেশি হবে।
- মানবদেহের বেশ কিছু অঙ্গ লিভারের নীতি অনুসারে কাজ করে থাকে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর।

১. বল কোনো স্থির বস্তুকে ------------------ এবং গতিশীল বস্তুকে ------------------ করে বা করতে চায়।

২. সরল যন্ত্রে ------------------ বল প্রয়োগ ------------------ কাজ করা যায়।

৩. প্রথম শ্রেণির লিভারে ------------------ থাকে বল ও ভারের মাঝখানে।

৪. জ্যাক স্ক্রু একই সাথে ------------------ ও ------------------ পরিবর্তন করে কাজকে সহজ করে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. দ্বিতীয় শ্রেণির লিভার কোনটি?

ক. কাঁচি
খ. সাঁড়াশি
গ. চিমটা
ঘ. বাঁতি

২. হেলানো তল থেকে কীভাবে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়?

ক. দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে
খ. দৈর্ঘ্য কমিয়ে
গ. উচ্চতা বাড়িয়ে
ঘ. উচ্চতা কমিয়ে

চিত্রটির সাহায্যে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

চিত্র

৩. চিত্রে প্রদর্শিত যন্ত্রটির যান্ত্রিক সুবিধা কত?

ক. ৫
খ. ৪০
গ. ৬০
ঘ. ৫০০

৪. ভারবাহুর দৈর্ঘ্য ১৫ সে. মি বৃদ্ধি করা হলে যান্ত্রিক সুবিধা-

ক. কমবে
খ. বাড়বে
গ. সমান থাকবে
ঘ. ভারের পরিমাপের উপর নির্ভর করবে

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

ক. বল প্রয়োগে বস্তুর কী কী ধরনের পরিবর্তন হয়?

খ. কাঁচি থেকে কীভাবে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়?

গ. জ্যাক স্ক্রু কীভাবে কাজকে সহজ করে?

ঘ. স্ক্রু ড্রাইভারের হাতল কেমন হলে বেশি সুবিধা হয়?

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

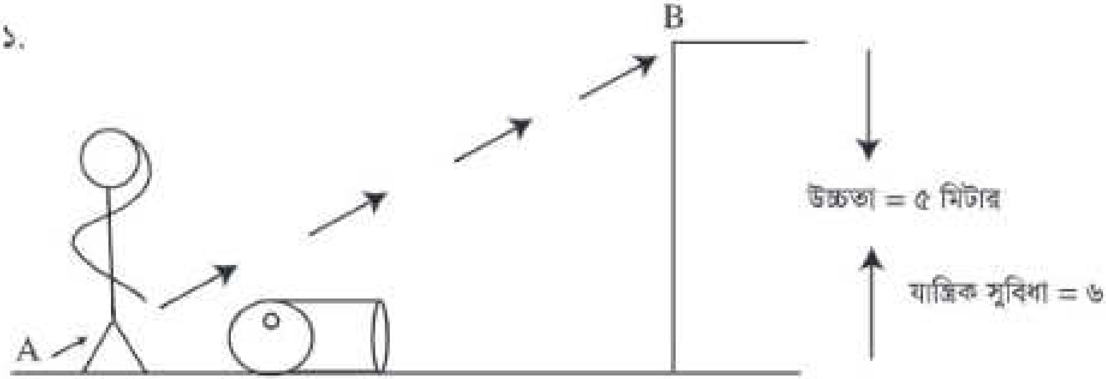

চিত্রে প্রদর্শিত লোকটি তেলের ড্রামটি উপরে তুলতে সমস্যায় পড়েছে। অথচ আশে পাশে কেউ নেই তাকে সাহায্য করার। শুধু লম্বা পাটাতন আছে। এমতাবস্থায় একাই কোনো না কোনোভাবে তাকে ড্রামটি উপরে তুলতে হবে।

ক. ফালক্রাম কী?

খ. সরলযন্ত্র কীভাবে কাজ করা সহজ করে?

গ. A থেকে B এর দূরত্ব নির্ণয় কর।

ঘ. লোকটি ড্রামটিকে তুলতে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করবে তার সুবিধা আলোচনা কর।

২. মণি ও শিল্পী স্টেপলার ব্যবহার করে তাদের কাগজ স্টেপল করছিল। মণি স্টেপলারের সামনের অংশে চাপ দিয়ে কাজ করছে। অন্যদিকে শিল্পী স্টেপলারের মাঝখানে চাপ দিয়ে কাজ করছে।

ক. লিভার কী?

খ. কীভাবে তৃতীয় শ্রেণির লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা বৃদ্ধি করা যায়?

গ. মণি ও শিল্পীর ব্যবহৃত যন্ত্রটির মূলনীতি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মণি ও শিল্পীর, কার কাজের ধরনের পরিবর্তন করলে কাজ করা আরও সহজ হবে বিশ্লেষণ কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

পৃথিবীর উৎপত্তি ও গঠন

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ চিন্তা করেছে কীভাবে পৃথিবী ও মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন সমাজে এ বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব ও কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। তবে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বেশির ভাগ বিজ্ঞানী এখন একটি তত্ত্বকে গ্রহণ করেন। এ তত্ত্বে বলা হয় যে, মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। এই মহাবিশ্বের একটি গ্রহ পৃথিবী। পৃথিবীর বাইরের দিকটি আমরা দেখতে পাই, কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন সহজে বোঝা যায় না। পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে ধারণা করা যায় ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত -এ ধরনের ঘটনা থেকে।

এই অধ্যায় শেষে আমরা

- পৃথিবীর উৎপত্তির ঘটনা বর্ণনা করতে পারব।
- পৃথিবীর গঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্রের পরিচয় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ভূমিকম্পের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১-২ : মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর উৎপত্তি

তোমরা জান, আমরা পৃথিবী পৃষ্ঠে বাস করি। আমরা উপরের দিকে তাকালে কী দেখতে পাই? দিনের বেলায় দেখি সূর্য। কখনও দেখি মেঘ। মেঘ না থাকলে রাতের আকাশে দেখি চাঁদ, নক্ষত্র বা তারা। কখনও কী প্রশ্ন জেগেছে মনে, এই পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হলো? সূর্য, তারা, চাঁদ এরা কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে?

চিত্র ১২.১ : মহাবিস্ফোরণ

বিভিন্ন সমাজে পৃথিবী ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব ও কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। যেমন প্রাচীন চীনের রূপকথায় বলা হয় যে, একটি বিশাল ডিম থেকে প্রথমে একটি দৈত্য জন্ম নেয়। সেই দৈত্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে এই মহাবিশ্বের সবকিছুর জন্ম। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণ ব্যবহার করে পৃথিবী ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, প্রায় ১৩৭০ কোটি বা ১৩.৭ বিলিয়ন বছর পূর্বে মহাবিশ্ব একটি অসীম ঘনত্বের ও প্রচণ্ড উত্তপ্ত বিন্দুতে ঘনীভূত ছিল যা বিস্ফোরিত হয়ে সকল দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এ বিস্ফোরণকে মহাবিস্ফোরণ বলা হয়। মহাবিস্ফোরণের পর অতি ক্ষুদ্র পদার্থ কণা তৈরি হয়। তারপর ছোট ছোট কণাগুলো কিছুটা ঠান্ডা ও একত্রিত হয়ে জ্যোতিষ্কে পরিণত হয়। এভাবে সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্র সৃষ্টি হয়। একদিকে তখন ছোটো ছোটো কণা মিলে জ্যোতিষ্ক সৃষ্টি হচ্ছিল। একই সাথে তখন মহাবিশ্ব আরও সম্প্রসারিত হচ্ছিল।

চিত্র ১২.২ : মহাবিশ্ব সম্প্রসারণের বেলুন মডেল

মহাবিশ্বের সকল শক্তি, পদার্থ, মহাকাশ সব কিছু এই বিস্ফোরণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। ধারণা করা হয় সূর্য যখন সৃষ্টি হয় তখন সূর্য যে ধূলিকণা ও গ্যাস থেকে তৈরি হয়েছিল তার কিছু অবশিষ্ট অংশ মহাকাশে ধূলিকণার মতো ভেসে বেড়িয়েছে। তারপর এখন থেকে প্রায় সাড়ে চার বিলিয়ন বছর পূর্বে এই ধূলিকণা একত্রিত হয়ে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে।

মহাবিস্ফোরণের সমর্থনে প্রমাণ : মহাবিশ্ব একটি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে তার পক্ষে অনেক তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। এর একটি প্রমাণ হলো, মহাবিশ্ব এখনও বিস্তৃত বা সম্প্রসারিত হচ্ছে। মহাকাশের গ্যালাক্সি/ছায়াপথ ও তারাসমূহ একে অপরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কাজেই ধারণা করা হয় যে সুদূর অতীতে এরা হয়তো একসময় একসাথে ক্ষুদ্র একটি জায়গায় ছিল; বিস্ফোরণের মাধ্যমে এরা আলাদা হয়েছে।

পাঠ ৩-৪ : সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্রের পরিচয়

তোমরা জেনেছ, আমরা যে সৌরজগতে বসবাস করি তা মিল্কিওয়ে (milky way) বা আকাশ গঙ্গা ছায়াপথের অংশ। আমাদের মিল্কিওয়ে ছায়াপথের একটি নক্ষত্র সূর্য। এটি একটি নক্ষত্র কারণ এর নিজের আলো আছে। সূর্য আসলে গ্যাসের একটি পিণ্ড। এই গ্যাসের পিণ্ডে হাইড্রোজেন ও অন্যান্য গ্যাস মহাকর্ষ বলের সাহায্যে একত্র হয়ে থাকে। হাইড্রোজেন গ্যাস পরস্পরের সাথে যুক্ত হওয়ার সময় প্রচুর তাপ ও আলো উৎপন্ন হয়। এরপর সেই তাপ ও আলো সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

সূর্য অনেক পরিমাণে তাপ ও আলো উৎপন্ন করে। তা থেকে কিছু পরিমাণ তাপ ও আলো আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়।

সূর্যকে কেন্দ্র করে মহাজাগতিক বস্তু ঘুরছে। সূর্য এবং একে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান সকল মহাজাগতিক বস্তু ও ফাঁকা জায়গা নিয়ে আমাদের সৌরজগত গঠিত। সৌরজগতের বেশির ভাগ জায়গাই ফাঁকা। সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, ইত্যাদি মহাজাগতিক বস্তু বা জ্যোতিক।

সূর্যকে কেন্দ্র করে স্বাধীনভাবে ঘুরছে আটটি গ্রহ। পৃথিবী এমনই একটি গ্রহ। পৃথিবীর আকৃতি গোলকের মতো। পৃথিবীতে বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ রয়েছে। কিন্তু পৃথিবী সূর্যের মতো তাপ ও আলো উৎপাদন করতে পারে না। তাই আলো ও তাপের জন্য পৃথিবী সূর্যের উপর নির্ভর করে। সূর্যের আলোকে ব্যবহার করে উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করে। উদ্ভিদের তৈরি খাদ্যের উপর নির্ভর করে প্রাণীরা বেঁচে আছে। সূর্য থেকে তাপ আসে বলে পৃথিবী খুব ঠাণ্ডা হয়ে যায় না। এভাবে সূর্যের আলো ও তাপ পৃথিবীতে জীবদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

আমাদের পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে। তেমনি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে চাঁদ। চাঁদকে পৃথিবীর উপগ্রহ বলা হয়। চাঁদ নিজে তাপ বা আলো উৎপন্ন করতে পারে না। তাহলে চাঁদকে আমরা আলোকিত দেখি কেন? আসলে সূর্যের আলো চাঁদের পৃষ্ঠে পড়ে প্রতিফলিত হয়। তাই আমরা চাঁদকে আলোকিত দেখি। চাঁদ ২৭ দিন

৮ ঘণ্টায় একবার পৃথিবীকে ঘুরে আসে। চাঁদের পৃথিবীর আয়তনের পঞ্চাশ ভাগের একভাগ। সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড়ো। আকাশে তো সূর্য আর চাঁদকে প্রায় সমানই মনে হয়, তাই না? কেন এমন মনে হয়? সূর্য অনেক দূরে বলে একেও ছোটো দেখায়। আচ্ছা, সূর্য যদি একটা ফুটবলের মতো হয় তাহলে পৃথিবী কতটুকু?

চিত্র ১২.৩ : সূর্য ও পৃথিবীর আয়তনের তুলনা

পৃথিবী তাহলে হবে একটা বালুকণার সমান। সূর্যের ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের প্রায় ১০৯ গুণ বড়ো। আমরা দেখি পৃথিবী মানুষ ও অন্যান্য জীবের জন্য উপযোগী স্থান। পৃথিবীর বাইরে অন্য গ্রহে, নক্ষত্রে বা উপগ্রহে কি জীবেরা বাস করে? ছোটো, বড়ো বা যে কোনো ধরনের জীব? বিজ্ঞানীরা খুঁজছেন যে, অন্য কোথাও জীব আছে কিনা। কিন্তু এখন পর্যন্ত পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও জীবনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। কেন তাহলে শুধু পৃথিবীতেই জীবন আছে? পৃথিবীতে এমন কী আছে যে এখানে জীবেরা বাস করতে পারে?

ধারণা করা হয়, সূর্য যখন সৃষ্টি হয় তখন তার অবশিষ্ট অংশ মহাকাশে গ্যাসও ধূলিকণার মতো ভেসে বেড়িয়েছে। তার লক্ষ লক্ষ বছর পর এই ধূলিকণা একত্রিত হয়ে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। শুরুর দিকে পৃথিবী বেশ গরম ছিল। এত গরম ছিল যে, পৃথিবীপৃষ্ঠ টগবগ করে ফুটত। জীবনের জন্য যে তরল পানি দরকার তা ছিল না। বায়ুমণ্ডলে কোনো অক্সিজেন ছিল না। পৃথিবী এই অবস্থায় থাকলে কোন জীবের উদ্ভব হতো না।

ধূলিকণা একত্রিত হয়ে পৃথিবীর সৃষ্টি উত্তপ্ত পৃথিবী	→	ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে বায়ুমণ্ডল ও তরল পানির সৃষ্টি	→	বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি

প্রবাহচিত্র : পৃথিবীতে জীবের উপযোগী পরিবেশের বিকাশ

ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে তাপ সরে গিয়ে ঠান্ডা হয়েছে। ঠান্ডা হওয়ার সময় ভারি পদার্থগুলো পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে চলে গেছে। আর হালকা পদার্থগুলো পৃথিবী পৃষ্ঠের দিকে রয়ে গেছে। বিভিন্ন গ্যাস যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড, জলীয়বাষ্প, মিথেন, কার্বন মনোক্সাইড, ইত্যাদি বায়ুমণ্ডল গঠন করেছে। এরপর পৃথিবী আরও ঠান্ডা হয়ে জলীয়বাষ্প তরল পানি হয়ে সমুদ্র তৈরি করেছে। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেড়েছে। এসব উপাদান জীবনের জন্য প্রয়োজনীয়। এসব উপাদান পৃথিবীতে তৈরি হওয়ায় পৃথিবীতে জীবনের সৃষ্টি হয়েছে ও জীব টিকে থাকতে পারছে।

পাঠ ৫ : আমাদের বাসভূমি পৃথিবীর গঠন

তোমরা জেনেছ সৃষ্টির প্রথমদিকে পৃথিবী খুব গরম ছিল। তারপর ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়েছে। পৃথিবী তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত হয়। হালকা পদার্থ অর্থাৎ বায়বীয় পদার্থ সবচেয়ে বাইরের দিকের অংশ তৈরি করে। একে আমরা বলি বায়ুমণ্ডল। তারপর কিছুটা ভারি পদার্থগুলো তৈরি করেছে পৃথিবীর পৃষ্ঠ বা ভূপৃষ্ঠ। আর সবচেয়ে ভারি পদার্থগুলো মিলে তৈরি করেছে পৃথিবীর ভেতরের অংশ।

বায়ুমণ্ডল : যে বায়বীয় অংশটি পৃথিবীর পৃষ্ঠকে ঘিরে রেখেছে সেটিই বায়ুমণ্ডল। তোমরা জানো যে, বায়ুমণ্ডল মূলত নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়ে তৈরি। এছাড়াও জলীয়বাষ্প, ধূলিকণা, আর্গন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং আরও কিছু গ্যাস বায়ুমণ্ডলে রয়েছে। পৃথিবী সকল কিছুকে তার নিজের দিকে টানে। সেই টানের ফলে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসগুলোও পৃথিবীর পৃষ্ঠের কাছাকাছি থাকে। তাই ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুমণ্ডল ঘন হয়ে থাকে। ভূপৃষ্ঠ থেকে তোমরা যত উপরের দিকে যাবে, বায়ুমণ্ডলকে তত হালকা বা পাতলা পাবে। তাই তোমরা যদি পর্বতের চূড়ায় উঠতে চাও তবে শ্বাস নেওয়ার জন্য অক্সিজেন সাথে নিয়ে যেতে হবে।

ভূপৃষ্ঠ থেকে বারো কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলকে বলা হয় ট্রপোস্ফিয়ার। এই স্তরে বায়ুমণ্ডলের বেশির ভাগ গ্যাস ও মেঘ থাকে। তোমরা জেনেছ যে, মেঘ আসলে জলীয়বাষ্প দিয়ে তৈরি। ট্রপোস্ফিয়ারের ঠিক ওপরেই শুরু হয়েছে স্ট্রাটোস্ফিয়ার। এই স্তর ট্রপোস্ফিয়ারের ওপরে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরে রয়েছে ওজোন নামের একটি গ্যাস। এই গ্যাস সূর্যের ক্ষতিকারক অতিবেগুণী রশ্মি থেকে আমাদের রক্ষা করে। এই স্তর এবং এর উপরের দিকে গ্যাসগুলো খুব কম পরিমাণে আছে।

পাঠ ৬ : ভূ-পৃষ্ঠ

আমরা পৃথিবীর পৃষ্ঠের উপর বাস করি। পৃথিবী-পৃষ্ঠের ওপরে বায়ুমণ্ডল আর নিচের দিকে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ। আমরা পৃথিবী পৃষ্ঠকে কেমন দেখি? পৃথিবীর পৃষ্ঠের কোন অংশে নরম মাটি, কোন অংশে শক্ত পাথর আর কোন অংশ পানি দ্বারা আবৃত। পৃথিবী পৃষ্ঠ বা ভূপৃষ্ঠের চারভাগের প্রায় তিনভাগ জল আর একভাগ স্থল। পৃথিবীর একটি মানচিত্র দেখলেই তোমরা বিষয়টি বুঝবে। ভূপৃষ্ঠের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে আছে বিশাল বিশাল সাগর ও মহাসাগর। এছাড়া আছে লেক বা হ্রদ, নদী, খাল-বিল ইত্যাদি।

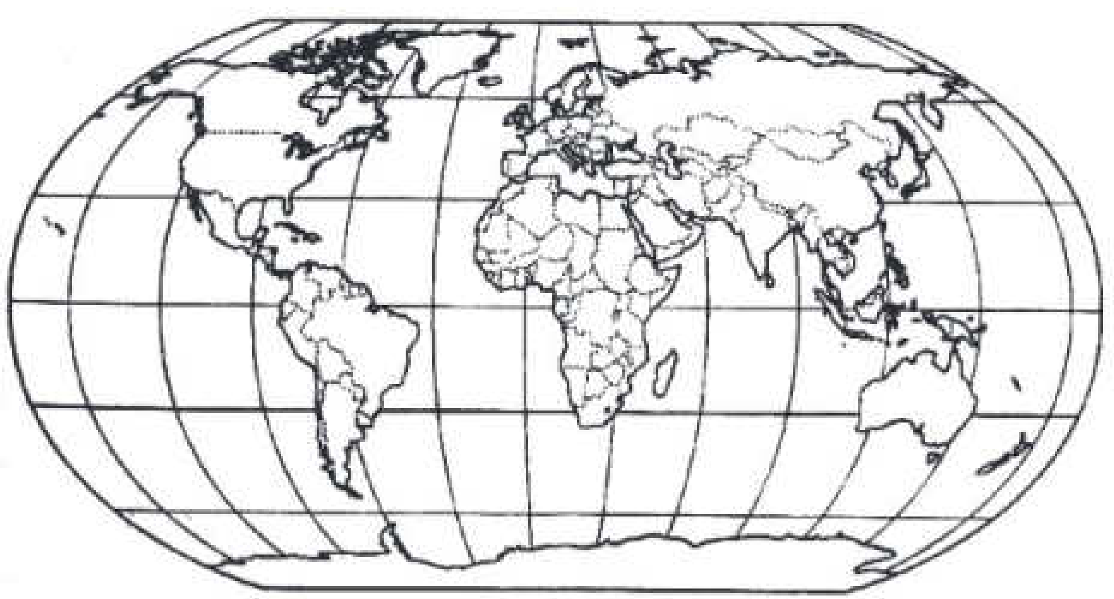

চিত্র ১২.৪ : পৃথিবীর মানচিত্র

বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগরের অংশ। অন্য মহাসাগরগুলো হচ্ছে প্রশান্ত, আটলান্টিক, উত্তর ও দক্ষিণ মহাসাগর। সাগরের পানিতে প্রচুর মাছসহ নানা জীব বাস করে। সাগরের পানির উপর দিয়ে চলে মালবাহী জাহাজ।

তোমরা জানো যে, বৃষ্টি ও বরফগলা পানি নদীতে প্রবাহিত হয়ে সাগরে গিয়ে পড়ে। নদী কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে?

আসলে বরফ গলা পানি ও বৃষ্টির পানি ঢাল বেয়ে নিচে প্রবাহিত হয়ে নদীর সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশের উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা অবস্থিত। এই পর্বতমালার চূড়ায় অনেক বরফ জমা আছে। এই বরফগলা পানি যখন পর্বতের গা বেয়ে নেমে আসে তখন সরু নদীর সৃষ্টি হয়। এই সরু নদীর সাথে বৃষ্টির পানি যোগ হয়ে নদী বড় হতে থাকে। নেপাল, ভারত, ভুটান ও বাংলাদেশে বেশ বৃষ্টি হয়। হিমালয় পর্বতমালায় সৃষ্টি হওয়া নদীগুলো এই বৃষ্টির পানি প্রচুর পরিমাণে বহন করে। তাই পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদীগুলো বেশ বড়ো।

পাঠ-৭ : পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন

পৃথিবীর ভেতরের অংশ তিনটি ভাগে বিভক্ত। পৃথিবী পৃষ্ঠের নিচে পৃথিবীর অভ্যন্তরকে ঘিরে যে শক্ত স্তর রয়েছে তা শিলামণ্ডল। শিলামণ্ডল পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় সত্তর কিলোমিটার নিচ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকতে পারে। শিলামণ্ডলের নিচে গুরুমণ্ডল আর সবশেষে পৃথিবীর কেন্দ্রের চারদিকে কেন্দ্রমণ্ডল (চিত্র-১২.৫)। ধারণা করা হয় যে, পৃথিবী সৃষ্টির পর বাইরের অংশ অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে তাপ চলে যাওয়ায় ভূপৃষ্ঠ ঠান্ডা হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের দিক থেকে তাপ বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাই কেন্দ্রমণ্ডল ও গুরুমণ্ডল বেশ উত্তপ্ত।

পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু থেকে প্রায় ২৯০০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের গোলকাকার জায়গা হলো কেন্দ্রমণ্ডল। কেন্দ্রমণ্ডলে নিকেল, লোহা, সীসা ইত্যাদি ধাতু উত্তপ্ত অবস্থায় আছে। কেন্দ্রমণ্ডলের ভেতরের অংশে এরা কঠিন কিন্তু বাইরের দিকে এরা গলিত অবস্থায় আছে। কেন্দ্রমণ্ডল ও শিলামণ্ডলের মাঝে রয়েছে গুরুমণ্ডল। গুরুমণ্ডলের বেশির ভাগই কঠিন। কিন্তু এর কিছু অংশে আধা-গলিত অবস্থায় আছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, আগ্নেয়গিরির উদগীরণে এই অংশটি থেকে গলিত লাভা বের হয়ে আসে।

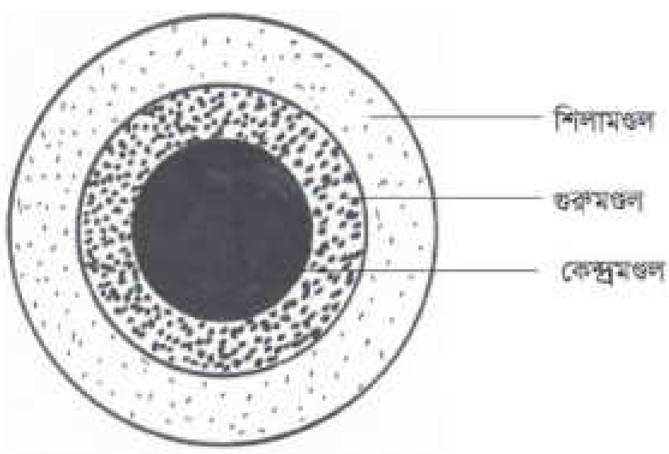

চিত্র ১২.৫ : পৃথিবীর অভ্যন্তরের তিনটি মূল ভাগ

পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে নিচে বেশি দূর পর্যন্ত যাওয়া যায় না। তবে বিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। তোমরা বড়ো হয়ে কেন্দ্রমণ্ডল ও গুরুমণ্ডল সম্পর্কে আরও জানবে। তোমরা এই শ্রেণিতে কিছুটা জানবে শিলামণ্ডল সম্পর্কে।

পাঠ ৮ : প্লেট টেকটোনিক এবং আগ্নেয়গিরির উদগীরণ ও ভূমিকম্প

মানুষ সবসময়ই জানতে চেয়েছে কেন ভূমিকম্প হয়? জানতে চেয়েছে কেন আগ্নেয়গিরির উদগীরণ হয় অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের কোনো কোনো জায়গা দিয়ে ভীষণ উত্তপ্ত তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ বেরিয়ে আসে? বিভিন্ন বিজ্ঞানী, বিভিন্ন তত্ত্বের মাধ্যমে এগুলোকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। কিন্তু কোনো ব্যাখ্যাই সেভাবে গ্রহণযোগ্য হয়নি। শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা প্লেট টেকটোনিক তত্ত্ব নামে একটি তত্ত্ব নিয়ে আসেন। এই তত্ত্ব দ্বারা ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির উদগীরণ ব্যাখ্যা করা যায়। তাই এ তত্ত্ব সকলের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

প্লেট টেকটোনিক তত্ত্ব : এই তত্ত্বের মূল ধারণা হলো, ভূপৃষ্ঠের নিচে পৃথিবীর শিলামণ্ডল কতগুলো অংশে বা খণ্ডে বিভক্ত। এগুলোকে প্লেট বলা হয়। এই প্লেটগুলো গুরুমণ্ডলের আংশিক তরল অংশের উপরে ভাসমান অবস্থায় আছে। এই প্লেটগুলো প্রতিবছরে কোনো একদিকে কয়েক সেন্টিমিটার সরে যায়। প্লেটগুলো কখনো একটি থেকে আরেকটি দূরে সরে যায়। আবার কখনো কখনো একে অন্যের দিকে আসে। কখনো কখনো প্লেটগুলো বছরে কয়েক মিলিমিটার উপরে ওঠে বা নিচে নামে। একটি প্লেটের সাথে আরেকটি প্লেট যেখানে মেশে সেখানেই বেশি ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির উদগীরণের ঘটনা ঘটে। প্লেটগুলোর সংযোগস্থলে উঁচু পর্বত থাকলে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির উদগীরণের ঘটনা আরও বাড়ে।

ধারণা করা হয়, প্লেটগুলো একটি আরেকটির সাথে ঘষা বা ধাক্কা খেলে সেখানে প্রচুর তাপ সৃষ্টি হয়। এই তাপে ভূ-অভ্যন্তরের পদার্থ গলে যায়। এ গলিত পদার্থ চাপের ফলে নিচ থেকে ভূপৃষ্ঠ ভেদ করে বেরিয়ে আসে। একেই আগ্নেয়গিরির উদগীরণ বলে। ভূঅভ্যন্তরে উত্তপ্ত ও গলিত শিলা ম্যাগমা নামে পরিচিত এবং বেরিয়ে আসা গলিত তরল পদার্থকে লাভা বলে। একইভাবে প্লেটগুলো একটি অন্যটির সাথে ধাক্কা খেলে পৃথিবী কেঁপে ওঠে। একেই ভূমিকম্প বলে। আজকাল বাংলাদেশেও ভূমিকম্প সংঘটিত হচ্ছে।

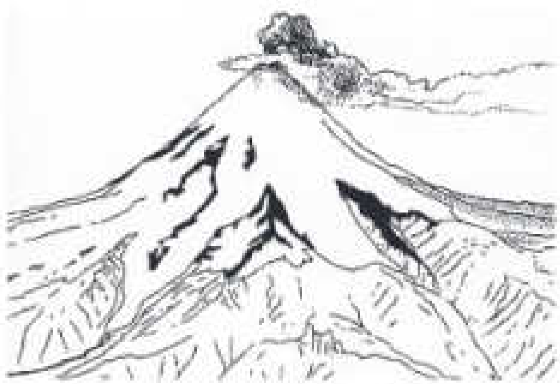

চিত্র ১২.৬ : আগ্নেয়গিরি ও নির্গত লাভা

পাঠ ৯-১০ : ভূ-ত্বক ও মাটি

শিলামণ্ডলের উপরের দিকের অংশ ভূত্বক নামে পরিচিত। ভূত্বক হয় পানি নয়ত মাটি দ্বারা আবৃত। ভূত্বকের বেশির ভাগ পানি দ্বারা আবৃত। বাকি অংশটি গুড়ো বা ভাঙা পাথুরে পদার্থ দ্বারা আবৃত। এ মাটি সাধারণত জৈবপদার্থ দ্বারা গঠিত ও নরম হয় তাহলে তাকে মাটি বলা হয়। ভূত্বক মানুষের জন্য পৃথিবীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ অংশের উপরে আমরা বসবাস করি। মাটিতে প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করি। এছাড়াও এ অংশে রয়েছে খনিজ পদার্থ যা আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি।

মাটি গঠন প্রক্রিয়া : সাধারণত পাথর, নুড়ি, কাঁকর, বালি, কাদা ইত্যাদি দ্বারা ভূত্বক গঠিত। এদের সাথে মিশে থাকে মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহের অংশ। ভূত্বক গঠনকারী এসকল কঠিন পদার্থের সাধারণ নাম শিলা। কঠিন শিলা থেকে নরম মাটি তৈরি হয় সাধারণত দু'টি পর্যায়ে :

১. **প্রথম পর্যায় :** কঠিন শিলা দীর্ঘদিন ধরে রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি কারণে ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পরিণত হয়। এছাড়া বায়ু, বরফ বা পানির প্রবাহ ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণে অন্য জায়গা থেকে ক্ষুদ্র শিলাকণা এসে একটি স্থানে জমা হয়।

২. **দ্বিতীয় পর্যায় :** ক্ষুদ্র শিলাকণার সাথে পানি, বায়ু, ক্ষুদ্র জীব যেমন ব্যাকটেরিয়া, পচা ও মৃত জীবের দেহাবশেষ যোগ হয়।

বিভিন্ন স্থানের মাটি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়েছে। তাই বিভিন্ন স্থানের মাটি দেখতে ভিন্ন ভিন্ন, গঠনেও ভিন্ন। তবে মাটির উপরিভাগ থেকে নিচের দিকে অনুসন্ধান করলে সাধারণভাবে কয়েকটি স্তর দেখা যায়। চিত্রে যেমন দেখা যাচ্ছে, তেমনি মাটির একদম উপরের স্তরটিতে পচা ও মৃত জীবদেহ মিশে থাকে। পচা ও মৃত জীবদেহ মিশে তৈরি কালো বা অনুজ্জ্বল উপাদানকে হিউমাস বলে। মাটির উপরের দিকে হিউমাস বেশি থাকে। এই হিউমাস থেকে উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পায়। দ্বিতীয় স্তরে হিউমাস কমে আসে, এ জন্য কম কালো বা কিছুটা উজ্জ্বল হয়। তৃতীয় স্তর মূলত ক্ষুদ্র শিলাকণা দ্বারা গঠিত। সবশেষে নিচের স্তরটি কেবল শিলাখণ্ড দ্বারা গঠিত।

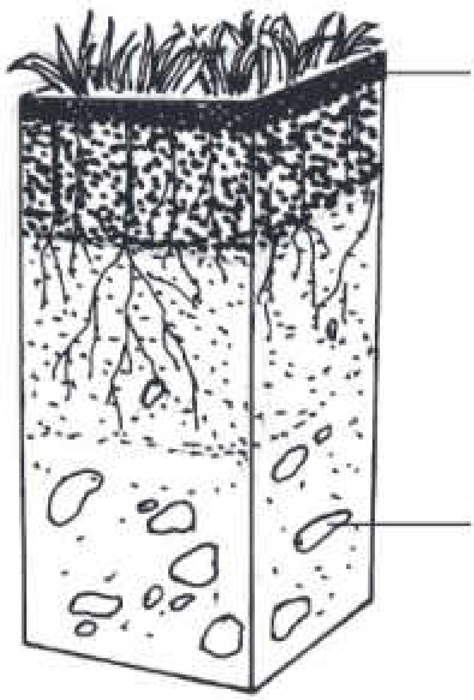

চিত্র ১২.৭: মাটির গঠন

বাংলাদেশে নদীর কাছাকাছি স্থানে বন্যা হয়। বন্যার পানি পলিমাটি বয়ে আনে। নদীর কাছাকাছি এসব স্থানের মাটির উপরিভাগ পলিমাটি দ্বারা গঠিত। এসব স্থানের মাটির উপরের স্তর সেজন্য খুব পুরনো হয় না। এ মাটি ফসল চাষের জন্য খুব উপযোগী।

খনিজ পদার্থ

আগেই বলা হয়েছে যে, ভূত্বক বিভিন্ন পদার্থ দ্বারা গঠিত। এর কিছু অংশে জৈবপদার্থ দিয়ে গড়া। আরও আছে অজৈব পদার্থ। অজৈব অংশের মধ্যে অনেক সময় একাধিক পদার্থ মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। কখনো একটি অজৈব পদার্থ মিশ্রিত অবস্থায় না থেকে আলাদা থাকে। এরূপ অজৈব পদার্থকে খনিজ পদার্থ বলে। খনিজ পদার্থের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এদেরকে মানুষ তৈরি করে না, এদেরকে প্রকৃতিতেই পাওয়া যায়। চুনাপাথর একটি খনিজ পদার্থ। চুনাপাথর আসলে ক্যালসিয়াম কার্বনেট নামের একটি পদার্থ। বাংলাদেশের জয়পুরহাটে ও সিলেটে চুনাপাথর পাওয়া যায়। চুনাপাথর থেকে সিমেন্ট তৈরি হয়। সাধারণত মাটির নিচের দিকে খনিজসম্পদ বেশি পাওয়া যায়। কখনও কখনও এরা উপরের মাটির সাথেও মিশে থাকে। দরকারি অনেক খনিজসম্পদ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। দালান তৈরিতে যে রড ব্যবহার করা হয় তা লোহার তৈরি। গাড়ি, বাস, লঞ্চ এগুলোও তৈরি হয় লোহা থেকে।

টিউবওয়েল, লাঙলের ফলা, পেরেক/তারকাঁটা, যন্ত্রপাতি এগুলোও লোহা থেকে তৈরি। লোহা মাটিতে খনিজ হিসেবে পাওয়া যায়। কিছু হাঁড়ি-পাতিল, চামচ তৈরি হয় অ্যালুমিনিয়াম থেকে। লোহার মতো অলুমিনিয়ামও মাটিতে খনিজ হিসেবে পাওয়া যায়। তামা, রুপা, সোনা, দস্তা এসব দরকারি ও দামি পদার্থও মাটিতে খনিজ হিসেবে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে অবশ্য এসব খনিজসম্পদ বেশি পরিমাণে নেই।

কয়লা, পেট্রোলিয়াম বা প্রাকৃতিক গ্যাস মাটির নিচে পাওয়া গেলেও এদেরকে খনিজ পদার্থ বলা হয় না। কারণ এরা জীবদেহ থেকে তৈরি, এরা অজৈব নয়। বড়ো বড়ো গাছ মাটির নিচে চাপা পড়ে দীর্ঘ সময়ে এরা কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসে পরিণত হয়েছে। জীবদেহ থেকে তৈরি এবং জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে এদেরকে জীবাশ্ম জ্বালানি বলা হয়। আমাদের দেশে মাটির নিচে বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা পাওয়া যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও পেট্রোলিয়াম জ্বালানি হিসেবে বেশ ভালো। এগুলো পুড়িয়ে যে তাপ পাওয়া যায় তাতে কলকারখানা চলে, যানবাহন চলে, বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় এবং রান্না করা হয়। এগুলো থেকে বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্যও তৈরি করা হয়। যেমন: প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে ইউরিয়া সার তৈরি করা হয়। পেট্রোলিয়াম থেকে পলিথিন তৈরি করা হয়।

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- কোটি কোটি বছর আগে একটি মহাবিস্ফোরণ থেকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে।
- সূর্য একটি নক্ষত্র। সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে পৃথিবী ও আরও সাতটি গ্রহ। পৃথিবীর একটি উপগ্রহ হলো চাঁদ।
- সৃষ্টির সময়ে পৃথিবী খুব গরম ছিল। ধীরে ধীরে এটি ঠান্ডা হয়ে জীবের বাসের উপযোগী হয়েছে। পৃথিবীতে পানি ও নানা রকম গ্যাস আছে বলে জীবনের সৃষ্টি হয়েছে।
- পৃথিবীর তিনটি অংশ- বায়ুমণ্ডল, ভূপৃষ্ঠ ও ভেতরের অংশ। বায়ুমণ্ডলে রয়েছে নানা গ্যাস। ভূপৃষ্ঠ ঢাকা আছে পানি, মাটি ও শিলা দ্বারা।
- বরফগলা পানি ও বৃষ্টির পানি ঢাল বেয়ে নিচে প্রবাহিত হওয়ার ফলে নদীর সৃষ্টি হয়েছে।
- পৃথিবীর ভেতরের অংশ বা অভ্যন্তর আবার তিনটি ভাগে বিভক্ত। পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আছে কেন্দ্রমণ্ডল, মাঝখানে গুরুমণ্ডল আর উপরের দিকে শিলামণ্ডল।
- শিলামণ্ডল কতগুলো প্লেটে বিভক্ত। এই প্লেটগুলোর নড়াচড়ার কারণে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়।
- কঠিন শিলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সাথে পানি, বায়ু, ব্যাকটেরিয়া, পচা ও মৃত জীবের দেহাবশেষ মিলে মাটি তৈরি হয়।
- মাটির নিচে রয়েছে অনেক দরকারি পদার্থ। এদের মধ্যে অজৈব পদার্থকে বলে খনিজ পদার্থ। এছাড়া রয়েছে পেট্রোলিয়াম, কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস, ইত্যাদি জীবাশ্ম জ্বালানি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের কোথায় চুনাপাথর পাওয়া যায়?

ক. ঢাকায় খ. সিলেটে

গ. বরিশালে ঘ. খুলনায়

২. কয়লা ও পেট্রোলিয়ামকে জীবাশ্ম জ্বালানি বলা হয়। কারণ এগুলো-

i. জৈবপদার্থ

ii. অজৈব পদার্থ

iii. জীবদেহ হতে তৈরি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্র থেকে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

মাটির বিভিন্ন স্তর

৩. চিত্রে প্রদর্শিত কোন স্তরের মাটি কম কালো এবং উজ্জ্বল হয়?

ক. ১ম স্তর খ. ২য় স্তর

গ. ৩য় স্তর ঘ. ৪র্থ স্তর

৪. ১ম স্তরটি গঠিত হয়-

i. শিলাকণা দিয়ে

ii. হিউমাস দিয়ে

iii. পচা ও মৃত জীবদেহ দিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

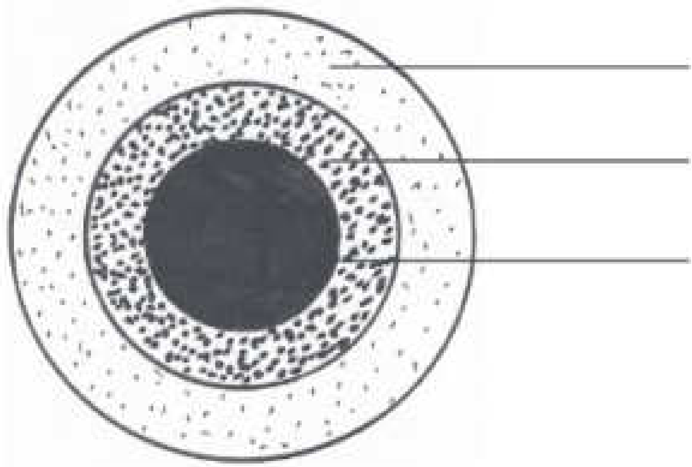

চিত্র ১২.৮: পৃথিবীর অভ্যন্তরের তিনটি মূল ভাগ বা স্তর

১. ক. ভূত্বক কী?

খ. আগ্নেয়গিরির উদগীরণ বলতে কী বুঝায়?

গ. R অংশটির গঠন বর্ণনা কর।

ঘ. P ও Q এর যে স্তরটি মাটি গঠন করে তা বিশ্লেষণ কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

খাদ্য ও পুষ্টি

আমরা পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যবস্তু দেখতে পাই। এই খাদ্য বস্তুগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-অজৈব ও জৈববস্তু। শর্করা, প্রোটিন, চর্বি বা স্নেহ ইত্যাদি আমরা জীব থেকে পাই। এগুলো জৈববস্তু। এ বস্তুগুলো আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি। খাদ্য ও পুষ্টির সাথে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। পুষ্টি হচ্ছে প্রতিদিনের একটি প্রক্রিয়া, যা জটিল খাদ্যকে ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত হয়ে দেহের গ্রহণ উপযোগী হয়। এ অধ্যায়ে আমরা খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে বিশদ জানতে পারব।

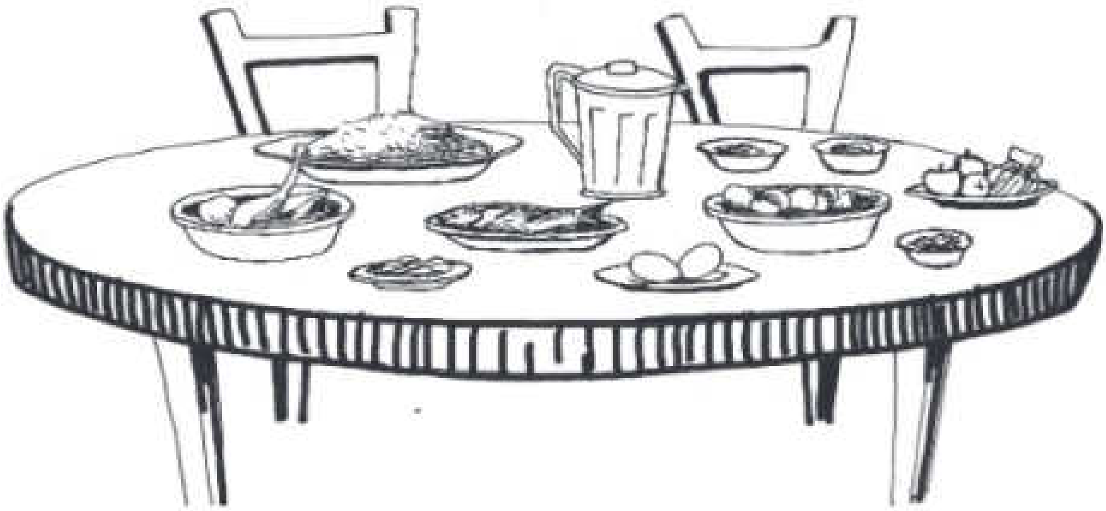

এই অধ্যায় শেষে আমরা

- খাদ্য ও পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- সুষম খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করতে পারব।

পাঠ-১ : খাদ্য ও পুষ্টি

খাদ্য কী? হাঁটা চলা, বাগানে কাজ করা, কুয়া থেকে পানি তোলা, কাঠ কাটা, মাছ ধরা, সাঁতার কাটা বা ফুটবল খেলা ইত্যাদি কাজ করার পর আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি এবং আমাদের ক্ষুধা পায়। আমরা তখন কী করি? আমরা খাবার খাই। খাবার খাওয়ার পর আমরা কী রকম বোধ করি? শক্তি ফিরে পাই। খাদ্য আমাদের শক্তি দেয় ও কাজ করার ক্ষমতা জোগায়।

মানবদেহের গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, কাজের ক্ষমতা অর্জন, শারীরিক সুস্থতা ইত্যাদির জন্য খাদ্য প্রয়োজন। দেহের কাজকর্ম সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত করে, দেহকে সুস্থ ও কাজের উপযোগী রাখার জন্য যে সকল উপাদান প্রয়োজন, সেসব উপাদান বিশিষ্ট বস্তুই খাদ্য।

খাদ্য আমাদের শক্তি জোগায়, ক্ষয়পূরণ করে ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। আমরা বেঁচে থাকার জন্য খাবার খাই।

পুষ্টি কী?

আমরা প্রতিদিন আমাদের চাহিদামতো চাল, ডাল, আটা, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, তরিতরকারি ও কাঁচা ফলমূল খেয়ে থাকি। এ খাবারগুলো সরাসরি আমাদের দেহ গ্রহণ করতে পারে না। এই জটিল উপাদান সমৃদ্ধ খাবারগুলো আমাদের পৌষ্টিকতন্ত্রে পরিপাক বা হজম হয়ে দেহে গ্রহণের জন্য শোষণ উপযোগী সরল উপাদানে পরিণত হয়। রক্তের মাধ্যমে জীবকোষ এই সরল উপাদানগুলো শোষণ করে নেয়। এই পরিশোষিত ও দেহকোষে জমাকৃত খাদ্য উপাদান দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, শক্তি উৎপাদন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় পুষ্টি। খাদ্য আমাদের ক্ষুধা নিবারণ করে ও কাজ করার শক্তি জোগায়। আমাদের দেহে খাদ্যের নানা রকম কাজ রয়েছে। যেমন : তাপ উৎপাদন, দেহের ক্ষয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন।

নতুন শব্দ : পুষ্টি ও খাদ্য উপাদান।

পাঠ-২ : খাদ্যের প্রকারভেদ

মৌটুসী আমড়া, পেয়ারা, কামরাঙ্গা খেতে পছন্দ করে, রবিনের পছন্দ মাছ, মাংস, মিষ্টি আর তুলির পছন্দ পাউরুটি, বিস্কুট, চিপ্‌স ইত্যাদি। এ খাবারগুলো ভিন্ন স্বাদ ও গুণাগুণের দিক থেকে আলাদা। স্বাদ ও গুণাগুণ বিচারে খাদ্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : শর্করা, প্রোটিন বা আমিষ, ও স্নেহজাতীয় খাদ্য। এ তিন প্রকার খাদ্য আমাদের দেহগঠন, ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও শক্তি জোগায়। এছাড়া খনিজ লবণ, ভিটামিন ও পানি হলো আরো তিন প্রকার খাদ্য উপাদান। এ উপাদানগুলো দেহকে রোগমুক্ত ও সবল রাখার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

শর্করা

যেসব খাবারে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকে তাকে শর্করা জাতীয় খাদ্য বলে। যেমন : চাল, আটা, ময়দা, ভুট্টা, চিনি, গুড় ইত্যাদি। কেবলমাত্র উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে আমরা শর্করা পেয়ে থাকি। দৈনন্দিন জীবনে আমরা এ জাতীয় খাদ্যই বেশি খাই। আয়োডিন দ্রবণ ব্যবহার করে কোনো খাদ্যে শর্করা আছে কি না তা নির্ণয় করা যায়। শর্করা আয়োডিন দ্রবণের রঙের পরিবর্তন করে।

চিত্র ১৩.১ : শর্করা জাতীয় খাদ্য

শর্করার কাজ

১. শর্করা সহজে হজম হয়, দেহের কাজ করার শক্তি জোগায় ও তাপ উৎপন্ন করে।
২. শর্করায় বিদ্যমান সেলুলোজ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

> **কাজ :** শর্করা চেনার উপায় পরীক্ষণের জন্য একটি টেস্টটিউবে অথবা কাচপাত্রে সামান্য পরিমাণে আটা গুলে নাও। মিশ্রণটি টেস্টটিউবে নিয়ে জ্বলন্ত স্পিরিট ল্যাম্পের উপর ধর। মিশ্রণটি গরম হলে, ঐ মিশ্রণে দুই ফোঁটা পাতলা আয়োডিন দ্রবণ ভালো করে মিশিয়ে নাও।

দেখ কী ঘটে? মিশ্রণটিতে কোন পরিবর্তন লক্ষ করছ কী? মিশ্রণটি গাঢ় বেগুনি বর্ণ ধারণ করেছে। অতএব আটা শর্করা জাতীয় খাদ্য। মিশ্রণে বা খাদ্যে শর্করা থাকার কারণে আয়োডিনের রঙের পরিবর্তন ঘটেছে।

নতুন শব্দ : সেলুলোজ, কোষ্ঠকাঠিন্য ও প্রোটিন।

পাঠ-৩ : প্রোটিন বা আমিষ

রহিম সাহেবের বড়ো ছেলে শাহিনের পছন্দ মাছ ও ডিম, আর ছোটো ছেলে কবিরের পছন্দ মাংস ও দুগ্ধজাত খাদ্য। এগুলো কী জাতীয় খাদ্য? এগুলো প্রোটিন জাতীয় খাদ্য। উৎসের উপর ভিত্তি করে প্রোটিনকে প্রাণিজ এবং উদ্ভিজ প্রোটিন হিসেবে উল্লেখ করা হয়। মাছ, মাংস, ডিম ও দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রোটিনের উৎস প্রাণী, তাই এগুলো প্রাণিজ প্রোটিন। অপরদিকে ডাল, বাদাম, শিম ও বরবটির বীজ ইত্যাদির উৎস উদ্ভিদ, এগুলো উদ্ভিজ্জ প্রোটিন।

প্রোটিনের কাজ

১. প্রোটিনের প্রধান কাজ হচ্ছে দেহে বৃদ্ধির জন্য কোষ গঠন করা। যেমন- দেহের পেশি, হাড় বা অস্থি, রক্ত কণিকা ইত্যাদি প্রোটিন দ্বারা গঠিত।
২. দেহে শক্তি উৎপন্ন করা।
৩. দেহে রোগ প্রতিরোধকারী এন্টিবডি প্রোটিন থেকে তৈরি হয়।

চিত্র ১৩.২ : প্রোটিন

শিশুদের খাদ্যে প্রোটিনের অভাব ঘটলে কোয়াশিয়রকর রোগ হয়। এ রোগের কারণে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও গঠন বাধাগ্রস্ত হয়। শিশুদেহের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হলে শিশু পুষ্টিহীনতা বা অপুষ্টিতে ভোগে।

> **কাজ :** একটি টেস্টটিউবে সামান্য পানি নাও। এর ভিতরে ডিমের সাদা তরল অংশ ঢেলে দাও। এবার মিশ্রণটি স্পিরিট ল্যাম্পের আগুনে গরম কর।

তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ? ডিমের সাদা অংশটি শক্ত হয়ে গেছে। তরল প্রোটিন উত্তাপে শক্ত হয়ে যায়।

নতুন শব্দ : রক্তকণিকা, উদ্ভিজ্জ প্রোটিন ও প্রাণিজ প্রোটিন।

পাঠ ৪-৫ : স্নেহ বা চর্বি জাতীয় খাদ্য ও ক্যালরি

যেসব খাদ্যে তেল বা চর্বি জাতীয় উপাদান বেশি থাকে, এদেরকে স্নেহ জাতীয় খাদ্য বলে। প্রোটিনের মতো স্নেহ জাতীয় খাদ্য দুই প্রকার। মাছের তেল, মাংসের চর্বি, ঘি, মাখন ইত্যাদি প্রাণী থেকে পাই, এসব প্রাণিজ স্নেহ। সয়াবিন, বাদাম, সরিষা, তিল, জলপাই ইত্যাদির তেল উদ্ভিজ স্নেহ। মাংসের চর্বি, ঘি ও মাখন ইত্যাদি জমাট স্নেহ। সয়াবিন, সরিষা, তিল, জলপাই, বাদাম ইত্যাদির তেল তরল স্নেহ।

স্নেহ বা চর্বির কাজ

১. দেহের তাপ ও কর্মশক্তি বাড়ায়, ত্বকের নিচের চর্বিস্তরে দেহের তাপ ধরে রাখতে সাহায্য করে।
২. দেহের প্রোটিনকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করে।
৩. দেহে ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে-এর জোগান দেয়।

চিত্র ১৩.৩ : স্নেহ জাতীয় খাদ্য

> কাজ : স্নেহ পদার্থ চেনার পরীক্ষণের জন্য এক টুকরো সাদা কাগজের উপর কয়েক ফোঁটা সয়াবিন তেল ফেলে কাগজের উপর ঘষে নাও। এবার আলোর দিকে কাগজটি ধর। কাগজের যে জায়গায় তেলের ফোঁটা ফেলা হয়েছে সে জায়গাটি স্বচ্ছ মনে হচ্ছে কী?

কাগজের উপরের স্বচ্ছ জায়গাটির ভেতর দিয়ে সামান্য আলো প্রবেশ করছে। এটা তেল বা চর্বি চেনার একটি সহজ পদ্ধতি।

ক্যালরি কী?

১ গ্রাম পানির তাপমাত্রা ১° সেলসিয়াস বাড়াতে প্রয়োজনীয় তাপ হচ্ছে ১ ক্যালরি। ১০০০ ক্যালরি = ১ কিলোক্যালরি। শর্করা, প্রোটিন ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য উপাদান থেকে দেহে তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপ আমাদের দেহের ভিতরে খাদ্যের পরিপাক, বিপাক, শ্বাসকার্য, রক্তসঞ্চালন ইত্যাদি কাজে সাহায্য করে। শারীরিক পরিশ্রমে শক্তি ব্যয় হয়। খাদ্যে শক্তি সঞ্চিত থাকে। আমরা খাবার থেকেই শক্তি পাই। খাদ্যের তাপশক্তি মাপার একক হলো কিলোক্যালরি।

যেসব খাদ্যে শর্করা, প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থ থাকে, সেসব খাদ্য থেকে বেশি ক্যালরি পাওয়া যায়। যেসব খাদ্যে পানি ও সেলুলোজের পরিমাণ বেশি থাকে, সেসব খাদ্যে ক্যালরির পরিমাণ কম থাকে। তেল বা চর্বি জাতীয় পদার্থে ক্যালরির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে।

নিচের সারণিটি দেখ। এতে কয়েকটি উচ্চ ও নিম্ন ক্যালরিযুক্ত খাদ্যের তালিকা দেখানো হলো :

উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাদ্য	নিম্ন ক্যালরিযুক্ত খাদ্য
ভোজ্যতেল	চাল কুমড়া
ঘি	বাধাকপি
মাখন	ঝিঙা
মাছের তেল	শালগম
ঘন নারকেলের দুধ	টমেটো
মাখন তোলা গুঁড়া দুধ	ডাঁটা
ভাজা চিনা বাদাম	লাউ
চিনি	পালংশাক
মধু	কলমি ডাঁটা
খেজুরের গুড়	মূলা
ছোলার ডাল	ওলকপি
সয়াবিন	ধুন্দল
শিমের বিচি	পটল

প্রতিদিন কার কত ক্যালরি বা তাপশক্তি প্রয়োজন তা নির্ভর করে প্রধানত বয়স, ওজন, দৈহিক উচ্চতা ও পরিশ্রমের ধরনের উপর।

> **কাজ :** তোমার এলাকায় পাওয়া যায় এমন সব কম ক্যালরিযুক্ত ও বেশি ক্যালরিযুক্ত খাবারের নমুনা ও তালিকার একটি চার্ট তৈরি কর।

নতুন শব্দ : ক্যালরি, প্রাণিজ স্নেহ ও উদ্ভিজ্জ স্নেহ।

পাঠ-৬ : ভিটামিন

খাদ্যে অতি সামান্য মাত্রায় এক প্রকার জৈব পদার্থ আছে, যা প্রাণীর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয়। এই প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থগুলোকে খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন বলে। আমরা প্রতিদিন যেসব খাদ্য (যেমন-চাল, আটা, বাদাম, ডাল, শাকসবজি, ফলমূল) খাই এর মধ্যেই ভিটামিন থাকে। ভিটামিন আলাদা কোনো খাদ্য নয়।

অনেক দিন ধরে দেহে কোনো ভিটামিনের অভাব ঘটলে নানা রকম রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। ভিটামিনযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করে নানা রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

চিত্র ১৩.৪ : কয়েকটি ভিটামিনসমৃদ্ধ শাকসবজি ও ফল

আমাদের দেহে ভিটামিনের ভূমিকা অপরিহার্য।

আমাদের প্রয়োজনীয় ভিটামিনগুলোর একটি তালিকা পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো। ছকে যে সমস্ত খাদ্যে ভিটামিন আছে তাদের নাম, উৎস, ভিটামিন গুলোর প্রয়োজনীয়তা ও বিবরণ দেওয়া হলো।

ভিটামিন	খাদ্যের উৎস	প্রয়োজনীয়তা
ভিটামিন -এ দেহে জমা থাকে	কলিজা, ডিম, মাখন, পনির, মাছ, টাটকা সবুজ শাকসবজি, গাজর, আম, কাঁঠাল ও পাকা পেঁপে।	দেহের বৃদ্ধি, দৃষ্টিশক্তি ও রোগ প্রতিরোধে।
ভিটামিন বি কমপ্লেক্স (বেশ কয়েকটি ভিটামিন একত্রে গঠিত। দেহে জমা থাকে না।)	ডিম, কলিজা, বৃক্ক, মাংস, দুধ, গম, লাল চাল, পনির, শিম ও বাদাম।	দেহের বৃদ্ধি, হৃদপিণ্ড, স্নায়ু এবং পরিপাক ব্যবস্থার সুষ্ঠু কাজ সম্পাদনে, চামড়ার স্বাস্থ্য রক্ষায়।
ভিটামিন -সি রন্ধনে অথবা মজুদ রাখলে নষ্ট হয়ে যায়।	লেবু, কমলা, আমলকী, পেয়ারা, জাম্বুরা, টমেটো, কচুশাক, কলমিশাক ও সবুজ শাক-সবজি।	সুস্থ-সবল হাড়, দাঁত, দাঁতের মাড়ি ও মুখের ক্ষত সারাতে।
ভিটামিন ডি (দেহে জমা থাকে)	দুধ, মাখন, ডিম এবং মাছের তেল (সূর্যের আলোতে আমাদের শরীরের চামড়া এই ভিটামিন তৈরি করতে পারে)।	দেহকে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস ব্যবহারে সাহায্য করে বা সুস্থ-সবল হাড় ও দাঁত গঠনে প্রয়োজন।

নতুন শব্দ : ভিটামিন ও ভিটামিন বি কমপ্লেক্স।

পাঠ-৭ : খনিজ লবণ ও পানি

রহিমন গলগণ্ড, সাহিদা রক্তাস্বল্পতায় ভুগছে– এরা কেন এসব রোগে ভুগছে? খনিজ লবণের অভাবে তাদের দেহে এসব রোগ সৃষ্টি হয়েছে। ভাত ও তরকারির সাথে আমরা লবণ খাই। তাছাড়াও আমাদের দেহের জন্য আরও কয়েক প্রকার লবণ প্রয়োজন হয়। দেহ কোষ ও দেহের তরল উপাদানের জন্য (যেমন- রক্ত, এনজাইম, হরমোন ইত্যাদি) খনিজ লবণ খুবই দরকারি। খনিজ লবণ দেহ গঠন, দেহের অভ্যন্তরীণ কাজ (যেমন- পেশি সংকোচন, স্নায়ু উত্তেজনা) নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। হাড়, এনজাইম ও হরমোন গঠনের জন্য এটি একটি অপরিহার্য উপাদান।

উদ্ভিদ মাটি থেকে সরাসরি খনিজ লবণ শোষণ করে। আমরা প্রতিদিন যে শাকসবজি, ফলমূল খাই এ থেকে আমরা প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ পেয়ে থাকি। আমাদের দেহের ওজনের ১% পরিমাণ লবণ থাকে। এ উপাদানগুলো হলো ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সালফার, সোডিয়াম, ক্লোরিন ও ম্যাগনেসিয়াম। এছাড়া লোহা, আয়োডিন, দস্তা, তামা ইত্যাদি খনিজ লবণ আমাদের দেহের জন্য অতি সামান্য পরিমাণে দরকার। এগুলোর অভাব ঘটলে দেহে মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। যেমন আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড রোগ হয়। খাবার লবণের সাথে আয়োডিন মিশিয়ে আয়োডাইড লবণ তৈরি করা হয়। গলগণ্ড রোধে আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়া উচিত।

গুরুত্বপূর্ণ খনিজ লবণগুলো নিচের ছকে দেওয়া আছে। কোন কোন খাদ্যে এগুলো পাওয়া যায় এবং এদের প্রয়োজনীয়তার বিবরণও এই ছকে আছে।

খনিজ লবণ	খাদ্যের উৎস	প্রয়োজনীয়তা
ক্যালসিয়াম	দুধ, মাংস ও সবুজ শাকসবজি।	দাঁত ও হাড়ের সুস্থতায়, রক্ত জমাট বাঁধতে ও স্নায়ু ব্যবস্থার সুষ্ঠু কাজ সম্পাদনে সহায়তা করে।
ফসফরাস লবণ	দুধ, মাংস, ডিম, ডাল ও সবুজ শাকসবজি।	সুস্থ দাঁত ও হাড়ের জন্য।
লোহা	মাংস, ফল ও সবুজ শাকসবজি।	রক্তের লালকণিকা বৃদ্ধি করে রক্তস্বল্পতা দূর করে।
আয়োডিন	সামুদ্রিক শৈবাল, সামুদ্রিক মাছ ও মাছের তেল।	থাইরয়েড গ্রন্থির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে গলগণ্ড রোগ মুক্ত রাখে।
সোডিয়াম	সাধারণ লবণ, নোনা ইলিশ, পনির ও নোনতা বিস্কুট।	দেহের অধিকাংশ কোষে এবং দেহরসের জন্য এর স্বল্পতা দেহে আড়ষ্ট ভাব আনে।
ম্যাগনেসিয়াম	সবুজ শাকসবজি।	এনজাইম বিক্রিয়া ও দাঁতের শক্ত আবরণ গঠনে ভূমিকা রাখে।
ক্লোরিন	খাবার লবণ	দাঁতের স্বাস্থ্য রক্ষা ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি করা।
পটাসিয়াম	মাছ, দুধ, ডাল, আখের গুড় ও শাকসবজি।	পেশি সংকোচনে ভূমিকা রাখে।

পানি

পানি খাদ্যের একটি অপরিহার্য উপাদান। জীবন রক্ষার কাজে অক্সিজেনের পরই পানির স্থান। খাদ্য ছাড়া মানুষ কয়েক সপ্তাহ বাঁচতে পারে, কিন্তু পানি ছাড়া কয়েক দিনও বাঁচতে পারে না। আমাদের দেহের দুই-তৃতীয়াংশ হলো পানি।

পানি দেহের গঠন, অভ্যন্তরীণ কাজ (যেমন- খাদ্য গলাধঃকরণ, পরিপাক ও শোষণ ইত্যাদি) নিয়ন্ত্রণ করে। পানি দেহে দ্রাবক রূপে কাজ করে। বিভিন্ন খনিজ পদার্থ, খাদ্য উপাদান পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। পানির কারণে রক্ত তরল থাকে, যা রক্ত সঞ্চালনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পানি দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখে। পানির আরও একটি প্রধান কাজ হলো মলমূত্রের সাথে ক্ষতিকর পদার্থ অপসারণ করা। পানির অভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়, বিপাক ক্রিয়া ও রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটে। তাই আমাদের নিয়মিত পরিমাণ মতো নিরাপদ পানি পান করা প্রয়োজন।

রাফেজ : শস্যদানা, ফল ও সবজির কিছু অংশ যা হজম বা পরিপাক হয় না এমন তন্তুময় বা আঁশযুক্ত অংশ রাফেজ নামে পরিচিত। ফল ও সবজির রাফেজ সেলুলোজ নির্মিত কোষ প্রাচীর ছাড়া আর কিছুই নয়। রাফেজ হজম হয় না। রাফেজ পরিপাকের পর অপরিবর্তিত থাকে। এই অপরিবর্তিত রাফেজ মানবদেহে মল তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

নতুন শব্দ : রাফেজ ও এনজাইম।

পাঠ-৮ : সুষম ও অসুষম খাদ্য

জয়া ও জিতু দুই বন্ধু। ওরা দুজনই ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। জয়া শুকনা, পাতলা গড়নের, দুর্বল ও পড়ালেখায় অমনযোগী। সবসময় ওকে মনমরা দেখায়। প্রায়ই অসুস্থতার কারণে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে। জিতু একদিন জয়াদের বাড়িতে বেড়াতে গেল। সে জয়ার মায়ের কাছ থেকে জানতে পারল জয়া নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া করে না। সে যেটুকু খাবার খায় তাতে ভাত, মাছ ও মাংসের পরিমাণ থাকে সামান্য। ডিম, দুধ, ফল-মূল ও শাকসবজি একেবারেই খায় না। মা জোর করেও ওগুলো তাকে খাওয়াতে পারেন না। মা ওকে নিয়ে বেশ চিন্তিত। তাহলে বল তো জয়ার খাবার তালিকাটি কী সঠিক? সে শর্করা ও প্রোটিন জাতীয় খাবার খায় সামান্য পরিমাণ। অন্যান্য খাবার না খাওয়ায় ওর দেহে ভিটামিন, খনিজ লবণ ও অন্যান্য উপাদানের ঘাটতি রয়েছে। অর্থাৎ ওর খাবার তালিকাটি সুষম নয়। কারণ যে খাবার তালিকায় সব কয়টি খাদ্য উপাদান থাকে না, সেটি সুষম খাদ্যের তালিকা নয়।

সুষম খাদ্য বলতে আমরা কী বুঝি? সুষম খাদ্য বলতে আমরা সেই সকল খাবার বুঝি, যাতে প্রয়োজনীয় সকল খাদ্য উপাদান পরিমাণ মতো থাকে। অর্থাৎ প্রোটিন, শর্করা, চর্বি, ভিটামিন ও পানি দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে থাকে। সুষম খাদ্য খেতে হলে আমাদের খাদ্য তালিকায় শর্করা, প্রোটিন, তেল বা চর্বি জাতীয় খাদ্য, ভিটামিন ও খনিজ লবণের উপাদান থাকা আবশ্যক।

জয়া যে খাবার খাচ্ছে তা সুষম না হওয়ায় দেহের বৃদ্ধি ঘটছে না, কাজে শক্তি পায় না। দুর্বল বোধ করে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশ কম। স্বাভাবিক বৃদ্ধি, কর্মশক্তি উৎপাদন ও শরীরকে রোগমুক্ত রাখার জন্য আমাদের নিয়মিত সুষম খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।

অসুষম খাদ্য : খাদ্য তালিকায় ছয়টি খাদ্য উপাদানের যে কোনো একটি কম থাকলে বা না থাকলে তাকে অসুষম খাদ্য বা অসম খাদ্য বলে। আমাদের দেশে বেশির ভাগ লোকের খাদ্যই অসম। সাধারণ মানুষের খাদ্যের প্রায় সম্পূর্ণটাই শর্করা। খাদ্যে প্রোটিন, শর্করা, খনিজ লবণ এবং ভিটামিন পরিমাণের চেয়ে কম থাকলে দেহে পুষ্টির অভাব ঘটে। অর্থাৎ দেহে প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবকে অপুষ্টি বা পুষ্টিহীনতা বলে থাকি।

স্বাস্থ্যকর সুষম খাদ্য খাওয়ার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মনে রাখা প্রয়োজন। যথা-

- শর্করা জাতীয় খাদ্য বেশি খেতে হবে।
- যথেষ্ট পরিমাণ শাকসবজি খেতে হবে।
- মাছ বেশি খেতে হবে।
- মিষ্টি ও তেল বা চর্বি জাতীয় খাবার কম খেতে হবে।
- লবণ কম খেতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলগত ভাবে স্থানীয় সহজলভ্য বিভিন্ন খাদ্য সংগ্রহ করবে। সংগৃহীত খাদ্য উপাদানগুলো শ্রেণিতে প্রদর্শন করবে। এগুলোর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করবে।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- খাদ্য তিন প্রকার।
- খাদ্য উপাদান ছয় প্রকার।
- ভিটামিন ও খনিজ লবণ আলাদা কোনো খাদ্য নয়। এ উপাদানগুলো শাকসবজি ও ফলমূলের মধ্যে থাকে।
- অতিরিক্ত প্রোটিন বা শ্বেতসার খাওয়া উচিত নয়।
- সুষম খাদ্য আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজন।
- খাদ্যের তাপশক্তি মাপার একক কিলোক্যালরি। প্রতিদিন কার কত তাপশক্তি বা ক্যালরি প্রয়োজন তা নির্ভর করে বয়স, ওজন, দৈহিক উচ্চতা ও পরিশ্রমের ধরনের উপর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর।

১. আমরা শাকসবজি ও ফলমূল থেকে -------- ও ---------- পাই।

২. ভিটামিন এ-এর অভাবে ---------- রোগ হয়।

৩. তাপশক্তি মাপার একক ------------।

৪. --------- প্রোটিন থেকে তৈরি।

৫. ------- দেহের প্রোটিনকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করে।

লাইন টেনে ডান দিকের খাদ্য বস্তুগুলো যেটি যে শ্রেণির বাম দিকের সেই শ্রেণির সাথে যুক্ত কর।

প্রোটিন	মাংস
শর্করা	বাদাম
চর্বি	মাছ
	আলু
	দুধ
	ডিম
	মাখন
	ঘি
	সয়াবিন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি পানিতে দ্রবণীয়?

ক. ভিটামিন এ　　খ. ভিটামিন বি

গ. ভিটামিন ডি　　ঘ. ভিটামিন ই

২. নিচের কোনটি প্রাণিজ আমিষ?

ক. ডাল　　খ. দুধ

গ. বাদাম　　ঘ. ঘি

ছকে প্রদত্ত চিত্রগুলো লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

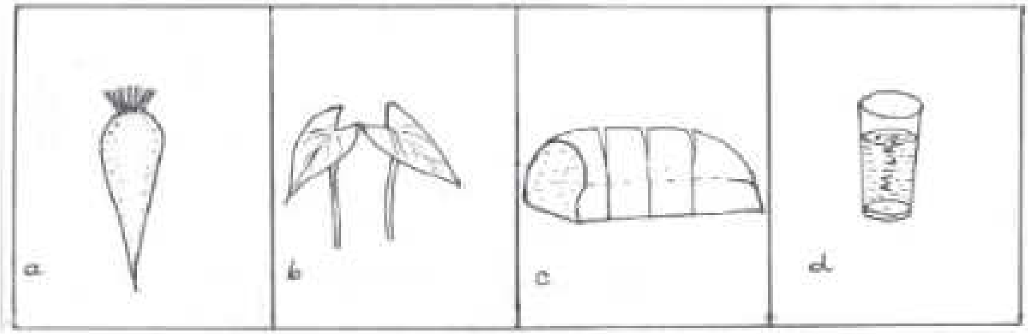

৩. উপরের কোন খাদ্যে স্নেহ উপাদান তুলনামূলক ভাবে বেশি?

ক .a খ. b

গ. c ঘ. d

৪. পরিপাক নালি পরিষ্কারে ভূমিকা রাখে-

i. a ii. b

iii. c

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. খাদ্য তালিকায় লোহার উপকারিতা কী?
২. আমরা খাবার খাই কেন?
৩. মানুষ শুধু ভাত খেয়ে বাঁচতে পারে না কেন?
৪. আয়োডিনের অভাবে কী রোগ হয় তা বর্ণনা কর।
৫. আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে যদি প্রয়োজনীয় ভিটামিন না থাকে তাহলে কী হবে?

নিজেরা কর

১. একগ্লাস পানিতে দুই চা চামচ সরিষার তেল মিশাও। কী ঘটে ব্যাখ্যা কর।
২. ভিজানো আটার রুটি বা ভাতে যে শ্বেতসার উপাদান আছে তা তুমি কীভাবে পরীক্ষা করবে?

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিম্নের চিত্রগুলো দেখে প্রশ্নের উত্তর দাও।

A. B. C. D.

ক. খাদ্য কাকে বলে?

খ. A চিহ্নিত খাদ্য উপাদানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. D চিহ্নিত খাদ্যটি কীভাবে দেহের ওজন বাড়ায়?

ঘ. সুষম খাদ্য হিসেবে চিত্রের খাদ্যগুলো উপযোগী কিনা তা বিশ্লেষণ কর?

২. মাহি ৫ম শ্রেণিতে পড়ে। সে একেবারেই শাকসবজি খেতে চায় না। কিছুদিন ধরে সর্দি-কাশি ও জ্বরে ভুগছে। কয়েক দিন যাবৎ সে রাতে ভালো দেখতে পায় না। তার বাবা-মা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার তার খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে জানতে চাইলেন। ডাক্তার তার মাকে মেয়ের চোখে কম দেখার কারণ ব্যাখ্যা করলেন এবং রঙিন শাকসবজি ও ফলমূল খাওয়ার পরামর্শ দিলেন।

ক. পুষ্টিহীনতা কাকে বলে?

খ. মাহির কী রোগ হয়েছে?

গ. ডাক্তার তাকে শাকসবজি ও ফলমূল খাওয়ার পরামর্শ দিলেন কেন?

ঘ. মাহির কী করা উচিত? তোমার এ ব্যাপারে যুক্তি কী ব্যাখ্যা কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

পরিবেশের ভারসাম্য ও আমাদের জীবন

তোমরা জান, আমাদের চারপাশের সবকিছু নিয়েই এই পরিবেশ। একটি স্থানের সকল জড় ও জীব নিয়েই সেখানকার পরিবেশ গঠিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ তুমি দেখতে পাবে। পরিবেশের এই বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের জীবও বিভিন্ন ধরনের হয়। তোমরা জান জীবের মধ্যে রয়েছে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী। একটি পরিবেশে কোন ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী বসবাস করবে তা নির্ভর করে সেখানকার পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের উপরে। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান মানুষসহ অন্যান্য সকল জীবকে প্রভাবিত করে।

এই অধ্যায় শেষে আমরা

- প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশের উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পরিবেশের উপাদানসমূহের আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশের উপাদানসমূহের সংরক্ষণের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ - ১ : প্রাকৃতিক পরিবেশ

আমাদের চারপাশের পরিবেশ লক্ষ কর। দেখবে পরিবেশের কিছু জিনিস মানুষ তৈরি করেছে। আবার কিছু আছে যা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট। অর্থাৎ যেগুলো মানুষ তৈরি করতে পারে না। তাহলে কোনটিকে আমরা প্রাকৃতিক পরিবেশ বলব?

প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট বস্তুগুলো নিয়ে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সেটাই প্রাকৃতিক পরিবেশ। এর মধ্যে জড় বস্তু ও জীব দুটোই রয়েছে যেগুলো মানুষ তৈরি করতে পারে না।

মানুষ তার প্রয়োজনে ঘর-বাড়ি, বাস-ট্রাক, নৌকা, রাস্তাঘাট, সেতু, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি তৈরি করে। এগুলো মানুষের তৈরি পরিবেশ নামে পরিচিত।

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, আমাদের চারপাশের পরিবেশে আরও কিছু বস্তু আছে যা মানুষ তৈরি করতে পারে না। যেমন- চাঁদ, তারা, মাটি, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, বনজঙ্গল, মানুষ, পশু-পাখি ইত্যাদি। এগুলো সবই প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান।

কাজ : তোমার বাড়ি থেকে রওয়ানা হয়ে বিদ্যালয়ে পৌঁছা পর্যন্ত আশেপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ কর। মানুষের তৈরি এবং প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট বস্তুগুলো শনাক্ত করে এগুলোর নাম তোমার নোট খাতায় লিখে রাখ। শ্রেণিতে আলোচনা কর।

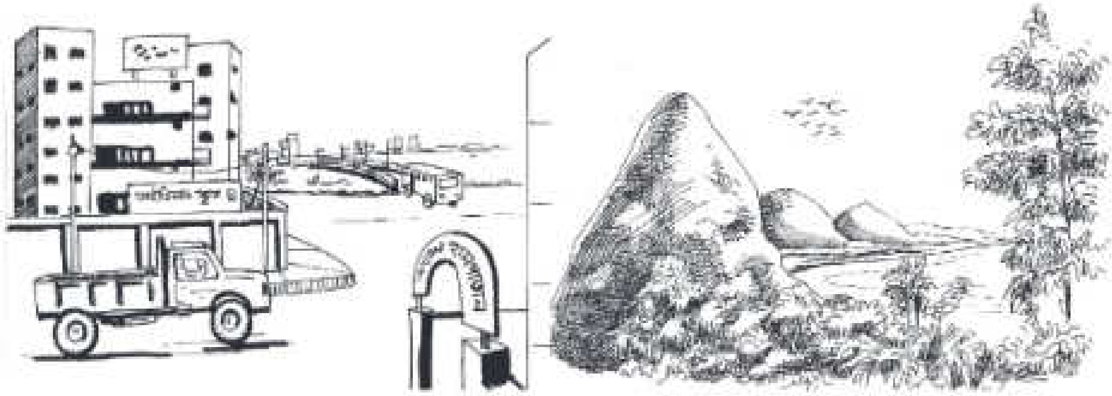

চিত্র ১৪.১ : মানুষের তৈরি পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশ রয়েছে। যেমন : বনজঙ্গলের পরিবেশ, পাহাড়-পর্বতের পরিবেশ, নদীর পরিবেশ ইত্যাদি। তোমার দেখা বা জানা এ ধরনের আর কী কী প্রাকৃতিক পরিবেশ আছে?

পাঠ - ২ : পরিবেশের উপাদান

পরিবেশকে প্রধানত দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হলো পরিবেশের সকল সজীব উপাদান, যা জীব উপাদান নামে পরিচিত। এই জীব উপাদানকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সকল উপাদান নিয়ে আর একটি পরিবেশ গঠিত। যাকে বলা হয় জড় পরিবেশ বা অজীব পরিবেশ।

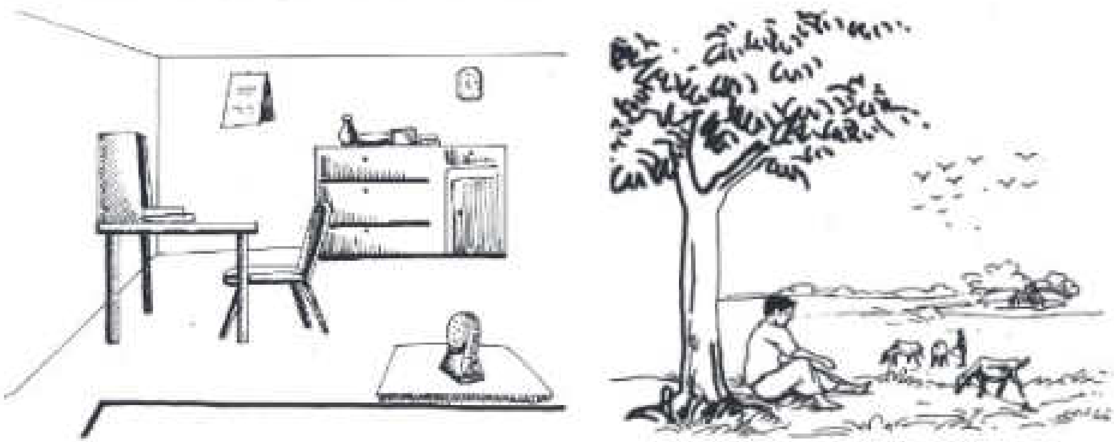

চিত্র ১৪.২ : জড় পরিবেশ ও জীব পরিবেশ

কাজ : শিক্ষকের সহায়তায় দল গঠন কর। স্কুলের মাঠে যাও। পরিবেশ পর্যবেক্ষণ কর। জড় পরিবেশ এবং জীব পরিবেশের উপাদানগুলো শনাক্ত করে নোট খাতায় লিখ। দলে আলোচনা কর। পোস্টার পেপারে ছক তৈরি কর। জড় ও জীব উপাদানগুলোর নাম ছকে লিখ। শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

জীব পরিবেশের উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী। পরিবেশের প্রাণহীন সব উপাদান নিয়ে জড় পরিবেশ গঠিত। এগুলো অজীব বা জড় উপাদান নামে পরিচিত। জড় পরিবেশের মূল উপাদান হচ্ছে মাটি, পানি এবং বায়ু। কারণ এ উপাদানগুলো ছাড়া কোন জীবই বেঁচে থাকতে পারে না।

পাঠ ৩-৪ : পরিবেশের জড় ও জীব উপাদান

কাজ : নিচে দেওয়া ছকটি খাতায় তুলে নাও। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান কীভাবে তোমার জানা উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনকে প্রভাবিত করে তা লিখে ছকটি পূরণ কর। শ্রেণিতে আলোচনায় অংশগ্রহণ কর।

ছক

পরিবেশের উপাদান	উদ্ভিদের কী কাজে লাগে	প্রাণীর কী কাজে লাগে
মাটি		
পানি		
বায়ু		

মাটি, পানি, বায়ু, আলো, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, জলবায়ু ইত্যাদি বিভিন্ন অজীব উপাদান বিভিন্নভাবে পরিবেশের প্রতিটি জীবের স্বভাব এবং বিস্তৃতিকে প্রভাবিত করে। এসব উপাদানের প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে, পরিবেশের একটি নির্দিষ্ট স্থানে কোন ধরনের জীব উপাদান থাকবে। সুতরাং বুঝতে পারছ, অজীব বা জড় উপাদান জীবের বেঁচে থাকার জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ।

কাজ : পাঠ ১-এ তোমরা তোমাদের স্কুলের আশেপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে জীব পরিবেশের যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী শনাক্ত করেছ সেগুলো কোন ধরনের পরিবেশে জন্মে বা বাস করে তা পর্যবেক্ষণ কর। উদ্ভিদ ও প্রাণীর বসবাসের পরিবেশের পার্থক্য লক্ষ কর। নিচের ছকটি পোস্টার কাগজে বা পুরনো ক্যালেন্ডারের পেছনে তুলে ছকটি পূরণ কর এবং শ্রেণিতে প্রদর্শন কর।

ছক

জীবের নাম	কোন ধরনের পরিবেশে জন্মে / আবাসস্থল
উদ্ভিদ	
প্রাণী	

তোমার আশেপাশের পরিবেশের উদ্ভিদ ও প্রাণী পর্যবেক্ষণ করে তাদের আবাসস্থল সম্পর্কে তোমার ধারণা কী?

পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণী

পরিবেশে জীব উপাদানের মধ্যে রয়েছে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী। এ সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী কীভাবে বিভিন্ন পরিবেশে বেঁচে থাকে তা কী কখনও ভেবেছ?

কাজ : শিক্ষকের সহায়তায় দল গঠন কর। পোস্টার কাগজ নাও। দুটো ভিন্ন পরিবেশের (যেমন বনজঙ্গল এবং মরুভূমির পরিবেশ) নাম পোস্টার কাগজে লিখ। তোমরা যে দু'টো পরিবেশের নাম পোস্টার কাগজে উল্লেখ করেছ, সে পরিবেশে কোন কোন উদ্ভিদ ও প্রাণী বাস করে, সেগুলো আর একটি পোস্টার কাগজে নামসহ চিত্র এঁকে কাঁচি দিয়ে কাট। এসব উদ্ভিদ ও প্রাণী তোমার উল্লিখিত দু'টি পরিবেশের মধ্যে যে পরিবেশে বাস করে সেখানে আঠা দিয়ে লাগাও। শ্রেণিতে বুলেটিন বোর্ড অথবা দেয়ালে প্রদর্শন কর। সব দল ঘুরে ঘুরে দেখবে ও শ্রেণিতে আলোচনা করবে।

পরিবেশের সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য কিছু মৌলিক উপাদান প্রয়োজন। বেঁচে থাকার জন্য উদ্ভিদের প্রয়োজন পানি, বায়ু, খাদ্য ও সূর্যের আলো। শত্রু থেকে এদের আত্মরক্ষাও প্রয়োজন।

প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন পানি, বায়ু, খাদ্য, তাপমাত্রা এবং বাসস্থান। প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য শত্রু থেকে নিজেদের রক্ষা করে।

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, তোমাদের দেখা সকল পরিবেশের উদ্ভিদ ও প্রাণী এক রকমের নয়। পৃথিবীর সকল অঞ্চলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বসবাস। সমতল ভূমি থেকে আরম্ভ করে পাহাড়, মাটির নিচে, বনজঙ্গল, খাল-বিল, পুকুর, নদী, সমুদ্র, মরুভূমি ইত্যাদি সকল স্থানেই বিভিন্ন উদ্ভিদ জন্মে ও প্রাণী বাস করে। জলবায়ু, মাটি, পানি, আলো ও অন্যান্য উপাদানের ভিন্নতার কারণে এ সকল অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্যও ভিন্ন।

পাঠ ৫-৬ : পরিবেশের ভারসাম্য

পরিবেশে কোনো জীবই এককভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। বেঁচে থাকার জন্য জীব বিভিন্নভাবে তার চারপাশের পরিবেশের উপর নির্ভর করে। বেঁচে থাকার জন্য আমরাও পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের উপর নির্ভর করি। ভেবে দেখতো যে সকল উৎস থেকে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস পাই তা যদি কোনো কারণে নষ্ট হয় তবে আমাদের জীবনে কী ঘটবে?

তোমরা ডাইনোসরের নাম শুনেছ, যা লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে ছিল। তোমরা কি জান, কেন এই ডাইনোসর আজ আর পৃথিবীতে নেই?

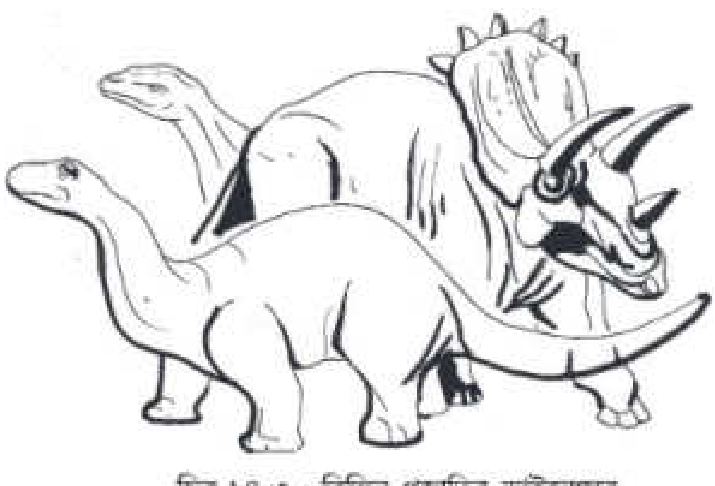

চিত্র ১৪.৩ : বিভিন্ন প্রজাতির ডাইনোসর

ডাইনোসরের বিলুপ্তির কারণ

কোনো কোনো বিজ্ঞানীর ধারণা, ডাইনোসর যখন পৃথিবীতে ছিল তখন পৃথিবী অনেক গরম ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই পৃথিবী অনেক ঠান্ডা হয়ে যায়। ঠান্ডা সইতে না পেরে তারা সবাই মারা যায়।

আবার কারো কারো মতে, যখন পৃথিবীতে অন্য প্রাণীদের আবির্ভাব ঘটে, তখন তারা খাদ্য হিসেবে ডাইনোসরের ডিম খাওয়া শুরু করে। ডাইনোসর তাদের ডিম সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়। ফলে ধীরে ধীরে তাদের বিলুপ্তি ঘটে।

আবার অনেক বিজ্ঞানী বলেন, পৃথিবীর পরিবেশে তখন এমন সব পরিবর্তন ঘটে, যার সাথে ডাইনোসররা নিজেদেরকে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, প্রাকৃতিকভাবে পরিবেশের পরিবর্তন বা মানুষের কোনো কর্মকাণ্ডের কারণে যদি পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে, তখন পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হলে জীব পরিবেশ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণ কী কী? নিচের কাজটি সম্পন্ন করার মাধ্যমে এর উত্তর খুঁজে বের কর।

> কাজ : তোমার এলাকার বা স্কুলের আশেপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ কর (এই পরিবেশ হতে পারে কোনো সমতল ভূমি, কোনো পুকুর বা জলাশয় বা কোনো বনাঞ্চল)। দেখ এখানে কোনো ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে কী? পরিবর্তন ঘটার কারণ কী কী? তোমার নোট খাতায় লিখ। এতে মানুষসহ উদ্ভিদ বা কোনো প্রাণীর কি কোনো ক্ষতি হয়েছে? হয়ে থাকলে সেগুলো নোট খাতায় উল্লেখ করে রাখ। শ্রেণিতে পরিবেশের পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা কর।

বর্তমানে পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাড়তি মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য বনজঙ্গল কেটে বাড়িঘর, চাষের জমি, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট ইত্যাদি তৈরি করা হচ্ছে। ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে। এ ছাড়াও মানুষ বিভিন্নভাবে মাটি, পানি ও বায়ু দূষিত করছে। ফলে অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণী হারাচ্ছে তাদের আবাসস্থল। এভাবে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। পরিবেশে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হলে পরিবেশকে নষ্ট না করে একে সংরক্ষণে সচেষ্ট হতে হবে।

পাঠ ৭-৮ : পরিবেশের উপাদানের আন্তঃসম্পর্ক এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

পরিবেশের সকল অজীব বা জড় উপাদানের সাথে জীব উপাদানসমূহের সবসময়ই পারস্পরিক ক্রিয়া, আদান-প্রদান চলছে। এমনকি জীব পরিবেশে যে উদ্ভিদ ও প্রাণী রয়েছে, তাদের মধ্যেও চলছে এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। বেঁচে থাকার জন্য এরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। কোন অঞ্চলের জীব উপাদান ও জড় উপাদানের নির্ভরশীলতার সম্পর্কে নাম বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম।

পৃথিবীতে যত প্রকার জীব আছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো তিমি– এটা তোমরা জান। আর ক্ষুদ্রতম হলো ব্যাকটেরিয়া। বড় থেকে ক্ষুদ্র সকল জীবই কিন্তু পরস্পর পরস্পরের সাথে বিভিন্নভাবে সম্পর্কিত।

পরিবেশের উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে সম্পর্ক আছে। এদের সাথে আবার বায়ু, মাটি ও পানির যে সম্পর্ক তা একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলছে। এর মধ্যে কোনো প্রক্রিয়া অতি সাধারণ, আবার কোনোটি অতি জটিল।

কাজ : তোমার নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী পর্যবেক্ষণ কর। পর্যবেক্ষণের সময় খেয়াল কর বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী পরিবেশে কীভাবে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। আরও খেয়াল কর উদ্ভিদ ও প্রাণী কীভাবে পরিবেশের অজীব উপাদানের উপর নির্ভরশীল এবং তোমার নোট খাতায় লিখে রাখ। অজীব ও জীব উপাদানের নির্ভরশীলতার প্রবাহচিত্র পোস্টার কাগজে এঁকে শ্রেণিতে প্রদর্শন কর।

জীব জড়ের উপর নির্ভরশীল, আবার একটি জীব অপর একটি জীবের উপর নির্ভরশীল। পরিবেশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তোমরা এ বিষয়টি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যেমন উদ্ভিদ খাদ্য তৈরির জন্য সৌরশক্তিকে কাজে লাগায়, যা সালোকসংশ্লেষণ নামে পরিচিত। সালোকসংশ্লেষণ (উদ্ভিদ) এবং শ্বসন (উদ্ভিদ এবং প্রাণী) পদ্ধতি পরিবেশের বিভিন্ন অজীব ও জীবের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রধান দুটি উপায়।

উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ পদ্ধতিতে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং পানি ব্যবহার করে গ্লুকোজ এবং অক্সিজেন উৎপন্ন করে। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন অক্সিজেন উদ্ভিদ এবং প্রাণীর শ্বসন প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদনে কাজে লাগে। প্রাণীর শ্বসন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইড উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। এভাবেই সালোকসংশ্লেষণ এবং শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবমণ্ডলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

তোমরা জেনেছ, জীব পরিবেশের প্রধান উপাদান হলো উদ্ভিদ ও প্রাণী। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এরা একে অপরের থেকে ভিন্ন। কিন্তু জীবন ধারণের জন্য এরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

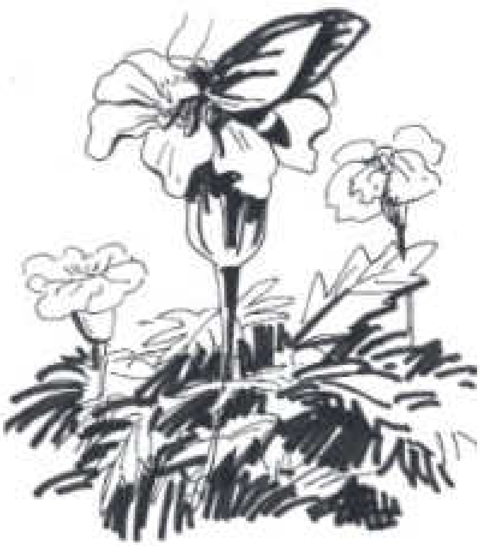

চিত্র ১৪.৪ : উদ্ভিদ ও প্রাণীর নির্ভরশীলতা

কোনো কোনো উদ্ভিদের বংশবিস্তার ঘটে কীটপতঙ্গের মাধ্যমে। জীবন ধারণের জন্য মৌমাছি যখন ফুলে ফুলে বিচরণ করে, তখনই পরাগায়ন ঘটে। আবার বিভিন্ন প্রাণী যেমন পশু পাখি ইত্যাদির মাধ্যমেও উদ্ভিদের বংশবিস্তার হয়। আবার অনেক উদ্ভিদ আছে যারা বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর আশ্রয়স্থল। তোমরাও পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের নির্ভরশীলতার অনেক উদাহরণ দিতে পারবে। এরকম আরও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উদাহরণ তৈরি কর।

পাঠ ৯-১০ : পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সংরক্ষণের কৌশল

পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান যেমন : মাটি, পানি, বায়ু, উদ্ভিদ, প্রাণী ইত্যাদি সম্পর্কে তোমরা জেনেছ। আরও জেনেছ উদ্ভিদ ও প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এরা আবার জড় পরিবেশের উপরও নির্ভরশীল। সকল জীব বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের উপর নির্ভরশীল। পরিবেশের উপাদানসমূহের মধ্যে যদি কোনো কারণে কোনো পরিবর্তন ঘটে, তবে জীবের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হবে। বলতে পার কীভাবে পরিবেশের দূষণ ঘটে?

কাজ : শিক্ষকের নির্দেশনায় দলে একটি দূষিত পরিবেশ (যেমন : হাজামজা পুকুর বা জলাশয়, দূষিত নদী, আবর্জনাময় স্থান ইত্যাদি) পরিদর্শন কর। পরিবেশ দূষিত হওয়ার কারণ শনাক্ত কর। দূষণরোধে করণীয় কী তা ব্যাখ্যা কর। পরিবেশের উপাদানসমূহ সংরক্ষণে করণীয় কী দলে আলোচনা করে প্রতিবেদন তৈরি কর। শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

চিত্র ১৪.৫ : একটি স্বাভাবিক পরিবেশ ও একটি দূষিত পরিবেশ

সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য এবং বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করতে হলে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে হবে। সেই সাথে পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান মাটি, পানি, বায়ুর দূষণ রোধ করতে হবে। বনজঙ্গল, পশু, পাখি নিধন বন্ধ করতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার এমনভাবে করতে হবে যেন জীব এবং সম্পদের ভারসাম্য রক্ষা হয়।

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

- প্রাকৃতিক পরিবেশ হলো এমন একটি পরিবেশ, যার মধ্যে রয়েছে জড় বস্তু ও জীব, যা মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না।
- পরিবেশ দুই ধরনের উপাদান নিয়ে গঠিত। জড় উপাদান ও জীব উপাদান। প্রাণহীন সব উপাদান হলো জড় উপাদান এবং সজীব সকল উপাদান হলো জীব উপাদান।
- বাড়তি মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য বিভিন্নভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যবহার ও ধ্বংস করা হচ্ছে, যা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণ।
- পরিবেশের সকল জড় উপাদান ও জীব উপাদানের মধ্যে সর্বদা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, আদান-প্রদান চলছে। একই ভাবে সকল জীবের মধ্যেও চলছে এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। বেঁচে থাকার জন্য সকল জীব একে অপরের উপর নির্ভরশীল।
- সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হলে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান দূষণমুক্ত রাখতে হবে এবং সংরক্ষণ করতে হবে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর।

১. পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান মানুষসহ অন্যান্য সকল .... প্রভাবিত করে।

২. পরিবেশের .... সব উপাদান নিয়ে জড় পরিবেশ গঠিত।

৩. পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হলে .... নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪. কোনো কোনো উদ্ভিদের .... ঘটে কীটপতঙ্গের মাধ্যমে।

৫. সকল জীব বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশের .... উপাদানের উপর নির্ভরশীল।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি অজীব উপাদান?

ক. অ্যামিবা　　খ. পানি

গ. গোলাপ　　ঘ. শামুক

২. পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আমাদের-

i. রাস্তাঘাট নির্মাণ করতে হবে　　ii. পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে হবে

iii. উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলকে রক্ষা করতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের চিত্র দুটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

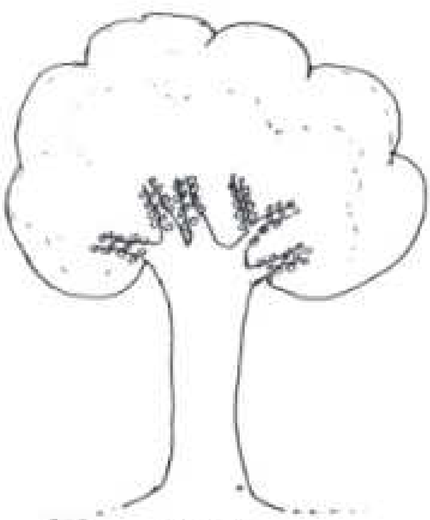

চিত্র X

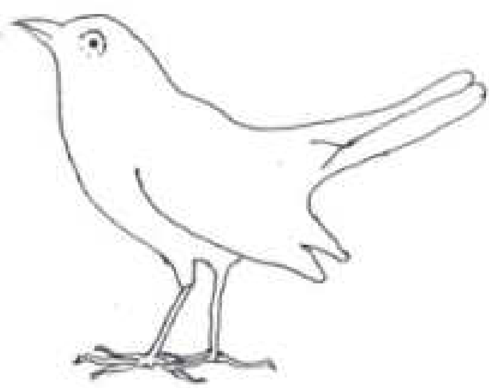

চিত্র Y

৩. কিসের জন্য X এর উপর Y নির্ভর করে?

ক. সালোকসংশ্লেষণ
খ. খাদ্যগ্রহণ
গ. পরাগায়ন
ঘ. প্রস্বেদন

৪. X ও Y প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভর করে-

i. পানির উপর
ii. বায়ুর উপর
iii. আলোর উপর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

X	Y	Z
মাটি পানি বায়ু আলো	ধানগাছ	মানুষ

ক. পরিবেশ কী?
খ. দূষণ বলতে কী বুঝায়?
গ. X কলামের উপাদানগুলোর উপর Y কলামের জীব কীভাবে নির্ভরশীল? ব্যাখ্যা কর ।
ঘ. 'Z কলামের জীবটি X ও Y উভয়ের উপর নির্ভরশীল' বিশ্লেষণ কর ।

২. P একটি বৃক্ষচারী তৃণভোজী প্রাণী । জীবনধারণের জন্য এটি তার চারপাশের বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে । তবে মানুষের কর্মকাণ্ডের বিরূপ প্রভাব ও পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে P প্রাণীটির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে ।

ক. জড় পরিবেশ কী?
খ. জীবের বিলুপ্তি বলতে কী বুঝায়?
গ. P প্রাণীটি পরিবেশের কোন জীবের উপর অধিক নির্ভর করে? ব্যাখ্যা কর ।
ঘ. P প্রাণীটির সংখ্যা স্থির রাখার জন্য আমরা কী ধরনের পদক্ষেপ নেব? মতামত দাও ।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

ষষ্ঠ-বিজ্ঞান

মিতব্যয়ী হওয়া ভালো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।